কোন্নগর পরিচিতি

কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ
কোন্নগর, হুগলী

প্রথম প্রকাশ ঃ আশ্বিন ঃ ১৪০৯
অক্টোবর ঃ ২০০২

প্রকাশক ঃ কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের পক্ষে
শ্রীমতী রেখা দত্ত

প্রচ্ছদ ঃ ঈশা মহাম্মদ

মুদ্রক ঃ পাশী এন্টারপ্রাইজ
১৯৯, সি. এস. মুখার্জী স্ট্রীট
কোন্নগর, হুগলী (পিন:-৭১২২৩৫)
ফোন ঃ ৬৭৪-৬৪০৩

লেজার কম্পোজ ঃ ইউ. এম. প্রিন্টার্স
১১১, রাম মোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

উৎসর্গ

কোন্নগরের জনক

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব-কে

শ্রদ্ধার্ঘ্য

।। সূচীপত্র ।।

অনুচ্ছেদ—১

ভূমিকা ঃ সঞ্জীব সেন

ভূমিকা

(ক)

ইতিহাস লেখা কঠিন কাজ। কেবল তথ্যের বিবৃতি ইতিহাসের অঙ্গ বটে, কিন্তু ইতিহাস নয়। সাংবাদিকের কাজ ও ঐতিহাসিকের কাজের মধ্যে সাযুজ্য আছে। এটা ঘটনাচক্রের বাইরে থেকে দেখা। ইতিহাসের সঙেগ সাহিত্যের হাত ধরাধরি আছে। সাহিত্যিকের অধিকার থাকে ঘটনার ভেতরে প্রবেশ করার এবং জীবনের আভ্যন্তরীণ সত্যকে বোঝবার চেষ্টা। অধুনা ঐতিহাসিকদের বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সমাজ নিষ্ঠাও পরিলক্ষিত হয়। ফলে, ইতিহাস এক আকর্ষণীয় উপাদান নিয়ে পাঠকের কাছে আসে। ইতিহাস যে বিজ্ঞান এটা সুবিদিত ও সমাদৃত। তবে ইতিহাসকে যদি সাহিত্যের সাধনার দৃষ্টিতে আনা যায় তাহলে সেই ইতিহাস কেবল তথ্যের ইতিহাস থাকে না, তা সমাজ বিজ্ঞান হয়ে ওঠে। একজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিত গবেষক ইতিহাসের ছোট্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন—"সমাজবদ্ধ মানুষের অতীত আশ্রয়ী ও তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস।"

তবে ভাগ আছে। পশ্চিমী গোঁড়া পণ্ডিত ঐতিহাসিকগণ তথ্যনিষ্ঠ এবং রাজা ও রাষ্ট্র সংবাদের উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন, এবং সেই ভাবে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তাঁরা এই পদ্ধতিকে শুদ্ধাচার ভাবতেন এবং এ্যাকাডেমিসিয়ানরা এই প্রথাগত ইতিহাসকে বিশেষ মূল্য দিতেন। তবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সূচনা হলেও বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাসের একটা মানবিক চেহারা অন্য পণ্ডিতরা দিতে আরম্ভ করেন। অধ্যাপক সুশোভন সরকার প্রমুখ ইতিহাস-বিদ্‌গণ এই ভাবেই চিন্তা করেছেন, ঐতিহাসিক ইরফান হাবিরের আলোচনা Interpreting Indian History গ্রন্থের একটি নিবন্ধে একথা জোর দিয়ে বলেছেন।

আমাদের চিন্তা ও মননের ধ্রুবতারা রবীন্দ্রনথ, তাঁর অসামান্য কিছু উক্তির উদ্ধৃত করি এই প্রসঙ্গে।

ক। "এই রক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তনমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা যায় না। ভারতবাসী কোথায় এসকল ইতিহাস তাহার কোনো উত্তর দেয় না। যেন ভারতবাসী নাই, যাহারা কাটাকাটি খুনাখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।"

খ। "বিদেশ যখন ছিল দেশ তখনো ছিল, নইলে এইসমস্ত উপদ্রবের মধ্যে কবীর নানক চৈতন্য তুকারাম ইহাদিগকে জন্ম দিল কে? তখন যে কেবল দিল্লি এবং আগ্রা ছিল তাহা নহে, কাশী এবং নবদ্বীপও ছিল। তখন প্রকৃত ভারবর্ষের মধ্যে যে জীবন স্রোত বহিতে ছিল, যে চেষ্টার তরঙ্গ উঠিতেছিল, যে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাহার বিবরণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না।"

গ। "ভারতবর্ষের চিরদিন একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুরমধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।" (স্বদেশ ও সমাজ। ভারতবর্ষের ইতিহাস)।

এই গ্রন্থ সংগঠনের ভাবনার প্রেক্ষিতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরার জন্য রবীন্দ্রনাথের উক্তিতে পথ নির্দেশ পেয়েছি।

(খ)

হুগলী জেলায় কোন্নগর একটি প্রাচীন জনপদ। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী এই স্থানটি সম্বন্ধে একাধিক নির্দেশিকা আছে। কোন্নগর সম্বন্ধে তিনখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের পরিচয় পাই। (ক) কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রামকৃষ্ণ সরকার লিখিত 'কোন্নগরের ইতিহাস' (বাংলা ১৩৮৭ সনে প্রকাশিত), (খ) সুখ্যাত চিকিৎসক ও জনদরদী ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা প্রধানত লিখিত 'আমাদের কোন্নগর' (ইং১৯৯৫), এবং কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরীর

ঋদ্ধ গ্রন্থাগারিক অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'উনিশ শতকের কোন্নগর ও কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী' (ইং ২০০০)। এছাড়াও আছে হুগলী জেলার ইতিহাস প্রভৃতি। এই পুস্তকগুলি অবশ্যই এই গ্রন্থের সহায়ক উপাদান।

জানা যায়, প্রাচীন কোন্নগরে জালুক কৈবর্ত বাগ্দী প্রভৃতি জাতির আবাসস্থল ছিল। পরে উচ্চবর্ণের সমৃদ্ধ মানুষেরা এসে বসবাস আরম্ভ করেন। আনুমানিক এই সময়টা বর্তমান সময় থেকে ৩০০ বছর পূর্বে বলা যায়। প্রধানত তাদের অবস্থান গঙ্গার তীরবর্তী উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। উত্তরে ব্রাহ্মণদের অবস্থান এবং মধ্যাঞ্চল ও অনতি দক্ষিণে কায়স্থ সম্প্রদায়ের বাস ছিল বলে চিহ্নিত। উচ্চবর্ণের এই দুই সম্প্রদায় বাঙালি জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনুশীলনে প্রভূত সহায়ক হয়েছিলেন।

তবে, পঞ্চদশ শতকের কবি কঙ্কন মুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ও বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসা মঙ্গল কাব্যে সর্বপ্রথম কোন্নগরের পুঁথিগত নাম পাওয়া যায়। বিপ্রদাসের বাণিজ্যতরী সাগর সঙ্গমে অগ্রসর হওয়ার পথে কিছু স্থানের উল্লেখ আছে—মাহেশ, খড়দহ, ডাইনে রিষড়া, বামে সুখচর, পশ্চিমে কোন্নগর প্রভৃতি। কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে লব্ধ উদ্ধৃতি।

"ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে।
কোন্নগর কোতরং এড়াইয়া যায়
কুনিলাল ধনপতি দেখিবারে পায়"

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত হয় ১৫৭৭ সালে। সুতরাং কোন্নগরের বয়স প্রায় ছ'শ বছর ধরে নেয়া যায়। পরে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে কোন্নগরের উল্লেখ অবশ্যই গৌরবান্বিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পদার্পণ ও মহর্ষি শিবচন্দ্র দেব কোন্নগরের আধুনিক যুগের স্রষ্টা। এই গ্রন্থের সময়কাল 'বিংশ শতাব্দীর কোন্নগর'। যেহেতু অতীতকে না জানলে বর্তমানকে বোঝা যায় না, আমরা গ্রন্থে বিশিষ্ট লেখক দ্বারা শিবচন্দ্র বিষয়ক আলোচনা রেখেছি।

কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের অন্যতম প্রাণপুরুষ, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিষ্ণু দত্তের উদ্যোগে সম্পাদক মণ্ডলীতে আলোচনান্তে সিদ্ধান্ত হয় যে, ঠিক এই সময়ের কোন্নগরকে নিয়ে একখানি গ্রন্থ রচনা করা। ৭.৩.১৯৯৯এ রবীন্দ্র পরিষদের একটি বর্ধিত সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং এই গ্রন্থ প্রকাশনী বিভাগের কর্মপরিষদ গঠিত হয়। এই গ্রন্থের শেষে কর্ম পরিষদের সদস্যদের তালিকা দেওয়া আছে।

এরপরে সম্পাদক মণ্ডলীরা বসে বারবার নানা আলোচনার মাধ্যমে লেখার কাজ শুরু হয়। কোন্নগরের তাবৎ প্রতিষ্ঠান শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলা সমাজ সেবা প্রভৃতির পরিচিতি (অতীত ও বর্তমান) এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সর্বাগ্রে কোন্নগরের প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ধরে রাখা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতে এঁরাই ছিলেন কোন্নগরের গৌরব সমাজ কল্যাণ ও শিক্ষার নিরিখে। প্রত্যেকটি রচনার শেষে লেখকের নাম ও সংগ্রহের সূত্র দেওয়া আছে। বেশিরভাগ লেখা ও সংগ্রহ বিষ্ণু দত্তের। বাকি সম্পাদক মণ্ডলীর বিভিন্ন ব্যক্তির। অবশ্য মণ্ডলীর বাইরে থেকে নানা ব্যক্তির কাছে সহযোগিতা পেয়েছি। রবীন্দ্র পরিষদ তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছে। সম্পাদক মণ্ডলীর ও প্রচ্ছদ শিল্পীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি গ্রন্থের শেষে মুদ্রিত হয়েছে, সুধী পাঠক অনুধাবন করবেন, বিশাল কর্মপ্রচেষ্টা এই গ্রন্থ রচনার নেপথ্যে অবিরাম ছিল। যাঁরা লিখেছেন এবং লেখা ও উপাদান সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিয়েছেন তাঁদের সবাইকে রবীন্দ্রপরিষদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, ধন্যবাদ জানাই প্রচ্ছদ শিল্পী ঈশা মহাম্মদকে, তিনি কোন্নগরের একজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। ধন্যবাদ জানাই পাশী এণ্টারপ্রাইজের কর্ণধার ও কর্মীদের, যাঁরা ছাপার ও এই বই প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন।

সহযোগিতার ঋণ স্বীকার সকলের কাছেই যাঁরা যে কোনো ভাবে হাত বাড়িয়েছেন। কৃতজ্ঞতা জানাই প্রবাসী শ্রী ভবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও শ্রীমতী রেখা দত্তকে। সফল প্রচেষ্টার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম অনুল্লেখ থাকতে পারে, তারও স্বীকারোক্তি জানাই।

সব শেষে স্মরণ করি সেই সব দুর্লভ ব্যক্তিদের যাঁদের পরিশ্রম আত্মত্যাগ ও শিল্প সাহিত্য বিন্যাসে 'এক ভারতবর্ষের' উজ্জ্বল উপস্থিতি বিশ্বময় হয়েছিল, তাঁদের কিছু অবদান কোন্নগরের মাটিতেও চিহ্ন রেখে গেছে। শ্রদ্ধা জানাই মনন ও ধারণের জনগণমন অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথকে, তিনিই আমাদের ধ্রুবতারা, আমাদের জীবন গানে তিনি যে ধ্রুবপদ বেঁধে দিয়েছেন বিশ্বতানে, সেই সত্যকেই মেলাবার চেষ্টা থাকবে অবিরাম।

অনুচ্ছেদ—২

বিংশ শতাব্দীর কোন্নগর পুর পরিচিতি ঃ

বিংশ শতাব্দীর কোন্নগর পুর পরিচিতি

এই কোন্নগর অতি প্রাচীন জনপদ। ইতিহাসের নানা বাঁকে এবং প্রাচীন লেখায় এর উল্লেখ আছে, যথা—কবি কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে পাই—

"ত্বরায় চলয়ে তরী তিলেক না রহে
ডাহিনে মাহেশ রাখি চলে খড়দহে।
কোন্নগর কোতরং এড়াইয়া যায়
কুনিলাল ধনপতি দেখিবারে পায়।"

কোন্নগরের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত আছে—যেমন অন্য জনপদের নামের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও আছে। আজ পর্যন্ত সে সম্বন্ধে সঠিক কিছু সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। উদাহরণ—যেমন পশ্চিম বঙ্গ তথা বঙ্গদেশের রাজধানী কলকাতার নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা পন্ডিতের নানা মত। সুতরাং নামের উৎপত্তি খোঁজা থেকে বিরত রইলাম।

এখন আধুনিক কালে দুইজন ইতিহাস সচেতন বিশিষ্ট মানুষের কোন্নগরের ইতিহাসের উপর দুইটি পুস্তক আছে। এক, রামকৃষ্ণ সরকারের "কোন্নগরের ইতিহাস"—তদীয় স্ত্রী বীণা সরকার কর্তৃক তাঁর মৃত্যুর পরে ৮-৫-১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়টি ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জীর "আমাদের কোন্নগর"—প্রকাশ কাল ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৫। ইহা ছাড়া তৃতীয় ইতিহাসটি ২০ জুলাই ২০০০ তারিখে প্রকাশিত। নাম "উনিশ শতকের কোন্নগর ও কোন্নগরের পাবলিক লাইব্রেরী"—লেখক গ্রন্থাগারিক শ্রী অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়। উল্লেখ্য যে, প্রথম দু'টি ইতিহাসে কোন্নগরের বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের ঘটনাবলী সম্বন্ধে লেখা আছে—বর্তমান পর্যন্ত বিস্তৃত নয়।

এখন আমার মত একজন অক্ষম ব্যক্তি কোন্নগরের অতীত ইতিহাস—তার নানা দিকের কথা অনেক ভেবেছি এবং নানা সময়ে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি যা আমার কাছে দার্ঘ দিন ধরে জমা আছে। এখন একজন রাজনৈতিক

ও সমাজসচেতন কর্মী হিসাবে তথা কোন্নগরের একজন মানুষ, যে কোন্নগরের ভাল মন্দ সম্বন্ধে ভাবে—তার অনেক দিনের মনের বাসনা কোন্নগরের বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে তার নজরে যা এসেছে বা তার জ্যেষ্ঠদের কাছ থেকে শুনেছে তার উপর ভিত্তি করে কিছু লিখেছে এবং অনেক দিন ধরে কিছু রচনা করেছে। তাই প্রচেষ্টা—এই কলম চালনা।

কোন্নগরের ভৌগলিক বিন্যাস—পূর্বে ভাগীরথী, পশ্চিমে রেল লাইন (তার পশ্চিমে সামান্য জমি), উত্তরে বর্তমানে বাঘের খাল যা রিষড়া কোন্নগরের মধ্যে অবস্থিত ও দক্ষিণে কোতরং (যা উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার অন্তর্গত)।

এই হল ভৌগলিক সীমানা। কিন্তু উত্তরের রিষড়া প্রভৃতির সঙ্গে এক শাসনতান্ত্রিক সম্বন্ধ ছিল—যার পূর্বকাহিনী নিম্নে প্রদত্ত হল—

(১) ১৮৬৫ সালে শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া পুরসভাদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন শ্রীরামপুর পুরসভার এলাকা—উত্তরে চাতরা-শেওড়াফুলি গ্রাম, দক্ষিণে কোতরং গ্রাম, পশ্চিমে রেল লাইন এবং পূর্বে ভাগীরথী নদী।

(২) ১৮৬৯ সালে চাতরা-শেওড়াফুলি বিযুক্ত হয়ে আলাদা বৈদ্যবাটী পুরসভা হয় এবং কোতরংএ আলাদা পুরসভা হয়।

(৩) ১৯১৬ সালে শ্রীরামপুর পুরসভা থেকে বেরিয়ে এসে রিষড়া-কোন্নগর আলাদা পুরসভা রূপে আবির্ভূত হয়।

রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার আমলে কোন্নগর থেকে যাঁরা নির্বাচিত হন তাঁরা হলেন —

অক্টোবর ১৯১৫ থেকে—

পি টি বোস—পুরপ্রধান ও নৃসিংহদাস প্রমুখ ৪জন সদস্য।

১৯১৯—হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়—উপপ্রধান ও নৃসিংহ দাস বসু ও চন্ডী ঘোষাল—২জন সদস্য

১৯২৩—হরিচরণ চ্যাটার্জী—পুরপ্রধান ও অতুল গাঙ্গুলী, পূর্ণ চ্যাটার্জী, চন্ডী ঘোষাল ও নৃসিংহ দাস বসু—৪জন সদস্য

১৯২৮—নৃসিংহ দাস বসু, হরিচরণ চ্যাটার্জী, চন্ডী ঘোষাল, পূর্ণ চ্যাটার্জী ও অতুল গাঙ্গুলী—৫জন সদস্য

১৯৩৬—নিবারণ মিত্র, বীরেন্দ্র মিত্র, মলয় দেব, জ্যোতির্ময় গাঙ্গুলী ও

মৌলবী হবিবুর রহমান—এই ৬জন সদস্য

১৯৩৯—আর বি সিমুর, চন্ডী ঘোষাল, হরিচরণ চ্যাটার্জী, নিবারণ মিত্র, মলয় দেব, হবিবুর রহমান ও আব্দুল খালেক—এই ৭জন সদস্য

২। অতীত কাল থেকে ত্রিশের দশকের প্রথমে কোন্নগর, রিষড়া (কোন্নগর রিষড়া তখন এক পুরসভার অন্তর্গত) ভদ্রকালী, কোন্নগরের পশ্চিমের গ্রামাঞ্চল (খড়িয়াল পর্যন্ত) নিয়ে যে জনপদ তার বাসিন্দাদের মধ্যে একটা আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল সর্বক্ষেত্রে—যথা আর্থিক, শিক্ষা-সংস্কৃতিগত, খেলাধূলা ও সামাজিক মেলামেশার ক্ষেত্রে। এর একটা কারণ হতে পারে—পশ্চিমে খড়িয়াল থেকে পূর্বে গঙ্গা, উত্তরে রিষড়া থেকে দক্ষিণে ভদ্রকালী পর্যন্ত যে এলাকা-তার মধ্যে একটি মাত্র উচ্চ-বিদ্যালয় "কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী-বিদ্যালয়" যেখানে সকল ছাত্রই পড়তে আসত আর গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ তাদের ফসল নিয়ে কোন্নগরের বাজারে আসত ; কোন্নগরের অনেক অধিবাসীর গ্রামাঞ্চলে জমি ছিল। এর পর ৭০/৮০ বছরের মধ্যে ধীরে ধীরে আশপাশের সব অঞ্চলে উচ্চ-বিদ্যালয়সমূহ (ছেলে ও মেয়েদের) ; এবং পোষ্ট অফিস, ব্যাঙ্ক, খেলার মাঠ, হাট-বাজার সবই গড়ে উঠেছে। ১৯৪৪ সালে রিষড়া-কোন্নগর পুরসভা বিভক্ত হয়ে কোন্নগর পুরসভার জন্ম হয়। এর পর সমস্ত অঞ্চলে লোকসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করে। সুতরাং অতীতের সেই এককেন্দ্রীক সংহত ভাব বা ঐক্য শিথিল হয়ে যায়। এবং তার স্থানে স্বতন্ত্রভাবে বহুকেন্দ্রিকতা গড়ে উঠে। এই হচ্ছে ইতিহাসের অমোঘ বিধি।

৩। আর সাথে সাথে গ্রাম থেকে শহরে রূপান্তরিত হয়েছে—প্রতিটি অঞ্চল। কোন্নগরের ক্ষেত্রে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির একটা হিসাব এই রকম—

১৯৪৪ সালে—	১৯,০০০
১৯৭১ সালে—	৩৪,৪৫৫
১৯৮১ সালে—	৫১,২০৪
১৯৯১ সালে—	৬২,২১৪

(তার মধ্যে হোল্ডিং ১৩,০০০ বসতবাটী ৯,৫০০) এবং বর্তমানে ২০০১ সালে লোকসংখ্যা— ৭৫,০০০।

কোন্নগরের আয়তন কিন্তু স্থির—৪.৬৭ বর্গকিলোমিটার বা ১.৬৭ বর্গ মাইল [কোন্নগরে বর্তমানে ছেলেদের ও মেয়েদের উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা—৭]।

৪। আর সেই কালে অর্থাৎ ৫৬ বৎসর পূর্বে রাস্তাঘাট (বেশির ভাগ) ঝামা-খোয়ার। গঙ্গার ধারে-ধারে এবং প্রধান প্রধান ৫/৬টি রাস্তা ধরে জনবসতি ছিল। গ্রাম ছিল ব্রাহ্মণ—কায়স্থ প্রধান ; ছিল বারুজীবী, তেলী, তামিল, মৎসজীবী প্রভৃতি আর ছিল গ্রামের অন্তে নিবাসী দুলে, বাগদী প্রভৃতি—মুসলিমদের আলাদা পাড়া ছিল। উচ্চ বর্ণের মানুষদের মধ্যে বেশিরভাগ সদাগরি অফিসের কেরাণী—পিয়ন ; স্কুল ও পাঠশালার শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি। রাস্তার ধারে দূরে দূরে ল্যাম্পপোষ্টের মাথায় কাঁচের ঘেরাটপ দেওয়া কেরোসিনের বাতি। রাত্রি ৮/৯টার পর বেশির ভাগই নিভে যেত। সন্ধ্যার পর বেশিরভাগ মানুষ ঘরের বাহির হত না। সাধারণত দেবতার নাম, গান, যাত্রা থিয়েটার ও তাসের আড্ডায় জমায়েত হত মানুষ। তখন বলদ ও মোষে টানা জঞ্জালের ও ময়লা ফেলার গাড়ি ছিল। রাস্তার ধূলা নিবারণের জন্য মাঝে মাঝে গাড়ি করে জল দেওয়া হত।

ত্রিশের দশকে রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার আমলে যেদিন রাস্তায় বিজলী বাতি জ্বলেছিল সেদিন মানুষ উৎসবের মেজাজে রাস্তায় রাস্তায় উৎফুল্ল হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিল।

৫। ১৬ই জানুয়ারী ১৯৪৪ সালে রিষড়া-কোন্নগর পুরসভা ভেঙে দুটি আলাদা আলাদা পুরসভা হয়ে যায়। এই হচ্ছে কোন্নগর পুরসভার জন্মের ইতিহাস।

সেখানে প্রথমে মনোনীত বোর্ড তৈয়ারী হয়। তার সদস্যগণ ঃ—

নৃসিংহদাস বসু—পুরপ্রধান

ননীগোপাল বসু—উপ-পুরপ্রধান

অতুল্য কুমার দেব—সদস্য

বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র—সদস্য

জ্যোতির্ময় মুখার্জী—সদস্য

পূর্ণচন্দ্র চ্যাটার্জী—সদস্য

হবিবুর রহমান—সদস্য
আব্দুল খালেক—সদস্য
ও ডেন স্টোন (লছমী নারায়ণ)
আর বি সিমুর— (ডি ওয়ালডি)

৬। ২৩ মার্চ ১৯৪৫ তারিখে পুরসভার প্রথম নির্বাচিত বোর্ডের সদস্যগণ—

১নং ওয়ার্ড— নৃসিংহদাস বসু—পুরপ্রধান
ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী—উপ-পুরপ্রধান
ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—সদস্য
প্রভাত কুসুম ব্যানার্জী—সদস্য

২নং ওয়ার্ড— অনিল কুমার ঘোষ—সদস্য
অতুল্য কুমার দেব—সদস্য
মুরারি মিত্র—সদস্য
জ্যোতিষ চন্দ্র গাঙ্গুলী—(মনোনীত)
আব্দুল খালেক—(মাইনরিটি সম্প্রদায়)
আর বি সিমুর— শিল্প প্রতিনিধি
সুধীর কুমার দত্ত—শিল্প প্রতিনিধি

এই বোর্ডের কার্যকলাপ এবং বৎসর বৃদ্ধি করা হয়।

নভেম্বর (১৯৪৯) ২য় নির্বাচন—ফলাফল

১নং ওয়ার্ড— নৃসিংহদাস বসু—পুরপ্রধান
ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী—সদস্য
ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী—উপ-প্রধান
(১৯৫১ এর পর)
প্রভাত কুসুম ব্যানার্জী—সদস্য

২নং ওয়ার্ড— সমর কুমার মিত্র (৩৬৯ ভোট) সদস্য
বলরাম পালিত (৩৪২ ")

ননীগোপাল বসু (৩২৫ ”)

(উপ-প্রধান প্রথমে)

জিতেন্দ্র নাথ মিত্র (৩১৬ ”)

৯) আব্দুল খালেক (মনোনীত)

এই নির্বাচনে ২নং ওয়ার্ডে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়—৪জনের গ্রুপ করে। গ্রুপের অন্যতম প্রার্থী বিষ্ণু দত্ত (২৯৪ ভোট) পরাজিত হন।

৭। **১৭-১-১৯৫৪-এর নির্বাচন**

পুর নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান গৃহীত হবার পর ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে উত্তরপাড়া বিধান সভা কেন্দ্রে কমিউনিষ্ট পার্টির মনোনীত প্রার্থী কংগ্রেস প্রার্থী উত্তরপাড়া নিবাসী অমর মুখার্জীকে ৫,৭৯৪ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন এবং শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে তুষার চ্যাটার্জী (কমিউনিষ্ট পার্টির প্রার্থী) কংগ্রেস প্রার্থী শচীন চৌধুরীকে ৮,৯৩৬ ভোটে পরাজিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭-৪৮ সালে কোন্নগরে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির পত্তন হয়ে গেছে। এই জয়ের ফলে কোন্নগর ও তার সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক ভারসাম্য কমিউনিষ্ট তথা বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে নিশ্চিত ও স্থায়ীভাবে চলে আসে। আর জীবনের সবক্ষেত্রে যথা শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং ছাত্রযুব ও মহিলা সংগঠনের ব্যাপারে এই শক্তি নিজ শক্তি ও প্রভাবকে প্রসারিত করে এবং এই ধারা অনুসরণ করে নাগরিক জীবনের সমস্যা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

এমন সময়ে পুর নির্বাচনের কথাবার্তা আরম্ভ হয়। তখন ১৯৫৩ সালের শেষে ওয়ার্ডভিত্তিক প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি গঠিত হয় প্রধানত কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থক এবং প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন যুবকদের নিয়ে (প্রধানত) —তারক দাস চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে। এর পর কোন্নগরের নানা অঞ্চলে নাগরিকদের সভা হয়। সেই সভাগুলিতে পুরজীবনের নানা বিষয়ের উপর আলোচনান্তে দুইটি ওয়ার্ডে ব্যাপক ভিত্তিতে ২টি ওয়ার্ড কমিটি গঠিত হয় ১নং ওয়ার্ড ও ২নং ওয়ার্ডে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে (বিমল বসু)

গদাধর মজুমদার এবং নীলমণি ব্যানার্জী ও শ্যামসুন্দর বসু। উভয় কমিটিব যুক্তসভা থেকে প্রথম কাজ হিসাবে এক সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্মিলিত ব্যাপাব উন্নয়ন কর্মসূচী (Programme) গৃহীত হয়। সমিতির পক্ষ থেকে দুই ওয়ার্ডেব মোট ১২ জনের প্রার্থী তালিকা ও একই নির্বাচনী ইস্তেহার (manifesto)। প্রার্থী তালিকা—

১নং ওয়ার্ড— অমিতাভ মুখার্জী
রমণীকান্ত চক্রবর্তী
বিমল মুখার্জী
গঙ্গানারায়ণ চ্যাটার্জী
পঞ্চানন গাঙ্গুলী

২নং ওয়ার্ড— বলরাম পালিত
বিষ্ণুপদ দত্ত
জিতেন্দ্রনাথ মিত্র
বমেন্দ্রনাথ মিত্র
সমর কুমার মিত্র
তারক দাস চ্যাটার্জী

(জ্যোতির্ময় মুখার্জী দুই দল কর্তৃক সমর্থিত)

দ্বাদশ মন্দিরেব প্রকাশ্য সভায় প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

৮। ১৭ই জানুয়ারী ১৯৫৪ তে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১নং ওয়ার্ডে ৬টা আসনের মধ্যে একটিতে অমিতাভ মুখার্জী এবং ২নং ওয়ার্ডে ৬টা আসনেই সমিতি বিজয়ী হয় বিপুল ভোটের ব্যবধানে। প্রতিপক্ষ ছিলেন কংগ্রেস পরিচালিত করদাতা। পল্লীকল্যাণ সমিতির ও নির্বাচনী ইস্তেহার ছিল। ২নং ওয়ার্ডে তিনজন নির্দল প্রার্থী ছিলেন (তাঁরা পরাজিত হন) আর দুই দলের সমর্থিত প্রার্থী জ্যোতির্ময় মুখার্জী জয়ী হন আর নির্দল প্রার্থী তুলসী ব্যানার্জী জয়ী হন।

৯। ৮.৩.১৯৫৪ তারিখের পুর অধিবেশনে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে তারক চ্যাটার্জী ও অমিতাভ মুখার্জী যথাক্রমে পুরপ্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচিত হন।

এরপর সমিতি পরিচালিত বোর্ড সমিতির নেতা ও কর্মীদের সক্রিয় সহযোগিতায় নির্বাচনী ইস্তেহারের ধারাগুলিকে অনুসরণ করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজে ব্রতী হয়। বিরোধী পক্ষ সব সময়েই বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করে—তাদের নীতি হল opposition for opposition's sake। এমন কি কোন উন্নয়নমূলক কাজে তারা কখনও সহযোগিতা করে নি।

উন্নয়নের কাজ নির্দিষ্ট পথে চলতে থাকে— ১৯৫৫ সালে ৭ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকার প্রথম জলকল প্রকল্পের কাজ শুরু হয় ; ১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভাড়া বাড়িতে ৬ বেডের মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন হয় ; সাধারণ এসেসমেন্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সমাধা হয়। শিবচন্দ্র সাধুখাঁ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ (১৩৬০ বঙ্গাব্দের পয়লা বৈশাখ) ; পুর কর্মচারীদের জন্য সম্মানজনক বেতনের স্কেল ও গ্রেড চালু, স্নানের ঘাটগুলির সংস্কার প্রভৃতি।

১০। **এর পর ১৯৫৮ সালের জানুয়ারীর নির্বাচনের** ফলাফলে দেখা গেল যে, ১২ জন জয়ী প্রার্থীদের মধ্যে ১১ জনই হলেন প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির—আর একজন বিরোধী পক্ষের অর্থাৎ করদাতা সমিতির। এটা নিশ্চয়ই সমিতি পরিচালিত বোর্ডের সাফল্যের দ্যোতক। আর একটি বৈশিষ্ট্য সমর মিত্র যিনি ১৯৫৪ সালে সমিতির প্রার্থী রূপে সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে জয়ী হন তিনি বিরোধী পক্ষের প্রার্থী হওয়ার ফলে পরাজিত হন।

পূর্বের মত তারক দাস চ্যাটার্জী ও অমিতাভ মুখার্জী আবার যথাক্রমে পুরপ্রধান ও উপপ্রধান পদে নির্বচিত হন এবং এরপর তারক দাস চ্যাটার্জী চন্দননগর নিগমের অফিসারের পদ গ্রহণ করলে—অমিতাভ মুখার্জী ও বিষ্ণু দত্ত যথাক্রমে পুরপ্রধান ও উপপ্রধান পদে বৃত হন।

এই বোর্ডের কার্যকালেই সরকারী নির্দেশে কোন্নগরে ১৫টি এক আসন যুক্ত ওয়ার্ডের সৃষ্টি হল। এবং প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হল। (যা ছিল অনের দিনের দাবী)।

১১। এই বোর্ডের কার্যকালে উল্লেখযোগ্য কাজ—

- প্রথম জলকলের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ন।
- ১২জুন ১৯৬০ মাতৃসদনের নূতন ভবনের উদ্বোধন এবং সর্বসাধারণের অস্ত্রপ্রচারের ব্যবস্থার প্রচলন।
- ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসবের তিনদিন ব্যাপি অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান থেকে যে ২,৪৭৯/- টাকা সংগৃহীত হয়—তা পরবর্তী কালে রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়।
- রাস্তা মেরামত ও নূতন গৃহীত রাস্তা নির্মাণ (দুই তৃতীয়াংশ সরকারী সাহায্য)।
- শম্ভু চ্যাটার্জী শ্মশানের উত্তরে দ্বিতীয় শ্মশান ঘাট নির্মাণ।
- একটি এম্‌বুলেন্স প্রচলন প্রভৃতি।

এই বোর্ডের কার্যকলাপ সুষ্ঠুভাবে চলছিল। কিন্তু ১৯৬২ সালের ডিসেম্বর মাসে চীন ভারত সীমানা বিরোধকে কেন্দ্র করে পুর বোর্ডের সভা চলাকালে কংগ্রেসের বোর্ড সদস্য ও সমর্থকরা পুরভবন ঘেরাও করে এবং নাগরিক সমিতির সদস্যদের পদত্যাগে বাধ্য করে ও পরে পাড়ায় পাড়ায় হামলা চালায় ও অন্যতম সদস্য গোবিন্দ চ্যাটার্জীকে মিথ্যা অজুহাতে গ্রেপ্তার করায়। এ ফলশ্রুতিতে ১৯৬৩র প্রথমে পুরসভাকে সুপারসিড করে এডমিনিস্টেটর নিযুক্ত করা হয় যার কার্যকাল ১৯৬৫র জুন মাস পর্যন্ত চলে।

১২। **এরপর অবশেষে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।** এবং নির্বাচনে ১৫টি এক আসনযুক্ত ওয়ার্ডের মধ্যে নাগরিক সমিতির প্রার্থীরা ১০টি আসনে জয়ী হয় এবং কংগ্রেস মাত্র ৫টি আসনে। এথেকে প্রমাণিত হল যে, ৬২ সালের কংগ্রেসের জবরদস্তী মূলক অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপকে জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে।

এই সময়ে গোবিন্দ চ্যাটার্জী ও অম্বিকা চক্রবর্তী প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন এবং নির্বাচনী ইস্তেহার তাঁরাই প্রকাশ করেন ১৫-১১-১৯৬৪তে।

এই বোর্ডের উল্লেখযোগ্য কাজগুলি—

ক) নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল (টাউন হল)।

খ) রাইল্যান্ড কানেল সংস্কার—পশ্চিম অংশে প্রধান নিকাশী খাল।

গ) শ্মশান ঘাট ও স্নানের ঘাটগুলির সংস্কার।

ঘ) মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ।

ঙ) রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ স্থাপন।

চ) সাতুবালা প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনা (এ কে ব্যানার্জী লেন)।

ছ) অনেক রাস্তা সংস্কার।

১৩। **১৯৬৯-এর নির্বাচন**

(নাগরিক সমিতির ইস্তেহার তাং ২৩-৫-১৯৬৯)

নির্বাচনের ফলাফল—

প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি	১১ জন
কংগ্রেস	৪ জন
	১৫ জন

এরপর পুর নির্বাচন হবার যথা ১৯৭৮। কিন্তু ১৯৭৩—১৯৮১ এই আট বৎসরের মধ্যে তা হয় নি। এর মধ্যে ১৯৭০-১৯৭৭ এই কালপর্ব ছিল মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের রাজত্বকাল।

১৪। অবশেষে ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গে আসীন হবার পর ১৯৮১ সালে পুর নির্বাচন ঘোষণা করা হয়। এই দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ১২ বৎসর ধরে নানা কঠিন ও বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে সমিতি পরিচালিত বোর্ড যথাযথ ভাবে কার্য পরিচালনায় সমর্থ হয়।

এই সময়ের প্রধান প্রধান কাজগুলি—

ক) পার্ক এণ্ড প্লেগ্রাউন্ড ফর চিল্ড্রেন—সংখ্যা ১০টি যথা মিত্র পার্ক, লেনিন উদ্যান, একেরপল্লী, সর্বমঙ্গলা, নারায়ণ, সুব্রত, সুকান্ত, অমৃত, নজরুল পার্ক ও রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চের প্রাচীর বেষ্টনী।

খ) দ্বিতীয় জলকল প্রকল্প—রঞ্জন দত্ত সরনীতে ওভারহেড জলাধার (ধারণ ক্ষমতা একলক্ষ গ্যালন)।

গ) ভূগর্ভস্থ নিকাশী ড্রেন—দুইটি প্রধান রাস্তায় (C.M.D A. কর্তৃক সরাসরি নির্মাণ)।

ঘ) বেশ কয়েকটি প্রধান প্রধান নিকাশী ড্রেন (এর মধ্যে একটি C M D A. কর্তৃক সরাসরি নির্মাণ।

ঙ) অরবিন্দ পল্লীর পিচের রাস্তাগুলি C.M.D A. নিজ তত্ত্বাবধানে নির্মাণ করে।

চ) মাতৃসদন ভবনের আরো সম্প্রসারণ—এই সময়কালে ১৯৮১ সালের মধ্যে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ভবনের দ্বিতল নির্মিত হয়-তৎসহ ত্রিতলে ডাক্তার কোয়ার্টার নির্মিত হয়। ইতিমধ্যে সরকারী বাৎসরিক অনুদানও লাভ হয়।

ছ) সাতকড়ি-কুমুদিনী বিদ্যালয় ভবন নির্মিত হয়। এই কালেই সোমেন্দ্র মল্লিকের স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপনার জন্য একতল বিশিষ্ট ভবনটি পুরসভাকে দান করেন। ১৯৭২ সালে স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী বর্ষে দিল্লী প্রবাসী ডাঃ অশোক মিত্র তাঁর পিতা অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মিত্রের স্মরণে ক্রাইপার রোডে অবস্থিত একটি কক্ষ সংস্কার করার পর দান করেন সেখানে এক পাঠকক্ষ স্থাপনার নিমিত্ত।

জ) জেটি নির্মাণ ও লঞ্চফেরী প্রচলন—দ্রুত ও নিরাপদ নদী পারাপারের জন্য ১৯৭৬ সালের ১৭ই আগষ্ট ফেরীঘাটে লঞ্চ সার্ভিস চালু হয় এবং কাঠের জেটিও হয়।

ঝ) প্রথম শ্রমিক আবাস নির্মাণ হয় রঞ্জন দত্ত সরনীতে বর্তমানে যেখানে শহীদ শিশু উদ্যান অবস্থিত ঠিক তার পূর্বে।

ঞ) পুরভবন সম্প্রসারণ—নৃসিংহদাস বসুর আমলে ১৯৫১ সালে পুরভবন নির্মিত হয়। তার অন্তর্ভূক্ত ছিল একতলার দক্ষিণের তিনটি ঘর মাঝে হলঘর ও উত্তরের সেই আকারে ঘরগুলি আর পূর্বে গাড়ী বারান্দা। নূতন যে সংযোগ হয় তা হল এর পশ্চিমের ঘরগুলি (যেখানে পূর্বে গ্যারেজ ছিল)।

ট) এই সময়ের মধ্যে বাজার শ্মশান ঘাটের ব্যাপক সংস্কার হয়।

১৫। পুরনির্বাচনে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার এক আসনযুক্ত ওয়ার্ড, B.M.Act-এর গন্ডীর মধ্যে পুরসভার যা আয় তা খুবই সীমাবদ্ধ ও অপ্রতুল ছিল। তাই এই নিয়মগুলি ও তৃণমূল স্তরে অধিক ক্ষমতা প্রদান ও পুরসভার কার্যসীমার পরিধি বিস্তার যথা শিক্ষা-সংস্কৃতি-খেলাধূলা প্রভৃতির জন্য পুরসভাগুলির সমিতি— পশ্চিমবঙ্গ মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের অধিবেশন গুলির মঞ্চ থেকে বার বার এই প্রশ্ন গুলি উত্থাপনের ফল স্বরূপ ১৯৬৫ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার ও এক আসনযুক্ত ওয়ার্ডের প্রচলন হয় এবং পুর উন্নয়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে অর্থের ক্ষীণ স্রোত আসতে শুরু করে। ইতিমধ্যে নূতন নূতন এলাকায় জনবসতি হওয়ার জন্য পুর পরিষেবার ব্যয় বৃদ্ধিও হয়েছে। অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের ও প্রতীক্ষার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থ শংকর রায়ের আমলে ১৯৭০ সালে C.M.D.A.-এর জন্ম হয় এবং প্রথম দফায় কোন্নগরের ক্ষেত্রে ৫ লক্ষ টাকা ও দ্বিতীয় দফায় ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। এর পর অবশেষে ১৯৮১ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে বামপন্থী পার্টিগুলি যথা CPI, CPIM ও RSP বামফ্রন্টে মিলিত হয়ে এবং কংগ্রেস নিজ নামে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়।

১৬। ১৯৮১ সালের পুর নির্বচনের ফলাফল—

CPI (M)	—	১০
CPI	—	৩
RSP	—	১
ও নির্দল	—	১
		১৫

কংগ্রেস নির্বাচন বয়কট করে।

১৭। ১৫-৬-১৯৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল—

CPI (M)	—	৭
CPI	—	২

RSP	—	১
Cong.	—	৫
		১৫

২৩.৭.৮৬ তারিখের বোর্ড সভায় পুর প্রধান ও উপ প্রধান পদে যথাক্রমে সমীর ব্যানার্জীও ভূপেন মজুমদার নির্বাচিত হন।

১৮। ২৭-৫-১৯৯০ তারিখে নির্বাচনের ফলাফল—

CPI	—	২
RSP	—	১
CPI (M)	—	৭
Cong.	—	৫
		১৫

১৯। ৮-৫-১৯৯৫ তারিখে যে নির্বাচন হয় তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—১৯টা ওয়ার্ডের জন্ম এবং কয়েকটি মহিলা ও তপশিলী মহিলার জন্য সংরক্ষিত আসন (৬টি ওয়ার্ডে)।

নির্বাচনের ফলাফল—

বামফ্রন্ট	—	৭
কংগ্রেস	—	১১
এবং নির্দল	—	১
		১৯

এই প্রথম ৪১ বৎসর পরে নির্বাচনে বামফ্রন্ট সংখ্যালঘু হয়ে যায় আর কংগ্রেস সংখ্যাগুরু। ৪১ বৎসর ধরে প্রগতিশীল শক্তি একনাগাড়ে একটি পুরসভার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল—পশ্চিমবঙ্গে একটা নজির সৃষ্টি করেছে।

২০। এখন এই ৪১ বছরের যুগকে দুটা পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। একটা প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির যুগ অন্যটি বামফ্রন্টের যুগ। তারপূর্বে

১৯৪৪-১৯৫৪ যে যুগ তা নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের কার্যকাল। এই ১০ বৎসরের পুরসভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হল—

১৯৪৪ সালে কোন্নগরের লোকসংখ্যা ছিল ১৯,০০০ আর ১৯৯১তে তা দাঁড়িয়েছে ৭৫০০০। কোন্নগর পুরসভার জন্ম হয় ১৬ জানুয়ারী ১৯৪৪, মাত্র আটাশ হাজার টাকা বার্ষিক আয়ের সংস্থান এবং ১৫ দিনের বেতনের অর্থ—এই আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে জি, টি রোডে গঙ্গার ধারে ডাঃ শচীন্দ্র সর্বাধিকারীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে। ১৯৪৪ সালে যে সাধারণ এসেসমেন্ট হল তার এসেসর নিযুক্ত হন ননীগোপাল বসু। তাই তিনি সেবার অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে প্রার্থী হননি। তিনি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে সেটেলমেন্টের দাগ নং অনুযায়ী হোল্ডিং গঠন করে এসেসমেন্ট করেন অতি নিখুঁত ভাবে এবং বিনা পারিশ্রমিকে। তিনি এসেস্‌মেন্ট ও ডিমাণ্ড রেজিষ্টারও তৈয়ারী করেন—এই দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রেজিষ্টার ছাড়া পুরভবন নির্মাণের যাবতীয় প্লান ও এস্টিমেট তৈয়ারী করেন। ১৯৫০ সালের পুর নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকাও তাঁর তৈয়ারী (অবশ্য সে সময়ে পুর নির্বাচনে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি— যার জন্য ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়)। (১) ৪৫,০০০ টাকা ব্যয়ে ১৯৫১ সালে পুরভবন নির্মাণে কার্য সমাপ্ত হয়—একতলা বাড়ী, মাঝখানে বড় হল এবং এর উত্তরে ও দক্ষিণে মোট ৬ খানা ঘর পূর্বে গাড়ী বারান্দা ও দুটি গেট এবং ভবনের পশ্চিমে খালিজমি।

(২) এছাড়া শ্রী দুর্গা কটন মিলের পশ্চিমে নেতাজী সুভাষ রোডের ধারে শ্রমিক আবাসনের জন্য ২ বিঘা জমি acquisition পদ্ধতির মাধ্যমে ক্রয় করা হয়।

পুরসভার সূচনার সময়ের সমৃদ্ধির জন্য নৃসিংহদাস বসু ও ননীগোপাল বসু—এই দুইজনের অবদান কোন্নগরের মানুষ চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। আবার এই দুইজন কোন্নগরের অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ও জড়িত ছিলেন।

এই সমস্ত প্রশাসনিক ও উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করার ও পরবর্তী নবীন পুরপ্রধান ও সহযোগীদের মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করতেন পুরসভা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে।

২০। এরপর প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির আমল—তখন কোন্নগরের লোকসংখ্যা ২৪,০০০ এর মত, আর ১৯৮১ সালে ৫২,২০৪।

১৯৪৪-৪৫ সালে কোন্নগরের লোকবসতির যা বিন্যাস তা এইরূপ ঃ—গঙ্গার ধার বরাবর এবং কয়েকটি পাড়া বা অঞ্চলে জনবসতি ছিল ; আর তা প্রধানত ৬টি প্রধান প্রধান রাস্তাকে অবলম্বন করে। জঙ্গল ছিল কোন্নগরের উত্তর-পশ্চিমে (ধর্মডাঙ্গা বর্তমানে লেনিন সরণি অঞ্চল) ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ধান ক্ষেত (এখন যেটাকে অরবিন্দ পল্লী বলা হয় এবং যা হারান চন্দ্র ব্যানার্জী লেনের দক্ষিণে অবস্থিত) ; এছাড়া ফাঁকা স্থানগুলি ছিল—কালিতলা অঞ্চল, ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ড অঞ্চল এবং মাষ্টার পাড়া (বাগ্দীপাড়া) ও রামমোহন প্লেস অঞ্চল প্রভৃতি। বর্তমানে বনজঙ্গল ও ধান ক্ষেত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সর্বত্রই অতি দ্রুত গতিতে গৃহনির্মাণ হচ্ছে।

এখন ১৯৫৪—১৯৮১ এই কাল পর্বের (যেটা আবার প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির কাল) পুরসভার কার্যাবলী তথা উন্নয়নমূলক কাজসমূহ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। (পূর্বে নাগরিক সমিতির কার্যকলাপের বর্ণনা।

এখন ১৯৮১—১৯৯৫ অর্থাৎ বামফ্রন্টের আমলের কার্যাবলী বিবরণ দেওয়া হচ্ছে।

২১। ক) বৃক্ষরোপণ—এসময়ে ব্যাপকহারে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। সরকারের বনবিভাগের বিভিন্ন স্থানের নার্সারী থেকে বৃক্ষচারা আনা হত বছর বছর এবং সেগুলি রোপণ ও বিতরণীর কাজ চলত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি, লায়ন্স ক্লাব, যুক্তিমন, আনন্দমঠ প্রভৃতির সহযোগে ও পুরসভার সরাসরি উদ্যোগে। রাস্তার ধারে, খেলার মাঠে শিশুউদ্যানগুলিতে এবং নাগরিকদের ঘেরা জমিতে। ইষ্টক নির্মিত বৃক্ষবেষ্টনী তৈয়ারী করা হত বা মুলিবাঁশের ঘেরা।

খ) পার্ক ও প্লেগ্রাউন্ড—এই কাল পর্বে এই শিশু উদ্যানগুলি (অবশ্য সরকারী অনুদানে ও পুরসভার জমিতে)—শহীদ উদ্যান, নেলসন ম্যান্ডেলা, ক্ষুদিরাম, দেপাড়া (এখনও প্রাচীর বেষ্টিত হয়নি) এবং শিবচন্দ্র উদ্যান—জমি কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ের সৌজন্যে এবং সাংসদ সুদর্শন রায়চৌধুরীর টাকায়।

এছাড়া শিশুউদ্যানের জন্য অনেক জমি নির্দিষ্ট আছে—প্রায় ৫০টি।

গ) রবীন্দ্রভবন নির্মাণ—ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের প্রদত্ত জমি ও পুরসভা ক্রীত মোট ২ বিঘার অধিক জমির উপর আনুমানিক ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২০০ আসন যুক্ত এবং সুরম্য রবীন্দ্রভবন তৈরি করা হয় (এর মধ্যে পুরসভার নিজস্ব অর্থ ১০ লক্ষ টাকা)। ১৯৯৫ সালের ১৯শে এপ্রিল এই ভবনের উদ্বোধন হয় তৎকালীন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কর্তৃক। সভার সভাপতি ছিলেন পুরপ্রধান শ্রী সমীর ব্যানার্জী। এই ভাবে কোন্নগরের সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের অনেক দিনের স্বপ্ন রূপ পেল।

ঘ) মাতৃসদন সম্প্রসারণ—এই সময়ে সদনের পশ্চিমের annex-এর দ্বিতল এবং প্রধান ভবনের ত্রিতল নির্মাণ করা হয়। উক্ত এনেক্সের দ্বিতল নির্মাণ কাজে লন্ডন প্রবাসী শ্রী ভবেশ ব্যানার্জী মাতৃদেবী তরঙ্গিনী দেবীর স্মৃতি রক্ষাকল্পে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা দান করেন।

ঙ) হেল্‌থ সেন্টার—অরবিন্দ পল্লীর জোড়া পুকুর (C.U.D.P.-3) ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর হেল্‌থ সেন্টার নির্মিত হয়।

চ) শিক্ষা-সংস্কৃতির কার্যকলাপ—পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে ও পুরসভার সক্রিয় সহযোগিতায় ১৯৮৬ সাল থেকে (১২৫তম রবীন্দ্রজয়ন্তী) ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত রবীন্দ্র জয়ন্তী পালিত হয়।

ছ) নৃসিংহদাস বসু জন্মশতবর্ষ পালন—১৯৮২-১৯৮৪ এই সময়ের মধ্যে পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান নৃসিংহদাস বসুর জন্মশতবর্ষ পালন করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী ও শ্রীমুরারী মিত্রকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক করে শতবর্ষ উৎসব সমিতি গঠন করা হয়। এই সমিতির উদ্যোগে দুই বৎসর ব্যাপী এক বিস্তৃত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ১১/১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪ সালে দুই দিনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের সভাপতি হন সমরেন্দ্রনাথ দেব ও শঙ্কর প্রসাদ মিত্র হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি আর প্রধান অতিথিদ্বয় ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র (প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) ও শ্রীমতী পদ্মা খাস্তগীর (হাইকোর্টের বিচারপতি)। বক্তাগণ ছিলেন অধ্যাপক সুব্রত মুখার্জী, শ্রীঅমিয় নন্দী, গীতা মুখার্জী (সাংসদ) ও সন্ধ্যা চ্যাটার্জী (বিধায়ক)—সকলেই আপন আপন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। প্রতিদিন সভাশেষে বিশিষ্ট শিল্পীগণ সাংস্কৃতিক কার্য পরিবেশন করেন।

প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পুরসভার পূর্বদিকে বসু মহাশয়ের এক আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপনা করা হয়।

জ) মাষ্টারদা সূর্যসেনের-এর জন্মশতবর্ষ নিবেদিত ছাত্র-যুব উৎসব—১৯৯৪। ইহা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ দ্বারা (স্পনসর্ড) আয়োজিত। কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক এই উপলক্ষে কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয়ে ১২, ১৬ এবং ২৩ অক্টোবর ১৯৯৪ তারিখে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বিতর্ক প্রভৃতি প্রতিযোগিতা হয়।

ঝ) **প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলির ভবন সংস্কার ও সম্প্রসারণের** জন্য জেলা প্রশাসন থেকে আর্থিক সহায়তা এসেছে। পুরসভার তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কার্য সমাধা হয়—এগুলি হচ্ছে অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ, আশালতা বালিকা বিদ্যালয় (এটি দশম শ্রেণীতে উন্নীত হয়) প্রভৃতি।

ঞ) **কোন্নগর ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েসনের** ভবন নির্মাণের জন্য পুরসভা একখন্ড জমি দান করেছে। ১৯৯৪ সালে ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ট) **সোমেন্দ্র নাথ মল্লিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের** ভবনের দ্বিতলের সম্প্রসারণ হয়েছে এই সময়ে।

ঠ) **পুরসভার নূতন গ্যারেজ**—একদা যেখানে পুরসভার গোখানা ছিল সেখানে বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে নূতন গ্যারেজ নির্মাণ করা হয়। এই নির্মাণ কাজের জন্য গোখানার অন্তর্গত জমি ছাড়া জলকলের পশ্চিমে পুষ্করিণী সহ যে জমি বহু পূর্বে ক্রয় করা হয়েছিল (তখন জমির দাম খুবই কম ছিল)—তার অংশ এর অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পূর্বে পুর গ্যারেজ জি.টি.রোডে অবস্থিত ছিল (পূর্বে এর উল্লেখ করা হয়েছে)।

ড) **একাদশ হুগলী জেলা গ্রন্থ মেলা (১৯৯৪-৯৫)**—স্থান কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। পরিচালনায় হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক। কোন্নগর পৌরসভার সৌজন্যে ও সহযোগিতায়। মেলা ৭-১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫ অনুষ্ঠিত হয়। কোন্নগর পুরসভার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে এই মেলা অতিরিক্ত তাৎপর্য মন্ডিত হয়। এই মেলা পরিচালনার জন্য ৩৭ জনের এক শক্তিশালী কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়। এক ব্যাপক ভিত্তিক অভ্যর্থনা সমিতি এবং শাখা সমিতিসমূহ গঠিত হয়। প্রতিদিন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর দিন পালন করা হয়। এর মধ্যে একটা দিন থাকে জাতীয় সংহতি যা সূর্য সেনের প্রতি নিবেদিত।

পশ্চিমঙ্গের বিশিষ্ট গুণীজন ভাষণ দেন। সভা শেষে বহু সংস্থা সাংস্কৃতিব সম্ভাব পরিবেশন করে। একখানি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। মেলা প্রাঙ্গণে দর্শনার্থি ও ক্রেতার ভিড়ে উপছে পড়ে।

ঢ) **শ্মশানঘাট গুলি সংস্কার**—শম্ভু চ্যাটার্জীর ২নং শ্মশান ঘাট ও বাজার শ্মশান ঘাট দুটির চুল্লির উপর আচ্ছাদন নির্মাণ করা হয়। এবং বাজার শ্মশান ঘাটের নদীতট বাঁধান হয়।

ণ) **বিদ্যাসাগরের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন**—১৯৯১ সালে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু শতবর্ষে সারা পশ্চিমবঙ্গ এক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে কোন্নগরেও পুরসভার উদ্যোগে বিদ্যাসাগরের এক আবক্ষ মূর্তি স্থাপনা করা হয় ২৬-৯-১৯৯২ তারিখে। মূর্তি বসানো হয় কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয়ের পূর্বগায়ে জি.টি.রোডের ধারে (বেষ্টনীর মধ্যে)। স্থান নির্বাচন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ১৮৬০ সালে এই বিদ্যালয় স্থাপনা করেন আর এক স্বনামধন্য পুরুষ বিদ্যাসাগরেরই সহযোগী শিবচন্দ্র দেব।

ত) **নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল সংস্কার**—এই কালেই শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপরে সিলিং এবং বায়ু চলাচলের জন্য একযস্ট ফ্যানের ব্যবস্থা করা হয়। একটি কাঠের পাটাতন ও নির্মাণ করা হয়।

থ) **পুরভবন সম্প্রসারণ**—ভবনের দ্বিতলে টাউন হলের পশ্চিমে বাকি অংশের উপর কক্ষ গুলি নির্মাণ হয়। এই ভাবে স্থানের সংকুলান করা হয়।

দ) **সুপার মার্কেট**—কোন্নগর রেললাইনের ঠিক পূর্ব পাড়ে দান স্বরূপ প্রাপ্ত এক পুষ্করিণী ভরাট করে তার উপর ...... টাকা ব্যয়ে এক বৃহৎ মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। দ্বিতলে দক্ষিণ ব্লকে এলাহাবাদ ব্যাঙ্ককে ভাড়া দেওয়া হয় এবং ত্রিতলে শাখা পোষ্ট অফিসকে ভাড়া দেওয়া হয়। এর ফলে পুরসভার এক স্থায়ী অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয়।

ধ) **বস্তী উন্নয়ন প্রকল্প রূপায়ন**—দরিদ্র মানুষের যেখানে বাস সেই সমস্ত বস্তী অঞ্চলের পরিবেশকে উন্নত করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বস্তী উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় প্রধানতঃ চটকল অঞ্চলে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও সৌচাগার নির্মাণ করা হয়েছে।

ন) **শ্রমিক আবাসন**—এই সময় প্রথম শ্রমিক আবাসনের নিকটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় দফায় আবাসন নির্মাণ করা হয় (যদিও

তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল)।

প) **দুগ্ধের ডিপো**—সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী কোন্নগরে দুটো দুগ্ধ ডিপো স্থাপিত হয়েছে। একটা নার্স কোয়ার্টারের জমিতে অন্যটা নজরুল মার্কেটের জমিতে। ডিপো দুটিতে বাঁধা দরে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পেয়ে কিছু মানুষ উপকৃত হয়।

ফ) **হেল্‌থ কর্মী নিয়োগ**—সরকারের (CUDP III) অন্তর্ভূক্ত PP II প্রকল্পে ৩০ জন মহিলা স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। এরা নগরের নিম্ন আয়ের অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সাধারণ রোগের নিরাময়ের জন্য ঔষধ প্রদান করে এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করে। ভারি রোগের ক্ষেত্রে ভারপ্রাপ্ত সর্বসময়ের হেল্‌থ অফিসারের কাছে রেফার করে।

ব) **খাটা পায়খানা গুলিকে স্যানিটারি পায়খানায় রূপান্তর**—আধুনিক যুগে খাটা পায়খানা একেবারে বেমানান। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ মানুষের ময়লা মাথায় করে বহন করবে—এটা মানুষের অবমাননা, তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মতও নয়। তাই বেশ কিছুদিন পূর্ব থেকে এই ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থও বরাদ্দ করেছিল। বর্তমানে এই সমস্যা সম্পূর্ণ দূর হয়েছে।

ভ) **জমি ও বাড়ি ক্রয়**—মাতৃসদনের পশ্চিমের খালি জমি উত্তর—পশ্চিম দিকে প্রয়াত নন্দ দুলাল ব্যানার্জীর জমির থেকে ৬ কাঠার মতো জমি পুরসভা ক্রয় করে। এছাড়া মাতৃসদনের উত্তরে অবস্থিত এক পুরাতন বাড়ী ৫৪,০০০ টাকায় ক্রয় করা হয়েছিল। (অবশ্য বাড়িতে এখনও ভাড়াটে বাস করছে)। আর জমি ক্রয়ের সময় ২ কাঠা জমি দান হিসাবে পাওয়া গেছে।

ম) **চুনী প্রভাদেবী সরোবর**—শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে অবস্থিত রবীন্দ্র নাথ ব্যানার্জীর পুষ্করিণীটি (যেখানে কোন্নগর সুইমিং ক্লাব দীর্ঘদিন ধরে সাঁতার কেটে আসছে) কোন্নগর পুরসভা ৪০,০০০ টাকায় কয়েকটি শর্তে—যথা এটির নাম হবে বিপিন মুখোপাধ্যায়দের মাতা চুনীপ্রভা দেবীর নামে ইত্যাদি [পূর্ণ বিবরণের জন্য বিপিন মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী দ্রষ্টব্য।] ক্রয় করে।

য) **দ্বিতীয় কবরস্থান**—কালীতলা কলোনীতে রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার

আমল থেকে পুরসভার কবর স্থান আছে। পুরপ্রধান তারক দাস চ্যাটার্জীর আমলে একটা অংশে পূর্বদিকে একটা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। পরে সেই স্থানে খেলাধূলা, জনসভা প্রভৃতি হতে থাকে। আর মাঠের পশ্চিমের কিছু জমি কবর স্থান (হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই) হিসাবে ব্যবহার করা হত। কিন্তু দেশভাগের পরে কবর দেওয়ার সময় নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতে থাকে।

তাই সর্বশেষে দ্বিতীয় কবরস্থান নির্মাণ করা হয় মুসলমান পাড়ার পাশ্চিমে ১৬ কাঠা জমির উপর এক লক্ষ ১০ হাজার টাকার ক্রয়মূল্যে। কবরস্থান প্রাচীর বেষ্টিত করতে ১০,০০০ টাকা ব্যয় হয়।

র) মাতৃভবনের দ্বিতীয় দফার এনেক্সভবন—মাতৃসদনের পশ্চিমে দ্বিতল অংশ। PP VIII প্রকল্পের অন্তর্গত এডমিনিস্টেটিভ ইউনিটের জন্য নির্মিত হয়। ব্যয় হয় সরকারের।

ল) রেলওয়ে Underpass—কোন্নগর ও তার পশ্চিমের গ্রামগুলির যোগাযোগর একমাত্র পথ RLY Sub-way—বিকল্প হিসাবে তারই কিছু উত্তরে রেল লাইনে তলা দিয়ে বর্তমানে যুগোপযোগী এক উঁচু ও চওড়া Underpass নির্মাণের আনুমানিক ৪ কোটি টাকার প্রকল্প তৈয়ারী করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ১৯৯৫ সালের মে মাসে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী মাননীয় অশোক ভট্টাচার্য এর উদ্বোধন করেন। পরবর্তী কালে এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলের ও পূর্বদিকে নগরগুলির মধ্যে যোগাযোগের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটবে।

এর পূর্ব কথা হচ্ছে—রেলওয়ে কালভার্ট বা Sub-way-কে চওড়া ও উচু করার জন্য পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকে পুর সভা লেখালেখি শুরু করে। অবশেষে দীর্ঘদিন পরে একটা সুষ্ঠু সমাধান হল।

এরপর ৮-৫-১৯৯৫ সালে যে পুর নির্বাচন হয় তাতে ১৫ টি ওয়ার্ডের স্থলে ১৯টি ওয়ার্ডের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে কয়েকটি আবার মহিলা ও তপশিলী মহিলার জন্য সংরক্ষিত হয়।

এই নির্বাচনের ফলাফল নিম্নে প্রদত্ত হল—

RSP	—	১
CPI (M)	—	৬

বিদ্রোহীস্বতন্ত্র	—	১
কংগ্রেস	—	১১
		১৯

● এটি পূর্বেই ১৭ দফায় উল্লেখিত হয়েছে।

এখন **১৯৯৫—২০০০ কালপর্বে কংগ্রেস** পরিচালিত বোর্ডের আমলে উন্নয়নের বর্ণনা—(এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উন্নয়ন খাতে নানা ধরনের বিপুল পরিমানে অর্থ কোন্নগর পুরসভাকে প্রদান করেছে)।

ক) **তিনটি শিশু উদ্যান নির্মাণ**—সত্যজিৎ রায় উদ্যান, কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণে একটি এবং অন্যটি ১৯ নং ওয়ার্ডে।

খ) **বহু পিচের ও ইট বাঁধানো রাস্তার সংস্কার** এবং নূতন সৃষ্টি রাস্তা সমূহ নির্মাণ।

গ) **সাংসদের কোটার টাকায় মাতৃসদনে** X-Ray যন্ত্র ও মাইক্রোসার্জারির জন্য যন্ত্র স্থাপন।

ঘ) **নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হলের পুনর্গঠন**—৪লক্ষ টাকার প্রকল্প—তবে হলের এক তৃতীয়াংশ কেটে নিয়ে ৪টি কুটরী নির্মাণ করা হয়েছে ফলে হলের আসন সংখ্যা ৪০০ থেকে কমে ৩০০ হয়েছে আর শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে।

ঙ) **বৃক্ষরোপণ**—৫ম বর্ষে অনেক গুলি বাঁশের বেষ্টনীর মধ্যে বেশ কিছু বৃক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে।

চ) **কয়েকটি নিকাশী** নর্দমা নির্মাণ করা হয়েছে।

ছ) **গভীর নলকূপ**—আটটি গভীর নলকূপ খনন করা হয়েছে—প্রতিটি ৪৫০ ফুট গভীর আর প্রতিটির মূল্য গড়ে ৫ লক্ষ টাকা।

এরপর ২৮-৫-২০০০ তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বচনী ইস্তেহারের ভিত্তিতে তিন দলই—যথা বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও তৃণমূল কংগ্রেস নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়।

ফলাফল—

তৃণমূল কংগ্রেস	—	১১

কংগ্রেস	—	৪
বামফ্রন্ট	—	৩
নির্দল (বামপন্থী)	—	১
		১৯

উপরে ১৯৪৪—২০০০ এই ৫৬ বৎসরকাল ব্যাপী কোন্নগর পুরসভার পরিচিতি বিশদ ভাবে বর্ণিত হল—এর মধ্যে ৪টি পর্যায় বা যুগ আছে।

(১) ১৯৪৪—১৯৫০ তখন নির্বাচন হত কোন দল বা গোষ্ঠার নামে নয় এবং কোন ইস্তেহার থাকত না, (২) ১৯৫৪—১৯৮১ প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি বনাম কংগ্রেস পরিচালিত করদাতা/পল্লীকল্যাণ সমিতি—দুই দলের নির্বাচনী ইস্তেহার থাকত, (৩) ১৯৮১—১৯৯৫ বামফ্রন্ট বনাম কংগ্রেস (উভয়ের ইস্তেহারই ছিল), (৪) ১৯৯৫ সালে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠরূপে অবির্ভূত আর ২০০০ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস ও তৃণমুল কংগ্রেস—ত্রিদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই নূতন রাজনৈতিক বিন্যাসে পুরসভার জীবনে কি ভবিতব্য নিয়ে আসবে সেটা ভবিষ্যতই বলবে।

বিষ্ণু দত্ত
২০-৭-২০০০

———

পরিশিষ্টঃ— কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধান ও উপপ্রধানগণের নামের তালিকা এতৎসহ যুক্ত হল।

কোন্নগর পুরসভার পুরপ্রধানগণ

(দশ বৎসর)১ নৃসিংহদাস বসু (১৬-১-৪৪ — ১৯৫৪)
(নির্বাচন অনুষ্ঠিত ১৭-১-৫৪)

(ছয় বৎসর) ২ তারক দাস চ্যাটার্জী (১৭-১-৫৪ — ২৮-১১-৫৯)
(নির্বাচন অনুষ্ঠিত জানুয়ারী, ৫৮)

(দশ বৎসর) ৩ অমিতাভ মুখার্জী	(২৮-১১-৫৯ — ১৯৬৯) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ২৩-৫-১৯৬৯)
(বার বৎসর) ৪ বিষ্ণু দত্ত	(১৯৬৯ — ১৯৮১) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ১৯৮১)
(পাঁচ বৎসর) ৫ বাসুদেব ইন্দ্র	(১৯৮১ — ১৯৮৬) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ১৫-৬-৮৬)
(নয় বৎসর) ৬ সমীর ব্যানার্জী	(২৩-৭-৮৬ — ১৯৯৫) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ১৫-৬-৮৬ ও ২৭-৫-১৯৯০)
(তিন বৎসর) ৭ স্বপন হরি	(৮-৫-৯৫ — ২২-৬-৯৮) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ৮-৫-৯৫)
(দুই বৎসর) ৮ স্বপন দাস	(৯-৭-৯৮ — ২০০০ এবং ২৮-৫-২০০০) (নির্বাচন অনুষ্ঠিত ২৮-৫-২০০০)

———

উপ পুরপ্রধানদের নামের তালিকা

(বৎসর)

১।	ননীগোপাল বসু	১৬-১-১৯৪৪ — ১৯৫০ (৫২-৫৩)
২।	নীলমণি ব্যানার্জী	১৯৫২/৫৩ — ১৯৫৪
৩।	অমিতাভ মুখার্জী	১৭-১-৫৪ — ২৮-১১-৫৯
৪।	বিষ্ণু দত্ত	২৮-১১-৫৯ — ২৩-৫-৬৯
৫।	বাসুদেব ইন্দ্র	২৩-৫-৬৯ — ১৯৮১
৬।	ভূপেন্দ্র মজুমদার	১৯৮১— ১৯৯৫
	(নির্বাচন অনুষ্ঠান ১৫-৬-৮৬ এবং ২৮-৫-৯৫)	
৭।	ভক্তিব্রত ভট্টাচার্য	২৮-৫-৯৫ — ২৮-৫-২০০০
		(নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৮-৫-২০০০)
৮।	অমিত ব্যানার্জী	২৮-৫-২০০০ —
		(নির্বাচন অনুষ্ঠান ২৮-৫-২০০০)

———

অনুচ্ছেদ—৩

আধুনিক কোন্নগরের জনক শিবচন্দ্র দেব ঃ

রথিন চক্রবর্তী

আধুনিক কোন্নগরের জনক শিবচন্দ্র দেব

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম আর শেষের দশক দুটো বাদ দিয়ে বাকি পুরো শতাব্দীর প্রায় ঊনআশী বছরটা ধরে ছিল তাঁর জীবনের ব্যাপ্তি। এই কোন্নগরে তিনি থেকে ছিলেন প্রায় পঞ্চাশটা বছর। বাকি সময়টা পড়াশোনা ও চাকরির কারণে তাঁকে বাইরে বাইরেই থাকতে হয়েছিল। বাল্যকালে প্রথম তেরটা বছর বাদ দিলে বাকি ছত্রিশ সাঁইত্রিশ বছর তিনি নিজেকে কোন্নগরের সেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন। পরবর্তী শতাব্দীর মানুষ তাঁর এই সেবার অবদান স্মরণ করতে গিয়ে তাঁকে এক নতুন নামে অভিভূত করলেন—আধুনিক কোন্নগরের জনক। এই অভিধা যে সার্থক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন আমরা তাঁর জীবনালেখ্য অবলোকন করি।

বারাকপুরের পাশের চানক গ্রাম থেকে কোন্নগরে চলে এসেছিলেন অলঙ্কার দেব মজুমদারের বংশধর নিধিরাম দেব। গঙ্গা তীরবর্তী কিছু এলাকা নিয়ে ছিল তখনকার কোন্নগর গ্রাম। উত্তরে কোন্নগর ছিল মূলতঃ ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকা। দক্ষিণ ছিল কায়স্থ প্রধান। মধ্যবর্তী এলাকা কিছু নিম্নবর্ণের জাতি অধ্যুষিত। এই মধ্যবর্তী অঞ্চলে অনেকখানি জায়গা কিনে নিয়ে সেখানেই বসতি স্থাপন করলেন নিধিরাম দেব। পাড়াটার নাম হয়ে গেল দেব পাড়া। সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ।

এই নিধিরাম দেবের এক পুত্র ছিলেন ব্রজ কিশোর দেব (১৭৫১-১৮৬৪)। কর্মজীবনে তিনি ইষ্ট ইন্ডিয়া কমিশারিয়েট বিভাগে সরকার পদে চাকরি করতেন। অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীর রসদ ইত্যাদি সরবরাহ দপ্তরেই কেটেছিল তাঁর কর্মজীবন। সেই জন্যে তাঁর জীবনে ঘটেছিল ইংরেজ সান্নিধ্য। ইংরেজী ভাষা ও জীবনধারা তাঁর আয়ত্ত হয়েছিল। তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক কঠোর নিয়মানুবর্তী ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছিল চার ছেলে—ভৈরব চন্দ্র, মহেশ চন্দ্র, ঈশ্বর চন্দ্র ও শিবচন্দ্র।

এই শিবচন্দ্রই পরে আধুনিক কোন্নগরের জনক হিসেবে অভিহিত হয়েছিলেন।

শিবচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৮১১ সালেব ২০ জুলাই। ব্রজ কিশোর যে পদে কাজ করতেন সেই পদে তখন যথেষ্ট আয় ছিল। সেই কারণে তিনি ছিলেন অবস্থাসম্পন্ন গৃহস্থ। গ্রামে তখন ভাল পাঠশালা ছিল না। উত্তর কোন্নগরে ছিল সংস্কৃত শিক্ষার টোল। কায়স্থ শিবচন্দ্রের সেখানে পড়বার অধিকার ছিল না। আর ব্রজকিশোর বোধহয় ছেলের সে রকম শিক্ষায় আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ছেলের জন্যে বাড়িতে গুরু মশায় নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁরই কাছে শিবচন্দ্রের বাল্য শিক্ষা হয়েছিল। শিবচন্দ্রের এগার বছর বয়সে তাঁর মা মারা যান। ব্রজকিশোর সেই সময়ে ছেলের পড়াশোনার দিকে তেমন নজর দিতে পারেন নি। ছেলে একটি লিখিত ইংরেজী আবেদন পত্রে বাবার কাছে কলকাতায় গিয়ে ইংরেজী স্কুলে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে বাবা শিবচন্দ্রকে তাঁর তের বছর বয়সে ১৮২৪ সালে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বাগবাজারে রীড সাহেবের ইংরেজী স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

শিবচন্দ্র খুব খুশী হলেন না। কলকাতায় তখন সবদিক দিয়ে নাম করা স্কুল ছিল হিন্দু কলেজ। ১৮১৭ সালে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ছেলের অসন্তুষ্টিকে বাবা সম্মান জানিয়ে ১৮২৫ সালে তাঁকে হিন্দু কালেজে ভর্তি করে দিলেন। সেখানে তিনি পড়াশোনা করেছিলেন ১৮৩১ সাল পর্যন্ত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি এবং প্রবেশিকা পরীক্ষাও শুরু হয়নি। ফার্স্ট ক্লাস বা ক্লাস-টেন এর পড়া শেষ হলে বিদ্যালয়ের পাঠ্য জীবন শেষ হত। এইখানেই পড়ার সময়েই তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ডিরোজিওর মত শিক্ষককে, এবং সহাধ্যায়ী হিসেবে পেয়েছিলেন পরবর্তী যুগের বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ (১৮১৫-৬৮), রেভারেণ্ড কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫), রসিক কৃষ্ণ মল্লিক (১৮২০-৫৮), রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-৯৮), দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (১৮১৪-৭৮) এবং প্যারী চাঁদ মিত্র (১৮১৪-৮৬) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে।

হিন্দু কালেজের পাঠ শিবচন্দ্র শেষ করেন ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সরকারের জি টি সারভে অফিসে ৩০ টাকা বেতনে

কম্পিউটারের কাজে যোগদান করেন। এরপর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুযায়ী ভারতীয়দের প্রশাসনিক উচ্চপদে যোগদানের অধিকার স্বীকৃত হলে শিবচন্দ্র ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ডেপুটি কলেক্টর-তৃতীয় শ্রেণী পদে নিযুক্ত হন এবং বালেশ্বরে দপ্তরে যোগদান করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পদোন্নতি হয়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি কলেক্টর হয়ে মেদিনীপুরে বদলি হয়ে আসেন আর তার পরে ১৮৪৯ সালে ডেপুটি কলেক্টর প্রথম শ্রেণীর পদে উন্নীত হয়ে ১৮৫০ সালে কলকাতা সন্নিহিত চব্বিশ পরগণার আলিপুর অফিসে যোগদান করেন।

তখনকার ভৌগলিক ও যোগাযোগ পরিস্থিতির হিসেবে এতদিন কোন্নগরের সঙ্গে তাঁর বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। সেই ১৮২৪-এ যে তিনি কোন্নগর ছেড়েছিলেন তারপর থেকে এই ১৮৫০ পর্যন্ত দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি ছিলেন কোন্নগরের বাইরে। কলকাতায়, বালেশ্বরে ও শেষে মেদিনীপুরে।

ইতিমধ্যে ১৮৪৬ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হলে তিনি কোন্নগরে পিতামহ নিধিরাম দেব নির্মিত আদিবাড়ির সন্নিকটে দেব পরিবারের একটি ভূখণ্ডে নিজ গৃহ নির্মাণে তৎপর হন (১৮৫০ সালে), ১৮৫২ সালের ২২শে মে নতুন গৃহে প্রবেশ করেন, যেটির বর্তমান নাম 'গৌরধাম'।

ছাত্রজীবনেই পরিহিতব্রতকে নিজের জীবনাদর্শ করে নিয়েছিলেন শিবচন্দ্র এবং ঠিক করে নিয়েছিলেন স্বগ্রামের ক্ষুদ্র পরিসরই হবে তার আসল কর্মক্ষেত্র। আলিপুর থেকে সপ্তাহ শেষে তিনি নৌকাপথে কোন্নগরে আসতেন এবং স্থানীয় গণ্য মান্যদের নিজগৃহে আমন্ত্রণ করে কোন্নগরের উন্নতি বিষয়ে আলোচনা করতেন।

এই ভাবেই আলোচনা করে তিনি ১৮৫২ সালের ১১ই জুলাই স্থাপন করলেন কোন্নগর হিতৈষিনী সভা। প্রচার বিমুখ শিবচন্দ্র এই সভার সভাপতি বা সম্পাদকের পদ গ্রহণ না করে কেবল মাত্র ধন রক্ষকের পদে গ্রহণ করলেন। উদ্দেশ্যে, সভার আর্থিক সংকটে তিনি যাতে ভরতুকি দিতে পারেন যুগ পরিবর্তনে যা আজ প্রায় অস্বাভাবিক। তখনও পৌরশাসন ব্যবস্থা চালু হয়নি। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ বিধানে কোন প্রতিষ্ঠান চালু হয়নি। উত্তরপাড়া

হিতকরী সভার মত কোন্নগর হিতৈষিনী সভা এই কাজের দায়িত্ব নিল। রাস্তা মেরামত, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সাঁকো নির্মাণ, দস্যু তস্কর নিবারণের জন্য সর্দার পাইক নিযুক্ত করা, শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা পানীয় জলের জন্য নির্দিষ্ট পুষ্করিণী পরিষ্কার রাখা, মাদক দ্রব্যের প্রসার রোধের প্রচেষ্টা করা—ইত্যাদি বহুবিধ কাজের সূচনা করেছিল এই হিতৈষিনী সভা। কিন্তু তিন বছরের বেশী এই সভা বাঁচেনি। ঠিক কি কারণে এই সভা উঠে গিয়েছিল আজ আর তা জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায় যে ব্রাহ্ম শিবচন্দ্রর এইসব প্রচেষ্টাকে সনাতন হিন্দু ধর্মের কুলপতিরা খুব ভাল চোখে বোধ হয় দেখেন নি। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন দয়ালচন্দ্র শিরোমণি।

যাইহোক এ সত্ত্বেও শিবচন্দ্র ইতিমধ্যেই নিজ ভূখণ্ডে এবং প্রায় তাঁর একক প্রচেষ্টায় গ্রামে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। নিজেই দিয়েছিলেন ৪০০০টাকা। ১৮৫৪-এর ১লা মে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কোন্নগর সেমিনারি। পরে এর নাম বদলে হয়েছিল কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়। ইতিপূর্বে গ্রামে একটি বাঙ্গলা স্কুল ছিল। ইংরেজী স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে সরকার ঐ বাঙ্গলা স্কুলটি তুলে দেন। কিন্তু শিবচন্দ্র ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেও বাঙ্গলা স্কুলটি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি চেষ্টা করে ১৮৫৮ সালে আবার বাঙ্গলা স্কুলটি চালু করেন। শিক্ষার মান উন্নত রাখার জন্য তিনি কলকাতার নামী দামি শিক্ষকদের সাহায্যে ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়ানোর ব্যবস্থা করতেন।

শিবচন্দ্র পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন। তাই তিনি একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠারও উদ্যোগ নিলেন। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ভবনেই ১৮৫৮ সালে একটি পুস্তকালয়েরও প্রতিষ্ঠা করলেন। যা এখন নিজস্ব বাড়িতে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম নামে প্রতিষ্ঠিত আছে।

স্ত্রী শিক্ষা বিষয়েও শিবচন্দ্রের ছিল অপরিসীম আগ্রহ। ১৮২৬ সালে তাঁর বিয়ের পর বালিকা বধূ অম্বিকা দেবীকে তিনি লিখতে পড়তে শিখিয়ে ছিলেন। কন্যাদেরও তিনি যথোচিত শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। কাজেই গ্রামের বালিকাদের জন্য তিনি ১৮৬০ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে নিজের বাড়িতে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। প্রথম কিছুদিন নিজের ঘোড়ার গাড়ীতে মেয়েদের স্কুলে আনা এবং বাড়ি পৌঁছানোর কাজও

তিনি করিয়েছেন। গ্রামবাসীর সন্দেহ নিরসনের জন্যেই তিনি বিদ্যালয়টির হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় নাম রেখেছিলেন কারণ-গ্রামবাসী তখন হিন্দু কলেজের এই সব প্রাক্তণ ছাত্রদের ভীষণ ভয় পেত পাছে তারা ধর্মনাশ করে। কিছু কাল পরে নিজের আর একটি ভূখণ্ডে তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্যই প্রথম বাড়িটি নির্মাণ করেছেন। স্কুলটি এখনও সেই ভূখণ্ডেই আছে।

এ দেশে প্রথম রেলপথের সূচনা হয় ১৮৫০ সাল নাগাদ; পত্তন হওয়া হাওড়া-হুগলী রেলপথে প্রথম গাড়ী চলে ১৮৫৪ সালে। যে কটি স্টেশন প্রথম চালু হয়েছিল তার মধ্যে ছিল বালী ও তারপরের ষ্টেশন শ্রীরামপুর। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে তখন কোন জন বসতিই প্রায় ছিল না। কাজেই কোন্নগর নামে কোন স্টেশনও হয়নি। প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি কালেক্টর শিবচন্দ্র এই নিয়ে রেল কোম্পানী ও সরকারের দরবার করলেন। তাঁর যুক্তি ও অনুরোধ মেনে ১৮৬৫ সালে কোন্নগরে স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হল, যদিও কোনও অজ্ঞাত কারণে রেল লাইনের পূর্বদিকে জমি না পাওয়ায় রেল কর্তৃপক্ষ তাদের তৎকালীন পূর্বদিকে স্টেশন বিল্ডিং গড়ে তোলার নীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে পশ্চিমদিকে একটা কাছারি বাড়িতে স্টেশন অফিস খুলেছিলেন। পূর্বদিকের জমির মালিকরা হয়ত শিবচন্দ্রর প্রয়াসকে কোন কারণে ভাল চোখে দেখেন নি।

ছেলেদের স্কুল মেয়েদের স্কুল, লাইব্রেরী, রেল স্টেশন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা ছাড়াও জন জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় ডাকঘর (১৮৫৮) দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যালেরিয়া প্রকোপ কিছু কমে গেলে ১৮৮১ সালে সরকার ওই ডিসপেন্সারি তুলে দেয়। তখন ১৮৮৩ সালে তিনি নিজ ব্যয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

জনজীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য তিনি হিতৈষিনী সভার সাহায্যে রাস্তা ঘাট, পয়ঃ প্রণালী ইত্যাদি সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।। কিন্তু সেই সভা ওঠে যাওয়ার ফলে ঐ কাজে আর মনোযোগ দিতে পারেননি। পরে যখন ১৮৬৪ সালের তিন আইন (Act III 1864) অনুযায়ী ১৮৬৫-তে শ্রীরামপুর ও উত্তরপাড়া পৌরসভা গঠিত হয় তখন শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর থেকে তালুকদার শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সঙ্গে শ্রীরামপুর পৌরসভা মনোনীত

সদস্য হন এবং এইসব কাজে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

শিবচন্দ্র ভারতীয়দের অধিকার প্রাপ্তি বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলে তিনিই প্রথম ১৮৭৩ সালের মে মাসে পৌরসভার এক সভায় নির্বাচিত পৌরসভা গঠনের দাবী জানান। সরকার তাঁর দাবী স্বীকার করে ১৮৭৩ সালের নভেম্বরে নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। কোন্নগর থেকে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।

আর একটি ঘটনায়ও তাঁর এই রকম অধিকার বোধ সংক্রান্ত মনোভাবের প্রতিফলন ঘটে। সিপাহী বিদ্রোহ চলাকালে একদিন যখন তিনি ট্রেনে কলকাতা যাচ্ছিলেন তখন কয়েকজন ইংরেজ ভারতীয়দের খুব গালমন্দ করছিলেন। শিবচন্দ্র যুক্তি সহযোগে নম্রভাবে এঁদের প্রতিবাদ করেছিলেন যা তখন কোন সরকারি চাকুরিজীবী ভারতীয় করার সাহসই পেত না। শিবচন্দ্রকে এর জন্যে পরে অনেক কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল। তবুও তিনি তাঁর বক্তব্য প্রত্যাহার করেননি।

জনজীবনের জন্য যে কাজ তিনি হিতৈষিনী সভা মারফৎ করতে পারেননি সেই কাজ তিনি এবার পৌরসভার মাধ্যমে করার প্রয়াস নিয়েছিলেন। শ্রমজীবী জনসাধারণের শিক্ষার জন্য তিনি একটি অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যদিও ছাত্রের অভাবে পরে সেটা উঠে যায়। পৌর কর্তৃপক্ষের কাছে নাগরিকরা যাতে তাদের অভাব অভিযোগ জানাতে পারে তার জন্য ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রেটপেয়ার্স এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সমাজ হিতৈষণার এই সব কাজ নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের এক মহান দিক। বেন্থাম, মিল-এর যে হিতবাদী তত্ত্ব—গ্রেটেষ্ট গুড টু গ্রেটেষ্ট নাম্বার এ দেশের গুণীজনদের প্রভাবিত করেছিল তারই অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন শিবচন্দ্র।

কিন্তু এই কর্মকাণ্ডই তাঁর জীবনের সব নয়। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অনেক বড়। নিজে বড় হব, একজন নামী দামী লোক হব, অনেক অর্থ রোজগার করব, এই সব আকাঙ্ক্ষার থেকে তাঁর কাছে অনেক বড় ছিল মানব হিতৈষণা। জন কল্যাণ। আর এর জন্যে তিনি সম্মান বা কৃতজ্ঞতা

প্রয়াসী ছিলেন না। ১৮৭৬ সালে তাঁর একমাত্র পুত্র সত্যপ্রিয়র বিয়েতে গ্রামবাসীকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ব্রাহ্ম এবং ব্রাহ্মমতে ছেলের বিয়ে দিচ্ছেন অতএব গ্রামবাসী তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেছিল। সমস্ত আয়োজন নষ্ট হয়েছিল। যে গ্রামের জন্য তিনি এত করেছেন সেই গ্রাম তাঁকে এই ভাবে অপমানিত করায়ও তিনি তার কল্যাণ কর্ম থেকে নিজেকে সরিয়ে নেননি।

শিবচন্দ্র ছিলেন সত্যবাদী, মিতভাষী, মিতব্যয়ী, কর্মঠ, ধার্মিক ও উচ্চ শিক্ষিত একজন মানুষ। হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই এই গুণগুলি তিনি আয়ত্ব করেছিলেন। ওই সময়েই তিনি যুক্তিবাদী হয়েছিলেন বলে সমাতন পৌত্তলিক আচার সর্বস্ব হিন্দু ধর্মে আস্থা হারিয়ে একেশ্বরবাদী হয়েছিলেন। আবার শুধু আবেগ ও উচ্ছাস দ্বারা চালিত হবেন না বলে তাঁর অনেক সহপাঠীর মত খ্রীষ্টানও হননি। দীর্ঘদিন এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার পর ১৮৪৪ সালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে অনুরক্ত হন এবং ১৮৫০ সালে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। আবার প্রচণ্ড যুক্তিবাদী ছিলেন বলে নীতির প্রশ্নে দেবেন ঠাকুরের আদি ব্রাহ্ম সমাজ বা কেশব সেনের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ থেকে সরে এসে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার কালে উদ্যোক্তার ভূমিকা নিতে তাঁর কুণ্ঠা হয়নি যদিও আগের সমাজের প্রধানদের সঙ্গে তাঁর আজীবন সুসম্পর্ক ছিল।

শিবচন্দ্র ইংরাজী, বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফার্সী, উর্দ্দু ও ওড়িয়া ভাষা জানতেন। বাংলা ও ইংরাজীতে অনেক কিছু লিখেছেনও। বাংলায় লেখা তাঁর 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থটিও একটি উৎকৃষ্ট রচনা। এছাড়াও 'অধ্যাত্ম বিজ্ঞান' নামে একটি গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন বলে তাঁকে নানাবিধ সংগঠন ও সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকতে হয়েছিল। সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য স্থাপিত বেথুন সোসাইটি, এগ্রি-হর্টিকালচারাল সোসাইটি, প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত সুরাপান নিবারণী সমিতি, বেঙ্গল সোস্যাল এ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান রিফর্ম এ্যাসোসিয়েশন, ভারতসভা বা ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশান, ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব কালটিভেশন অব সায়েন্স, হুগলী জেলা শিক্ষা সমিতি

(সরকারী এডুকেশন সোসাইটি) ইত্যাদি সংগঠনগুলির তিনি সদস্য ছিলেন। নব্য সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষায় পরীক্ষার পরীক্ষক সমিতিরও তিনি সভ্য ছিলেন।

এক কথায় শিবচন্দ্র ছিলেন সেই রকম বিরল প্রতিভাব একজন মানুষ যাঁর কীর্তি এক একটা সমাজকে একলাফে কয়েকযুগ এগিয়ে নিয়ে যায়। মধ্যযুগীয় বাতাবরণ ছিন্ন করে কোন্নগর যে একলাফে আধুনিক যুগে প্রবেশ করতে পেরেছিল তার একমাত্র কারণ ছিলেন মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব।

লেখক ঃ রথিন চক্রবর্তী

অনুচ্ছেদ—৪

(ক) প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী ঃ

(খ) কোন্নগরে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঃ

কালীচরণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৮৮০

দেহাবসান ঃ ১৯৫৪

কালীচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯০০ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স এবং ১৯০২ সালে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন অধ্যক্ষ রাধিকা নাথ বসু, নৃসিংহ দাস বসু, ডাঃ শরৎকুমার দেব, ডাঃ প্রাণতোষ লাহা, কিশোরী মোহন ঘোষাল, ডাঃ হরিদাস মিত্র, অভিনেতা প্রকাশ মুস্তাফি ও আরো অনেকে। স্কুলের পরীক্ষায় তিনি তৃতীয় স্থান অধিকার করে পুরস্কার লাভ করেন এবং এই পুরস্কারের বই দীর্ঘদিন তাঁর কাছে সযত্নে রক্ষিত ছিল। গণিতে তাঁর অসাধারণ মেধা ছিল, তাই তাঁর সহপাঠী ও অনুজ বন্ধুরা গণিত বিষয়ে তাঁর কাছে সাহায্য নিতেন।

বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান কালীচরণ যথেষ্ট মেধা ও প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষার আশা ত্যাগ করে চাকরির জন্য সাগর পারে রেঙ্গুন চলে যান, এবং পরে নিজের যোগ্যতা ও প্রতিভা এবং কর্মনৈপুণ্যে রেঙ্গুন কর্পোরেশনে উচ্চপদস্থ চাকুরে হন। ৩১ বছর রেঙ্গুনে থাকাকালীন সেখানে তিনি বেঙ্গলী অ্যাসোসিয়েশনের নাট্য সম্পাদক হয়েছিলেন। রেঙ্গুনে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর সংগে ভালোভাবে পরিচয় ঘটেছিল। তাঁকে লেখা তাঁর একখানি ইংরাজী চিঠি জন্মশতবর্ষে Golden Book of Sarat Chandra নামে বৃহৎগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। কালীচরণ সারাজীবনে অনেক বই কিনেছেন এবং সারাদিন নানা বিষয়ে বই পড়ায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

নৃসিংহদাস বসু

জন্ম ঃ ১৫. ৯. ১৮৮২

দেহাবসান ঃ ১৮.৮.১৯৬০

নৃসিংহদাস বসু মহাশয় ১৯০০ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর সতীর্থরা ছিলেন রাধিকা নাথ বসু, শরৎ কুমার দেব, কিশোরী মোহন ঘোষাল, হরিদাস মিত্র, প্রাণতোষ লাহা, প্রকাশ চন্দ্র মুস্তাফি প্রমুখ। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে সাফল্য লাভ করেন।

নৃসিংহদাস বসু মহাশয় একজন প্রখ্যাত আইনজীবী হয়েও আইন ব্যবসায়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন নি। তিনি আইন সম্পর্কে অনেক মূল্যবান পুস্তক সংকলন ও সম্পাদনা করেছেন, এই বইগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য The Indian Succession Act. প্রভৃতি। এই সকল বই আইনের ছাত্র ও আইন ব্যবসায়ীদের খুবই সহায়ক হয়েছে।

কোন্নগরের বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানের উন্নতি ও অগ্রগতিতে তাঁর দান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি দীর্ঘকাল কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় এবং সরকারী অনুদান প্রাপ্ত (এডেড) বিদ্যালয় গুলির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৮-১৯২৫ তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের সময়ে (১৯১৭) বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে বিদ্যালয়ের নবীন দলের নেতৃত্বে ছিলেন রামধন দেব, পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। তিনিও অর্থ সংগ্রহে এঁদের সহযোগী হয়েছিলেন।

নৃসিংহদাস বসু মহাশয় যথাক্রমে সহঃ সভাপতি ও সভাপতি রূপে অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন ও পরে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যৌবনে আজীবন বন্ধু কিশোরী মোহন ঘোষালের সঙ্গে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং ছাত্রদেরও সাহিত্য চর্চায় উৎসাহিত করে তোলেন।

তিনি যৌবনে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখের আদর্শের অনুসারী ছিলেন। এক সময়ে চিত্তরঞ্জন দাশ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনে তিনি হুগলী জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য, নৃসিংহদাস বসু মহাশয় কোন্নগর পুরসভার জন্মকাল থেকে পুর সভার প্রধান হিসাবে দীর্ঘ দশ বছর (১৯৪৪-১৯৫৪) এর সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা উন্নয়ন মূলক কাজের মাধ্যমে ও স্বচ্ছ প্রশাসনিক কাজের দ্বারা পুরসভাকে গতিশীল করেছিলেন। একথা অবশ্যই স্মর্তব্য, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ও পুরসভার কার্যপরিচালনায় কোন্নগরের আর একজন সুসন্তান ননীগোপাল বসু মহাশয় তাঁর পাশে থেকে সাহায্য করেছেন। এই দুই 'বসু'র অবদান কোন্নগরের জনসাধারণ চিরদিন স্মরণে রাখবে।

১৯৫৭ সালের ২৬ জানুয়ারী কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানের দ্বার উদ্‌ঘাটন ও পীতাম্বর চ্যাটার্জী প্রদত্ত জমির উপর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের দিন তিনি হাসপাতাল তহবিলে ৫০০০/- টাকা প্রেরণ করেন, ১৯৬০ সালের ১২ জুন হাসপাতালের নোতুন দ্বাব উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন। এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্য মন্ত্রী অনাথ বন্ধু রায় নোতুন ভবনের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন।

নৃসিংহদাস বসুর জন্ম শতবর্ষ পালিত হয় ১৯৮২-৮৪ সালে। এছাড়া তাঁর স্মরণে 'নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল' নামে কোন্নগর টাউন হল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই টাউন হল প্রতিষ্ঠার ফলে কোন্নগরের নাগরিকদের অনেক দিনের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়। সাথে সাথে আধুনিক কালের কোন্নগরের অন্যতম স্মরণীয় মানুষ, যাঁর কাছে কোন্নগরবাসী নানাভাবে ঋণী তাঁর প্রতি যোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হয়। উল্লিখিত টাউন হলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এখানে দেওয়া হল ঃ নৃসিংহদাস বসুর মৃত্যুর কিছুকাল পরে ১৯৬১-৬২ সালে তদানীন্তন পুর প্রধান শ্রী অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও পুর বোর্ড আর কি ভাবে নৃসিংহদাস বসুর নামকে স্মরণীয় করে রাখা যায় এই কথা ভাবছিলেন। তখন বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুধীর কুমার বসু এম, এ ; বি, এল সুপ্রিম কোর্টের এ্যাডভোকেট, কোন্নগরের সমাজ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তিনি শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়-এর কাছে প্রস্তাব রাখেন যে যদি

তাঁর পিতার স্মৃতিতে কোন্নগরে টাউন হল নির্মাণ করা হয়, তাহলে সেই 'হল' নির্মাণের জন্য তিনি ১২০০০ টাকা দিতে রাজী আছেন। এই প্রতিশ্রুতি পাওয়ার পর পুরসভা 'হল' নির্মাণের জন্য চিন্তা ভাবনা শুরু করে। ইতিমধ্যে চীন ভারত সীমানা সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে অগণতান্ত্রিক পথে বল পূর্বক কোন্নগর পুরসভাকে বাতিল করে এড্‌মিনিষ্ট্রেটর নিযুক্ত করা হ'লে টাউন হল নির্মার্ণের পরিকল্পনা সাময়িক ভাবে স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৬৫ সালে পুর নির্বাচনে প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি আরো বিপুল শক্তিতে জয়ী হয়ে পুরসভায় ফিরে এলে টাউন হল নির্মাণের স্থগিত কাজ নোতুন উদ্যমে শুরু হয়। 'হল' নির্মাণের জন্য ৪৪,৪০০ টাকার এক পরিকল্পনা তৈরি করেন পুরসভার কন্‌সাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সরোজ মুখোপাধ্যায়, বি, ই। তৎকালীন পশ্চিম বঙ্গ সরকার কোন রকম অর্থ সাহায্যের অসম্মতি জানালে পুরসভা নিজ সামর্থ্যে প্রথম দফায় ১৪৮০০ টাকা আনুমানিক ব্যয়ের ঝুঁকি নিয়ে ২৯.১২. ১৯৬৮ তারিখে হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করে। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি দুর্গাদাস বসু এম, এ; এল, এল, বি। তার পূর্বেই শ্রী সুধীর বসু মহাশয় তাঁর প্রতিশ্রুত ১২০০০ টাকা পুর তহবিলে জমা করেন। ২০. ৬. ১৯৬৯ তারিখে এই হলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়। 'হল' নির্মাণে মোট ব্যয় হয় ২৮৯২৫ টাকা ৬৬ পয়সা। এর অনেক পরে ১৯৯০ সালে পুর প্রধান শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কার্যকালে শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য হলে উপযুক্ত সিলিং ও আরো পরে এক ছোট মঞ্চ নির্মিত হয়।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, ১৯৬৯ সাল থেকে এই 'হল'ই ছিল কোন্নগরের একমাত্র প্রশস্ত হল যেখানে যাবতীয় সভা, সম্মেলন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হোত। আর এই দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে অতি অল্প অর্থের বিনিময়ে কোন্নগরবাসীর প্রতি প্রয়োজনীয় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে।

অত্যন্ত দুঃখের কথা, ১৯৯৬ সালের ২৬ জানুয়ারীর পূণ্য প্রভাতে হঠাৎ এই হলের ছাদ ভাঙা হোল, সিলিং ও পাইপের স্ট্রাকচার সরিয়ে ফেলা

হোল। কিন্তু কোন্নগরের নাগরিকগণের, প্রাক্তন পুর প্রধান ও পুর সদস্যদের এবং নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের পুত্র কন্যা ও পরিজনদের কোন মতামত গ্রহণ করা হল না। তাই এই এক তরফা কাজের প্রতিবাদ করলেন প্রাক্তন পুর প্রধানদ্বয়, অন্যান্য পুর সদস্যগণ এবং বসু মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুধীর বসু।

এইভাবে পুরসভার প্রথম পুর প্রধান এবং যিনি ১০ বছর ওই পদে আসীন ছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় নৃসিংহদাস বসু-র নামাঙ্কিত হলের আকার খণ্ডিত করে ২/৩ অংশ রাখা হল এবং ওই খণ্ডিত হল 'নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল' হিসাবে থাকবে কিনা এই নিশ্চয়তা ১৯৯৮র জানুয়ারী মাস পর্যন্ত পুর কর্তৃপক্ষ দিতে পারেন নি। অথচ কোন্নগরে টাউন হলের কোন বিকল্প নেই। ক্রমবর্ধমান জন সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বিনোদন ও অন্যান্য সারস্বত চর্চার প্রয়োজনে একাধিক হল বা সভাঘরের প্রয়োজন একথা অনস্বীকার্য। যে কাজটা এতদিন 'নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল' করে আসছিল।

তবুও সুখের কথা, নৃসিংহদাস বসু মহাশয়ের নামটি চিরস্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে কোন্নগর পুর কর্তৃপক্ষ এই এলাকায় 'নৃসিংহদাস বসু লেন' (সংক্ষেপে এন, ডি, বসু লেন) নামে একটি রাস্তা নামাঙ্কিত করেছেন।

রচনাঃ বিষ্ণুদত্ত

জ্যোতিষ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২ আগষ্ট ১৮৮৩

দেহাবসান ঃ ১৮ জুলাই ১৯৬০

জ্যোতিষ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়-এর পিতা প্রয়াত চন্দ্রকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়-এর আদি নিবাস অধুনা বাংলা দেশের ঢাকা জেলার অন্তর্গত কয়কীর্তন গ্রামে। তিনি চাকরি করার জন্য হুগলী জেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের অন্তর্গত গরলগাছার জমিদারী সেরেস্তায় নায়েব হিসাবে কাজে নিযুক্ত হন। চন্দ্রকান্তবাবুর ১৮৯৫ সালে মৃত্যু হয়।

জ্যোতিষ বাবুর মামা তখন রাওয়ালপিণ্ডিতে সামরিক বিভাগে চাকরি করতেন। চন্দ্রকান্তবাবু প্রয়াত হলে তিনি ৫৭ জি, টি রোডের (পশ্চিম) বাড়িটি কিনে একজন বৃদ্ধ কর্মচারীর তত্ত্বাবধানে নিজের বোন ও তাঁর ছেলে মেয়েদের থাকার ব্যবস্থা করে কর্মস্থলে চলে যান। জ্যোতিষবাবু বাল্যকালে গরলগাছায় থাকাকালীন বলুহাটি স্কুলে পড়াশুনা করতেন। গরলগাছা থেকে বলুহাটি ২/৩ মাইল রাস্তা হেঁটেই যাতায়াত করতে হ'ত।

কোন্নগরে আসার পর কোন্নগর হাই স্কুলেই পড়াশুনা করেন। সে যুগে ২ টাকা জলপানি (স্কলারশিপ) নিয়ে এন্ট্রাস পরীক্ষায় পাশ করেন এবং উত্তরপাড়া কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু এক বছরের মধ্যে জ্যোতিষবাবুর মামা চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় জ্যোতিষবাবুর পড়াশোনা করা সম্ভব হয়নি এবং বাধ্য হয়ে ১০ টাকা মাইনেতে রেলে চাকরি গ্রহণ করেন। এক বছর রেলে চাকরি করার পর ১৫ টাকা মাইনাতে এ, জি, পি এণ্ড টি তে যোগদান করেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি সরকারী এস, এ, এস, পরীক্ষা দেন ও পাশ করেন। সে যুগে এই সর্বভারতীয় পরীক্ষায় ১ জন বা ২ জন পাশ করতে পারতেন। ১৯১৮ সাল নাগাদ এ, জি, পি, এণ্ড টি দিল্লিতে স্থানান্তরিত হয় এবং জ্যোতিষবাবু সেই সময় থেকে দিল্লি প্রবাসী হন, মাঝে কিছুদিনের জন্য কলকাতা অফিসেও কাজ করেন। দিল্লিতে থাকাকালীন তাঁর মেজভাই দিল্লিতে মারা গেলে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মেজ ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাঁদের একমাত্র পুত্র জ্যোতিষবাবুর কাছেই থেকে যান। তিনি ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রায় কুড়ি একুশ বছর পর্যন্ত নিজের ছেলের মতন করে লালন পালন করেন।

সেই ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম শ্রীসমরেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী (গুরো), এখনো বর্তমান, বয়স প্রায় ৭৮ বছর।

নিউদিল্লিতে ডেলি হার্ডিংজ রোডস্থ সরকারী বাংলোয় থাকাকালীন নিউদিল্লি রাইসিমা স্কুলের পরিচালন সমিতিতে প্রায় অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সভ্য ছিলেন।

চাকরি জীবনে তিনি খুবই সততা ও সুনামের সংগে কাজ করেছিলেন এবং তারই স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৩৮ সালে সরকার তাঁকে 'রায়সাহেব' উপাধি প্রদান করেন। তিনি তাঁর কর্মজীবনে এতই সুনাম অর্জন করেছিলেন যে, স্বাধীনতার পর কর্মজীবনের এক অফিসার স্যার ই, টি, কোর্ট ইংল্যাণ্ড থেকে স্টীল মিশনের চেয়ারম্যান হিসাবে ভারতে আসেন এবং কলকাতায় গ্রাণ্ড হোটেলে অবস্থান কালে জ্যোতিষ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৩৯ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর সরকার তাকে শ্রীরামপুর কোর্টে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট রূপে নিযুক্ত করেন এবং কয়েক বছর তিনি সুনামের সঙ্গে সেই কাজ করেন।

অবসরের পরে ১৯৪১/৪২ সালে বর্তমান ৫৫, ৫৫এ, ৫৫বি বাড়িটি জমি কিনে নির্মাণ করেন, বাড়ি নির্মাণ কাজের উপদেষ্টা ছিলেন কোন্নগরের আর এক সুসন্তান ও জ্যোতিষ বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু ননীগোপাল বসু মহাশয়।

অবসর জীবনে তিনি কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় কমিটিরসভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন, কোন্নগর পৌর সভার সদস্য হিসাবেও কাজ করেছেন। সবচেয়ে দীর্ঘদিন প্রায় ১২ বছর তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁরই সময়ে হায়ার সেকেণ্ডারি বিল্ডিং নির্মাণ হয়। বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসবও তাঁর আমলেই উদ্‌যাপিত হতো।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা উল্লেখ করতেই হয়, জ্যোতিষবাবুর ১৯৬০ সালে দেহাবসানের পর তাঁর শোক সভায় অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রমণী কান্ত চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন যে, ''একজন মাত্র এন্ট্রাস পাশ করা লোক যে এত নির্ভুল ইংরাজী লিখতে পারেন আমি পূর্বে কখনো দেখিনি।''

তৎকালে কোন্নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাঁর বন্ধু ছিলেন। জ্যোতিষ বাবুর সন্তান সন্ততির মধ্যে এখনো যাঁরা জীবিত আছেন তাঁরা হলেন সরোজ গাঙ্গুলি, প্রশান্ত কুমার গাঙ্গুলি ও এক কন্যা রাজস্থানের জয়পুর প্রবাসিনী।

রচনা ঃ প্রশান্ত গাঙ্গুলি

ডাঃ শরৎ কুমার দেব এল, এম, এস

জন্ম ঃ ২৬. ৭. ১৮৮৪

দেহাবসান ঃ ২. ১. ১৯৫৬

ডাঃ শরৎ কুমার দেব-এর পিতা শ্যামাচরণ দেব এবং মাতা তিনকড়ি বালা দেব। দেব পরিবারের পূর্ব নিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্বতীরস্থ ব্যারাকপুর পার্শ্ববর্তী চানক গ্রামে। ঐ গ্রামের বৃহদাংশ সেনানিবাসের জন্য অধিগ্রহণ হলে স্থানীয় অধিবাসীদের অন্যত্র বাস করতে হয়। তারই ফলে দেব পরিবারের পূর্বপুরুষদের কোন্নগর গ্রামে ১৭৭২ সালে আসতে হয়। এই পরিবারের পূর্বপুরুষ নিধিরাম দেব কোন্নগরের দেব বংশের আদি পুরুষ। শরৎ কুমার দেব পিতা শ্যামারচরণ দেবের চতুর্থ পুত্র।

শরৎ কুমার ১৮৯৫ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হন এবং ১৯০০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং বিহারী লাল বসু বৃত্তি লাভ করেন। বিদ্যালয়ে তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে রায়সাহেব রাধিকানাথ বসু. এম. এ, নৃসিংহ দাস বসু বি. এল. কিশোরী মোহন ঘোষাল বি, এল, ডাঃ প্রাণতোষ লাহা, এল, এম, এস, প্রকাশ চন্দ্র মুস্তাফী, কালিচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁরা সকলেই পরবর্তী জীবনে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শরৎ কুমার সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে এফ. এ ক্লাসে ভর্তি হন। কিন্তু পিতৃ বিয়োগ হওয়ায় পড়াশোনায় মনোযোগ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারেননি। আবার ১৯০৪ সালে মাতৃবিয়োগ হলে পড়াশোনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন।

চাক্‌রীর চেষ্টায় মিলিটারি একাউণ্টসে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে চাকরিতে নিযুক্ত হন, কিন্তু ছাত্র জীবন থেকেই ডাক্তারি শিক্ষায় প্রবল আগ্রহ থাকায় সরকারি চাকরী থেকে পদত্যাগ করে চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বোম্বাইয়ের গ্রাণ্ট মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।

এখান থেকেই ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে এল. এম. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রায় সংগে সংগেই বিহার প্রদেশে এক সরকারী হাসপাতালে চিকিৎসকের পদলাভ করেন। অল্প কিছুদিন চাকরী করার পর চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়ে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে স্বাধীন ভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক হিসাবে তাঁর পশার কোন্নগরে সর্বত্র ও আশপাশের অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে।

জীবিকা অর্জনের জন্য ডাক্তারী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হলেও প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সংগ্রহে ডাঃ দেব কোনদিনই সচেষ্ট ছিলেন না। পরন্তু সমাজ ও গ্রামের দুঃস্থ ও অভাব গ্রস্তদের সেবা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে গ্রামের জন কল্যাণমুখী কর্ম প্রচেষ্টায় গ্রহণে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সরকারী চাকরীর প্রভূত সম্মান ও প্রচুর অর্থ উপার্জনেব সম্ভাবনাকে অনায়াসে ত্যাগ করেন। কোন্নগরের কর্মজীবনে প্রবেশের কারণ স্বরূপ তাঁর সতীর্থ ও বন্ধুবর্গের অনুরোধ ও প্ররোচনা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। বস্তুতঃ, ১৮৮৮ সাল থেকে ১৯০৮ এই কালপর্বের মধ্যে যে সমস্ত যুবক কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগ কোন্নগরের খেলাধুলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির জীবনে এক অনন্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। ডাঃ শরৎকুমার দেব এঁদের মধ্যে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

গ্রামে ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই ডাঃ দেব চিকিৎসা কার্যের সাথে সাথে স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের পুণর্গঠনে উদ্যোগী হন এবং তাঁর সহপাঠী নৃসিংদাস বসু, রাধিকা নাথ বসু ও সহকর্মী অধ্যাপক নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ প্রমুখের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন। ১৯১৬ সালে পরিচালন সমিতি পুনর্গঠিত হলে পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ শরৎ কুমার দেব যথাক্রমে সম্পাদক ও সহ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে বিদ্যালয় ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ কালে লব্ধ প্রতিষ্ঠ ব্যবহারজীবী তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়-এর নিকট এককালীন ১২০০০ টাকার অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পাওয়া গিয়েছিল। মধ্যবর্তী সময়ে তারা প্রসন্ন বাবু প্রয়াত হলে তাঁর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে এই টাকা সংগ্রহ করতে যথেষ্ট বাধা উপস্থিত হয়। এই টাকা সংগ্রহের ক্ষেত্রে ডাঃ দেব ও নৃসিংহ দাস বসু

উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া বিদ্যালয় ভবন নির্মাণে সরকারী সাহায্য ১০০০০ টাকা আদায় কালেও ডাঃ দেব বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। ডাঃ দেব ১৯২৫-১৯২৭ এবং পরে ১৯৩৩-১৯৩৭ এই দু'বারের জন্য বিদ্যালয়ের সম্পাদকের পদে মনোনীত হন। এছাড়া তিনি কয়েক বছর সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহের সভাপতির পদেও বৃত হন। তিনি কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১ জানুয়ারী ১৯২২ থেকে সহ সভাপতি ও ১৯২৭-৩৬ পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।

ডাঃ শরৎ কুমার দেব কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতির পদ বেশ কিছুকাল অলংকৃত করেন। এছাড়া তিনি রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার সদস্যও ছিলেন।

চিকিৎসকরূপে তাঁর জনপ্রিয়তা ও সহৃদয়তা সর্বজনবিদিত। দরিদ্ররোগীকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা এমন কি অর্থ সাহায্য করতে তিনি কখনো কার্পণ্য বোধ করেন নি। একাধিক দরিদ্র ছাত্রকে তিনি বিদ্যালয়ের বেতন দিয়ে সাহায্য করেছেন।

পরবর্তী জীবনে ব্যয় বহুল এলোপ্যাথিক চিকিৎসা অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বগৃহে বহু রোগীকে বিনামূল্যে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও অষুধ বিতরণ করতেন।

গ্রামের সর্ব প্রকার উন্নয়ন ও জনকল্যাণ মূলক কাজ কর্মে ব্যক্তিগত ক্ষতি স্বীকার করেও তিনি সাধ্যমত অর্থ সাহায্য, সময় ও শ্রম দানে কখনো কুণ্ঠিত হন নি। এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও নিরলস চেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের দ্বারা বাজারের শ্মশান ঘাট সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করে শবদাহের যে সুব্যবস্থা করে গেছেন তা কোন্নগরের গ্রামবাসী মাত্রেই চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবে।

ডাঃ দেব সরল, নিরহঙ্কারী, সদালাপী, দৃঢ়চেতা, স্পষ্টবক্তা, ও আদর্শপরায়ণ পুরুষ ছিলেন। গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের তিনি একান্ত অনুরাগী ও শুভাকাঙ্খী ছিলেন। তাঁর কষ্টসহিষ্ণুতা অসাধারণ ছিল। যন্ত্রণাদায়ক বাত ব্যাধি ও শেষজীবনের অক্ষমতাজনিত অসহায়তার জন্য

তাঁকে কোনদিন কাতরতা প্রকাশ করতে দেখা দেখা যায় নি। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা ও অটুট মনোবলের কথা তাঁর সমসাময়িকগণের অবিদিত ছিল না। গ্রাম্য দলাদলির ফলে তাঁর প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়, কিন্তু সে জন্য.তাঁকে কখনো অনুযোগ করতে শোনা যায় নি। বার্ধক্য ও দীর্ঘকাল রোগ ভোগ সত্ত্বেও তাঁর বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি প্রখর ছিল। তাঁর সময়ের ছাত্র ও যুবসমাজের নৈতিক অবনতি ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা কি ভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে শেষ জীবনে সেই চিন্তাই তাঁকে অহরহ ব্যথিত করত। দেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ যাতে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন সে বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে প্রয়াসী ছিলেন।

ডাঃ দেব শোভাবাজার রাজবাটীর দৌহিত্রী সম্পর্কীয়া কনকলতা দেবীকে ১৯০৯ সালে বিনাপণে বিবাহ করেন। দেব দম্পতির তিন সন্তানের মধ্যে প্রথমা লীলা অল্পবয়সে মারা যান। কন্যাটি সুশীলা, সুশিক্ষিতা ও শিল্পকর্মে সুনিপুণা ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে ডাঃ দেব মর্মাহত হন। দ্বিতীয় সন্তান সুশীল কুমার বি ও. এ. সি-তে চাক্‌রীতে নিযুক্ত হয়েছিলেন ও এক সময়ে পারস্য উপসাগরস্থ বাহরিণ দ্বীপে অবস্থান করেছিলেন। তৃতীয় সুনীল কুমার ভারত সরকারের সৈন্য বিভাগ সংশ্লিষ্ট রোগ প্রতিষেধক দপ্তরে চাকরী করতেন, এই দুই সন্তানই খেলাধুলায় খুবই পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে তাঁরা উভয়েই প্রয়াত। সন্তান সন্ততিদের ভদ্র, বিনয়ী, সংযত ও সৎ জীবন যাপনে ডাঃ দেব সর্বদাই উৎসাহিত করতেন।

সঞ্চয় প্রবৃত্তি না থাকার ফলে ডাঃ দেবকে শেষ জীবনে অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। অর্থচিন্তা ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে যৌবনের বাত ব্যধির পুনরাক্রমণ ঘটে। উপরন্তু বার্ধক্যজনিত রক্তচাপেরও প্রাবল্য লক্ষিত হয় এবং সন্ন্যাস রোগের আক্রমণনে তাঁহার বাম অঙ্গ অক্ষম হয়ে যায়। স্ত্রীর ঐকান্তিক সেবায় ও যত্নে কিছুটা সুস্থ হলেও তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং প্রায় চার বৎসর কাল রোগভোগের পর আত্মীয় ও বন্ধুবর্গকে শোক সাগরে নিমজ্জিত করে ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারী বেলা ২-৩০ মিনিটে শেষ. নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর গুণমুগ্ধ বহু গ্রামবাসী তাঁর গৃহে অথবা শ্মশান ঘাটে উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। স্থানীয় জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের.পক্ষ থেকে মৃতদেহে মাল্যদান করা হয়।

ডাঃ দেবের মৃত্যুর ফলে কোন্নগরবাসী একজন অকৃত্রিম জ্ঞানানুরাগী, পরহিত ব্রতী, দীনবন্ধু সমাজ সেবককে হারাল। ডাঃ দেবও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ কোন্নগরের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এককালে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। গ্রামের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনে তাঁরা যে নিঃস্বার্থ জনসেবা ও লোকহিতৈষণার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছরে বর্তমান কোন্নগরের নির্মাতা রূপে যাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন দাবী করেন ডাঃ শরৎ কুমার দেব নিঃসন্দেহে তাঁদের পুরোগামীদের অন্যতম। দুঃখের বিষয় সে সম্মান ও শ্রদ্ধা তাঁর প্রাপ্য ছিল তা আমরা যথাযথ দিতে পেরেছি কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার, ডাঃ দেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে কোন্নগর পুরসভা তাঁর স্মরণে একটি প্রশস্ত রাস্তার নামকরণ করেন, ডাঃ শরৎ কুমার দেব স্ট্রীট।

(বিঃ দ্রঃ ১৯৫৯ সালে ডাঃ দেবের প্রথম শ্রাদ্ধ বাসরে তাঁর বন্ধুবর্গ ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের পক্ষ থেকে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত লেখার সংশোধিত রূপ।)

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ননীগোপাল বসু

জন্ম ঃ ১১. ১০. ১৮৮৫

দেহাবসান ঃ ২০. ১১. ১৯৭০

ননীগোপাল বসু কোন্নগরের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। যেমন, ১. ৪. ১৯২৩ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের প্রথম পরিচালনা ও কর্ম পরিষদের সভাপতি ছিলেন (সত্যচরণ মুখোপাধ্যায় ছিলেন সম্পাদক) এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। ১৯৩৭-১৯৪৩ পর্যন্ত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন এবং তাঁর পূর্ব্ববর্তী ও পরবর্তী সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ শরৎ কুমার দেব (১৯৩৩-১৯৩৭) ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৩-১৯৪৫)

ননীগোপাল বসুর সময়ে কোন্নগরে সাধারণের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত ভবন তৈরি হয়েছিল তার সবগুলির নক্‌শা (প্ল্যান) ও এস্টিমেট তিনিই করে দিয়েছিলেন এবং তিনি নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানেও ছিলেন। কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার (প্রথম অংশ), কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের দক্ষিণের এনেক্স ও বিনোদ ভবন, উচ্চ বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে অবস্থিত পুরাতন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের (এল, পি. স্কুল) ভবনটি যখন জি, টি, রোডের ধারে স্থানান্তরিত হয়, তখন এর নক্‌শা ও এস্টিমেট তিনিই তৈরি করে দিয়েছিলেন। উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের পশ্চিমে অবস্থিত মাল্‌টিপারপাস ভবনের নক্‌শাও তাঁর তৈরি। এছাড়া ১৯১৬-১৯১৯ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনটি যখন পুনর্নির্মিত হয় তখন বর্তমান আকারের ভবনটির নক্‌শা নির্মাণে জেলার ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করেছিলেন।

'এফ, এ পাশ করে তিনি বৃত্তি লাভ করেন এবং শিবপুর বি, ই, কলেজে ভর্তি হন। কলকাতা করপোরেশনের চিফ্‌ এস্টিমেটার রূপে দীর্ঘকাল সততা ও দক্ষতার সঙ্গে চাকরি করেন। সেই সময়ে করপোরেশনের চিফ্‌ ইঞ্জিনিয়ার

ছিলেন বি, এন, দে মহাশয়। তিনি বসু মহাশয়কে খুবই নির্ভরযোগ্য মনে করতেন; তাই তিনি বলতেন, 'he is my eye', এবং বস্তুত নিজ বিভাগে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতেন।

যৌবনে ননীগোপাল বসু মহাশয় খেলাধুলার সাথে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৪ সালে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয় এবং তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। যতীন্দ্রনাথ রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, প্রফুল্ল কুমার দেব, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র, ক্ষেত্রধন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখেরা ছিলেন তাঁর সহযোগী। কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউটের স্থাপনা কালের সময় ননীগোপাল বসু মহাশয়ের নামে একখণ্ড জমি কেনা হয়, এর থেকে প্রমাণিত হয় যে, এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠার সংগেও তিনি জড়িত ছিলেন।

সেই সময়ে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর প্রথমে যখন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি জাতীর জীবনে এক আলোড়নের ঢেউ লেগেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসেছিল, যার নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখেরা এবং এর কিছু পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো গমন ও পরবর্তী সময়ে তাঁর অন্যান্য কার্যকলাপ, এই সমস্ত ঘটনা কোন্নগরের যুবকদের মধ্যে সংঘাত ও ভাবোন্মাদনার সৃষ্টি করে তার ফলে তাঁরা স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জন কল্যাণ, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্যচর্চা, খেলা-ধুলা, বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতিতে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেন। ননীগোপাল বসুও এই ব্রতে ব্রতী ছিলেন এবং তাঁর সহযোগী ও সহকর্মীরা ছিলেন নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, ললিত মোহন ঘোষাল, বিজলী বসু, যতীন্দ্রনাথ রায়, বিপিন বিহারী চন্দ্র প্রমুখেরা।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই সময় থেকে প্রায়১৯৩৬-৩৭ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল ধরে কোন্নগরে. নবীন শিক্ষিতরা কোন্নগরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের (তখন এই অঞ্চলে এটাই একমাত্র উচ্চ বিদ্যালয় ছিল) উচ্চশ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় পরীক্ষক হতেন। এর ফলে একদিকে যেমন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের শিক্ষার মান বজায় থাকত, অন্যদিকে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতি, শিক্ষকগণ ও যুবকদের মধ্যে একটা সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠত।

আরো জানা যায় যে, ননীগোপাল বসু মহাশয়ের কাছে অনেক উঁচু শ্রেণীর ছাত্র বিনা বেতনে অঙ্ক শিখতে আসত। এও শোনা যায়, তাঁর একখানা খাতা ছিল সেই খাতায় কে, পি, বসু-র বীজগণিতের সমস্ত অঙ্ক কষা ছিল, ছাত্ররা সেই খাতার সাহায্য নিত।

সেই সময়ে বিভিন্ন সাহিত্য গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল, যেমন—ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি, লিটারারী সোসাইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও এই সব প্রতিষ্ঠানগুলির ধারাবাহিকতা বজায় থাকত না। এই সব সংস্থাগুলি আবার হাতে লেখা নানা পত্রিকা প্রকাশ করত, যথা—বাণী, আলো, সবুজ, শক্তি প্রভৃতি।

উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে ফ্রেণ্ডস্ সোসাইটি (স্থাপিত ১৯১৬) অন্যতম প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানটি আন্তঃ বিদ্যালয় পরীক্ষা সংগঠিত করত—ফলে অঞ্চল ও জেলার ছাত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছিল। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার একটা উদাহরণ ঃ ১৯৩৬ সালের ২৯মার্চ জনৈক এম, ব্যানার্জী-র সই করা শংসাপত্র, নির্দেশক কাগজে প্রফুল্ল কুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রাপ্ত উপহার পুস্তক রয়েছে। লেখকও ওই পরীক্ষায় সফল হয়ে পুস্তক উপহার পান। এঁরা ১৯৩৬ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় (তখন কোন্নগর এইচ, ই, স্কুল) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ননীগোপাল বসু ও তাঁর সহকর্মীরা যুক্ত থাকতেন। এছাড়া এঁরা বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে গিয়ে ক্লাস নিতেন।

পশ্চিবঙ্গ সরকারের আদেশে রিষড়া-কোন্নগর পুরসভা বিভক্ত হয়ে ১৯৪৪র ১৬ জানুয়ারী ১১জন সদস্য নিয়ে কোন্নগর পুরসভা জন্মলাভ করে এবং এই বোর্ডের প্রথম পুর প্রধান হলেন নৃসিংহদাস বসু ও উপ পুরপ্রধান ননীগোপাল বসু। নিয়মানুযায়ী এই বোর্ডের আয়ু ছিল এক বছর এবং নির্দিষ্ট কাজগুলি ছিল ডিমাণ্ড রেজিষ্টার এবং ভোটার তালিকা তৈরি করা। ননীগোপাল বসু মহাশয় উপ পুরপ্রধানের পদ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সেটেলমেণ্টের দাগ ও খতিয়ান নম্বর অনুসারে হোল্ডিং সমূহ গঠন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় রেকর্ড সমূহ তৈরি করেন। তাঁর প্রদর্শিত সেই পথ ধরেই এখনো পুরসভার রেকর্ড তৈরি হয়। ননীগোপাল বসুর তৈরি কোন্নগরের মানচিত্র এখনো চালু আছে, কেবলমাত্র নোতুন রাস্তাগুলি সেই

মানচিত্রের উপর আঁকা হয়েছে, প্রয়োজনে তার আকারও বড় করা হয়েছে। তাঁর তৈরি করা ভোটার তালিকা অনুযায়ী ১৯৪৫ সালে কোন্নগর পুর সভার নির্বাচন হয়।

১৯৪৫ সালের নির্বাচনে ননীগোপাল বসু মহাশয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নি। নির্বাচনের পর প্রথম নির্বাচিত বোর্ডের পুর প্রধান নৃসিংহদাস বসুর অনুরোধে গুরুত্বপূর্ণ কাজটির ভার বিনা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করে অতি নিখুঁতভাবে তা সম্পন্ন করেন এবং তারই ফলে পুরসভার আয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায় ও পুরসভা স্বচ্ছলতার মুখ দেখে।

পুরসভার কার্যকাল এক বছরের জন্য বাড়ান হয় এবং ১৯৫০ সালের নির্বাচনের পর তিনি উপ-পুরপ্রধানের পদে বৃত হন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কোন্নগর পুরসভা প্রথমে জি, টি, রোডস্থ ডাঃ সর্বাধিকারীর গঙ্গা তীরস্থ বাড়িতে ভাড়া ছিল। তারপর ১৯৫০ সালে বর্তমান স্থানে ৪৫০০০ টাকা ব্যয়ে সামনে গাড়ি বারান্দা ও ৪টি ঘর সহ একতলা পুরভবনটি তৈরি হয়, মাঝখানে হলঘর পূর্বে যেখানে বোর্ডেব সভা অনুষ্ঠিত হোত। এই ভবনের নকশা ও এস্টিমেটও ননীগোপাল বসু মহাশয় তৈরি করেছিলেন। স্বভাবত ঐ সময়ে যে সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয় সে সমস্ত তাঁরই তৈরি।

ননীগোপাল বসু মহাশয় ২৮. ৩. ১৯৬১ তারিখে পিতা সাতকড়ি বসু ও মাতা কুমুদিনী বসুর স্মরণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ কল্পে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের দক্ষিণে পি. কে. ব্যানার্জী লেনে অবস্থিত ৪১৮৪ স্কোয়ারফুট পরিমাপের একখণ্ড জমি কোন্নগর পুরসভাকে দান করেন। আনুমানিক ১৯৭০ সালে সরকারী অর্থ সহায়তায় পুরসভা ওই জমিতে সাতকড়ি-কুমদিনী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে।

১৯৫৪ সালের পুরসভা নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হননি। কিন্তু যে মানুষের কর্মই জীবনের ব্রত তাঁর পক্ষে চুপ করে বসে থাকা সম্ভব নয়। যতদিন তিনি কর্মঠ ছিলেন ততদিন গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন ও মঙ্গলের জন্য সদাব্যস্ত ও কর্মরত ছিলেন।

২২. ১১. ১৯৭০ তারিখে নৃসিংহ দাস মেমোরিয়াল হলে (কোন্নগর

টাউন হল) ননীগোপাল বসুর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণ সভার আহ্বায়ক ছিলেন (১) বিষ্ণু দত্ত, পুর প্রধান, (২) অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় (৩) কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক (৪) নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (৫) মুরারি মিত্র, সম্পাদক, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষ এবং সভার সভাপতিত্ব করেন সুধীর কুমার বসু।

ননীগোপাল বসু মহাশয়ের নাম কোন্নগরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৮৮৭

দেহাবসান ঃ ১৯৬৯

হাতিরকুল তথা উত্তর কোন্নগরের বিশিষ্ট মুখোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। ছাত্র জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শন শাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত এবং এম. এ. বি. এল। আইন ব্যবসার পরিবর্তে তিনি সমাজ সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিষ্ঠিত কলকাতার হিন্দু মিউচ্যুয়াল অ্যাসিউরেন্স কোম্পানীর সভাপতি হিসাবে দীর্ঘকাল কাজ করেছিলেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক (১৯২৩-২৭) এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘকাল যাবত ব্যাঙ্কের সভাপতি ছিলেন। এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের পূর্বে এঁর পিতৃদেবের বাগান বাড়িতে ১৪ বছর যাবত ব্যাঙ্ক বিনাভাড়ায় কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক ভিত্তি দৃঢ় হয় এবং সাধারণের মধ্যে ব্যাঙ্কের জনপ্রিয়তা বাড়ে।

তিনি কোন্নগর হিন্দু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯২২-১৯৪০ সাল পর্যন্ত সহ সম্পাদক ছিলেন এবং কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকারী সমিতির সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ্য যে সত্যচরণ বাবুর পিতৃদেব রাজেন্দ্র নাথ দীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চ পদে আসীন ছিলেন এবং উত্তর ভারতে বিখ্যাত সিমলা কালী বাড়ীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাজেন্দ্রবাবুর পিতৃদেব শ্যামাচরণ বাবুর নামাঙ্কিত কোন্নগরে শ্যামাচরণ মুখার্জী স্ট্রীট সংক্ষেপে এস. সি. মুখার্জী স্ট্রীট নামে পরিচিত।

সত্যচরণ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অমিতাভ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল কোন্নগর পৌর সভার সংগে প্রথমে উপ-পুরপ্রধান ও পরে পুরপ্রধান রূপে যুক্ত ছিলেন।

লেখক ঃ গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

রমণীকান্ত চক্রবর্তী

জন্ম ঃ ৯ এপ্রিল ১৮৯০

দেহাবসান ঃ ১৭ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬

কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (১৯২৮-৫১) রমণীকান্ত চক্রবর্তী জন্মসূত্রে কোন্নগরবাসী ছিলেন না। তাঁর জন্ম হয়েছিল উত্তরবঙ্গের রাজশাহী জেলার নাটোর মহকুমার অন্তর্গত লালোর ডাকঘরভুক্ত হাতিয়ান্দহ গ্রামে। তাঁরা ছিলেন পাশ্চাত্য বৈদিক সমাজভুক্ত ব্রাহ্মণ। তিনি ছিলেন তাঁর বাবার একমাত্র সন্তান—শৈশবেই পিতৃহীন। তাঁর বাবা রজনীকান্ত চক্রবর্তী মাত্র ২৪ বছর বয়সে এই একমাত্র পুত্র ও স্ত্রী রেখে পরলোক গমন করেন। মা ক্ষীরোদা সুন্দরী দেবী ছিলেন যশোর জেলার মেয়ে। স্বামীহারা হয়ে পুত্রকে নিয়ে তিনি শ্বশুর বাড়িতেই থেকে যান। তাঁর শ্বশুর অর্থাৎ রমণীকান্তের পিতামহ তখন জীবিত থাকলেও তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্রের অকাল প্রয়াণে তিনি তখন অপ্রকৃতিস্থ। রমণীকান্ত ও তাঁর বিধবা মায়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন রমণীকান্তর কাকা। তাঁরা ছিলেন রমণীকান্তর পিতার বৈমাত্রেয় ভাই। যৌথ পরিবারে তাঁরা সদ্ভাবের সঙ্গেই বসবাস করতেন।

রমণীকান্তর পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামের পাঠশালায়, তারপর মাইনর অর্থাৎ ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েন লালোর স্কুলে। সেখান থেকে স্কলারশিপ পেয়ে মাইনর পাশ করার পর উচ্চতর শ্রেণীতে পড়ার জন্য তিনি রাজশাহীর ভোলানাথ একাডেমীতে ভর্তি হন। রাজশাহী শহরে তাঁর থাকার জায়গা হয় রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ রাজকুমার সরকারের বাড়িতে। রাজকুমার সরকারের পুত্র ছিলেন ভারত বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্যার যদুনাথ সরকার। যেহেতু এই সরকার পরিবারের কুল পুরোহিত ছিলেন রমণীকান্তর পূর্বপুরুষরা সেই হেতু পিতৃহীন রমণীকান্তর থাকাখাওয়া ও পড়াশোনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন স্যার যদুনাথের মা। রমণীকান্তর শিক্ষা ও চরিত্র

গঠনে এই পরিবারের অবদান ছিল অপরিসীম। জ্ঞান চর্চায় ও চারিত্রিক ঋজুতায় যদুনাথের দান ছিল সর্বাধিক। স্বল্পবাক যদুনাথের উপস্থিতি ও নিভৃত জ্ঞান চর্চা তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।

ঐ বাড়িতে থেকে এবং ঐ বিদ্যালয়ে পড়ে ১৯০৮ সালে রমণীকান্ত স্কলারশিপ পেয়ে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করে রাজশাহী কলেজে এফ এ (ফাষ্ট-আর্টস) পড়েন, ১৯১০ সালে প্রথম বিভাগে এফ, এ পাশ করে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে আসেন এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে বি, এ ক্লাসে ভর্তি হন। কলকাতায় থাকতেন তাঁর বাবার মামাতো দাদা, তাঁর জেঠামশায় হরিনাথ কবিরাজ-এর বাড়িতে।

এই কলেজে পড়তে পড়তেই তাঁর বিয়ে হয় যশোর জেলার নড়াইল গ্রামের উকিল ললিত ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হিরন্ময়ীর সঙ্গে। রমণীকান্ত ইংরাজীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর অনার্স নিয়ে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে বি, এ পাশ করেন এবং ঐ-কলেজেরই দর্শনশাস্ত্রে অনার্স প্রাপ্ত হরিসত্য ভট্টাচার্যর সঙ্গে যুগ্মভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক লাভ করেন। রমণীকান্তর সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ডঃ কালিদাস নাগ, পূর্বভারত রেলপথের প্রথম ভারতীয় জেনারেল ম্যানেজার নিবারণ চন্দ্র ঘোষ, ইতিহাসের বিখ্যাত নোট বই লেখক এল, মুখার্জী (লাবণ্যলাল মুখার্জী) প্রমুখ কয়েকজন।

এরপর রমণীকান্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজীতে এম, এ পড়েন, এবং একই সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ল' কলেজেও পড়াশোনা করেন। এই সময়ে পারিবারিক কিছু বিপত্তির কারণে তাঁর আইন পড়া বন্ধ হয় এবং ১৯১৪ সালের তাঁর এম, এ পরীক্ষার ফলও খুব খারাপ হয়। তিনি এম এ-তে তৃতীয় শ্রেণী পান।

এম, এ পাশ করে রমণীকান্ত কিছুকাল বেকার থাকলেও দেশে ফিরে গিয়ে বসবাস করার কথা ভাবেন নি। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছে। দক্ষিণেশ্বর সরকার নামে একটা কোম্পানী লোহা লক্কড়ের ব্যবসা করছিল। স্যার যদুনাথের দাদা অনাদিনাথ সরকারের সহায়তায় তিনি ঐ কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায় নেমে পড়েন। কিছুকালের মধ্যে তাঁর কিছু আর্থিক সমৃদ্ধিও

ঘটে। কিন্তু ব্যবসা চালানো তাঁর চরিত্রের পক্ষে বেমানান ছিল বলে শেষ পর্যন্ত অনাদিনাথ তাঁকে ব্যবসা ছেড়ে দিতে নির্দেশ দেন।

১৯২১ সালে সারা দেশে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে রমণীকান্তও ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দলে দলে ছাত্ররা তখন সরকারী কলেজ ও বিদ্যালয় ছেড়ে জাতীয় কলেজ বা শিক্ষালয়ে ভর্তি হচ্ছিল। ক্ষুদিরাম বসু নামে একজন জাতীয়তাবাদী শিক্ষক (যিনি একসময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন) ঐ সময়ে হেদোর কাছে সেন্ট্রাল কলেজ নামে একটা জাতীয়তাবাদী কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। আন্দোলনের সুবাদে রমণীকান্তর সঙ্গে তাঁর য়োগাযোগ হয়। রমণীকান্ত অতঃপর ঐ কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক হিসাবে যোগদান করেন।১৯২৩-এর মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে যায়। ছাত্ররা আবার সব সরকারী কলেজে ফিরে যেতে থাকে। ক্ষুদিরাম বসু প্রতিষ্ঠিত কলেজের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পেলে ১৯২৪ সালে রমণীকান্ত আবার বেকার হয়ে পড়েন। স্ত্রী ও সন্তানদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে এই সময়ে কলকাতায় তিনি টিউশনি করে ভাগ্যান্বেষণ করতে থাকেন।

ঠিক এই রকম একটা সময়ে কলকাতার রাস্তায় তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যায় তাঁর স্কটিশের সহপাঠী বন্ধু হরিসত্য ভট্টাচার্যের সঙ্গে যাঁর সঙ্গে যুগ্মভাবে তিনি বঙ্কিম চন্দ্র স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। হরিসত্য ছিলেন কোন্নগরের অধিবাসী এবং কোন্নগরের সমাজ জীবনে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতিতে কোষাধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি যুক্ত ছিলেন। রমণীকান্তকে তিনি খুব ভাল ভাবে জানতেন। যখন শুনলেন রমণীকান্ত তখন বেকার তখন মুহূর্তমাত্র দেরী না করে রমণীকান্তকে তিনি কোন্নগরের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করার জন্য আহ্বান করলেন। বিদ্যালয়ের সম্পাদক তখন নৃসিংহ দাস বসু। রমণীকান্ত এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগপত্র পেয়ে ১৯২৫ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করলেন। ১৯২৮ সালে তাঁর ছাত্রজীবনের বিদ্যালয় রাজশাহীর ভোলানাথ একাডেমী থেকে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের আমন্ত্রণ পেলে সেকথা কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানালে তাঁরা ভবিষ্যতে তাঁকে এইখানেই প্রধান শিক্ষক করবেন বলে আশ্বাস

দিলেন। ব্যাপারটাকে নিশ্চিত করার জন্য তাঁরা তখন এমন একটা পদক্ষেপ নিলেন যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অভূতপূর্ব ঘটনা। তাঁরা তাঁকে ১৯২৮ এর সেপ্টেম্বর মাস থেকে জয়েন্ট হেড মাষ্টার পদে নিযুক্ত করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট এটিকে একমাত্র ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত হিসাবে অনুমোদন করে জানালেন এই রকম কোন সিদ্ধান্ত অতীতে হয়নি এবং ভবিষ্যতেও কোনদিন হবে না। ১৯৩০ সালে তৎকালীন প্রধান শিক্ষক রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পরলোক গমণ করলে রমণীকান্ত ১৯৩০-এর ৭ অক্টোবর তারিখে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। (১২.১০.৩০ এর সভা)।

লেখক ঃ রথিন চক্রবর্তী

নৈমিষারণ্য মুখোটীর সংযোজন।।

শতাব্দী প্রাচীন এমন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে যা কোনো না কোনো সাধক শিক্ষকের প্রাণপাত প্রচেষ্টায় স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত। আচার্য রমণীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় তেমনি এক বিরল সাধক শিক্ষক। এই মহান শিক্ষকের অনলস প্রচেষ্টায় কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় বিংশ শতাব্দীর কোন্নগরে এক অতি গৌরবোজ্জ্বল আসন অধিকার করেছিল।

রমণীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় ছাত্র জীবনে বিভিন্ন খ্যাতিমান অধ্যাপকের সান্নিধ্যে এসেছিলেন। দার্শনিক অধ্যাপক কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের তিনি ছাত্র ছিলেন। স্কটিশচার্চ কলেজের হেনরি ষ্টিফেন তাঁকে পড়াতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ঋষি অরবিন্দের অগ্রজ অধ্যাপক কবি মনোমোহন ঘোষকে। এই কলেজে স্বনামধন্য ইংরেজী অধ্যাপক পি, সি, ঘোষের কাছেও তিনি অধ্যয়ন করেছেন। এঁদের সাহচর্যই ভবিষ্যতে রমণীকান্তর সার্থক শিক্ষক হিসেবে গড়ে উঠবার বুনিয়াদ সৃষ্টি করে।

রমণীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয় ১৯২৫ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন

সময়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক, যুগ্ম প্রধান শিক্ষক এবং প্রধান শিক্ষক পদে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে সসম্মানে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং শিক্ষকতা শেষে ১৯৬৩তে এই বিদ্যালয়ে পরিচালন সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিদ্যালয় অন্তপ্রাণ ছিল তাঁর।

মানুষ তৈরির স্থপতি ছিলেন তিনি। দীর্ঘকাল ধরে কয়েক প্রজন্মের বহু সংখ্যক ছাত্রকে তিনি জ্ঞানদানে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। আজ তাঁরা গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। তবু বলা যায়, পিতৃহীন বালকের আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন সংগ্রামের চেয়ে সারস্বত সাধনার এই পর্যায় ছিল অপেক্ষাকৃত মসৃণ। তাই অধ্যাপনা করে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উজাড় করে দিতে পেরেছিলেন।

১৯৭৬র ১৭ ফেব্রুয়ারি এই শিক্ষা সাধকের জীবনাবসান হয়।

ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

জন্ম ঃ ১৮৮৭

দেহাবসান ঃ ১৯৪৯

ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৮৭ সালে হাওড়া জেলার বালি গ্রামে মামার বাড়িতে। পিতা চন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ১৪ বছর বয়সে ইন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন এবং এই বয়সে সংসারের কঠোর দায়িত্ব পালনে ব্রতী হন। অকালে পিতৃ-মাতৃহীন হোয়ে ইন্দ্রনাথ তাঁর কাকা ও কাকিমা যথাক্রমে দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী ও বসন্ত কুমারী দেবীর কাছে পুত্রবৎ স্নেহে লালিত পালিত হন। এই দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীই স্বপ্নদৃষ্ট হোয়ে হুগলী জেল তথা সারা পশ্চিবঙ্গের মধ্যে বিখ্যাত কোন্নগরের শকুনতলা কালীমাতার প্রতিষ্ঠাতা ও পুরোহিত। ছাত্র জীবনে তাঁর উল্লেখযোগ্য কিছু না থাকলেও তিনি যথেষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্যের অধিকারী হন।

ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেন। তৎকালীন কংগ্রেসের হুগলী জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ পদে দীর্ঘদিন আসীন থেকে দক্ষতার সাথে কার্য সম্পাদন করেছেন। তাঁরই কার্যধারায় অনুপ্রাণিত হোয়ে সেই সময়ে অনেকেই কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হোয়ে কংগ্রেসের সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন. অতুল্য ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের ইন্দ্রনাথের সাথে আলোচনা করতে একাধিকবার দেখা গেছে।

ইন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চেতনায় ছিল বিপ্লবের ভূমিকা। লবন আন্দোলন, তারকেশ্বর মহান্তদের বিরুদ্ধে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন, এ ছাড়া একাধিক রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা।

গ্রামের উন্নতি সাধনে তাঁর ছিল সজাগ দৃষ্টি। গ্রামে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থার জন্য অন্যান্য অনেকের সাথে তিনিও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ

করেছিলেন। শ্রীদুর্গা কটন মিলসের ধর্মঘট অবসানে ও শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে তাঁর কার্যধারা উল্লেখের দাবী রাখে। কোন্নগর কালীতলা এলাকা থেকে যুদ্ধের সময়ে এলাকাবাসীদের উচ্ছেদ করে 'মিলিটারী বেস ক্যাম্প' বসানোর ক্ষেত্রে তাঁর সদর্প ও বলিষ্ঠ প্রতিবাদ ও সাফল্য লাভ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কোন্নগর পাঠচক্র, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ও কোন্নগর সাধারণ পাঠাগার স্থাপনে তাঁর গৃহীত কর্মসূচি অবশ্যই স্মরণীয়।

কোলকাতার ভোলানাথ পেপার হাউস প্রতিষ্ঠা ও তার উন্নতিকল্পে ইন্দ্রনাথের প্রশংসনীয় উদ্যোগ এই প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘদিন কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন।

ইন্দ্রনাথ হেমাঙ্গিনী দেবীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁর দুই পুত্র রবীন্দ্রনাথ ও বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাহিত্য প্রেমী, তাঁর কবিতা তৎকালীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত পত্র পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হোত। রবীন্দ্রনাথের একগুচ্ছ কবিতা নিয়ে 'কবিতা কুসুম' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ তাঁর কন্যা শ্রীমতী ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন দক্ষ ফুটবল খেলোয়াড়। স্থানীয় অলিম্পিক ইনষ্টিটিউটের তিনি একজন খ্যাতনামা খেলোয়াড় ছিলেন। উভয় পুত্রই অকালে প্রয়াত হন।

কোন্নগর পুরসভা তাঁর নামে একটি রাস্তার নামকরণ করেছেন, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরণি। ইন্দ্রনাথ চক্রবতীর নাম কোন্নগরের ইতিহাসের উজ্জ্বলভাবে লেখা থাকবে।

১৯৪৯ সালে ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী হৃদরোগে আক্রান্ত হোয়ে পরলোক গমণ করেন।

লেখক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২৬. ৬. ১৮৯৮

দেহাবসান ঃ ২৯. ১১. ১৯৫৮

ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ২৬. ৬. ১৮৯৮ সালে কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কোন্নগরের বিখ্যাত বনেদী পরিবারের সন্তান ছিলেন। মা চুনীবালা দেবী ছিলেন উত্তরপাড়ার বিখ্যাত জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায়-এর ভাগনেয়ী। রাজেন্দ্রনাথের পিতা শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়-এর অকাল মৃত্যুতে পরিবারের সকল দায়িত্ব তাঁর উপর পড়ে, তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৭ বছর। কিন্তু উদ্যম ও পরিশ্রমে তিনি কারো কাছে হীন ছিলেন না। পিতার কিছু দেনা তিনি পরিশোধ করেন ও কলকাতার এক সওদাগরী অফিসে চাকরী জীবন শুরু করেন। তাঁর সততা ও উদ্যমের জন্য তিনি চাকরী জীবনে প্রভূত উন্নতি করেন এমনকি সহকারী ম্যানেজারের পদও লাভ করেন। কিন্তু আত্মসম্মানে আঘাত লাগায় তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন। এই স্বদেশী মনোভাবাপন্ন তেজস্বী পিতা এবং ব্যক্তিত্বশালিনী ও পরদুঃখ কাতর স্বভাব সম্পন্না মাতা উভয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বঙ্কিমের চরিত্র গঠনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ছাত্রাবস্থাতেই বঙ্কিম অতিশয় মেধাবী ছিলেন। ১৯১৭ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। বাংলা ও ইংরাজীতে তিনি প্রথম হতেন। এছাড়া ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠিত ফেণ্ডস সোসাইটি সংগঠিত স্থানীয় অঞ্চলের ছাত্রদের মধ্যে নানা প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় তিনি একাধিকবার পুরস্কার লাভ করেছেন। উত্তরপাড়া কলেজ থেকে আই, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সেই যুগে বিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রেরণায় বিবেকানন্দের আদর্শে ছাত্রদের জনসেবা ও লোকহিতকর কাজে উদ্বুদ্ধ করত। বঙ্কিমও সেই কর্মকাণ্ডে যোগ দিতেন।

ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বহির্ভূত অন্যান্য পুস্তক পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির

জন্য তরুণ বঙ্কিম কোন্নগর স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী স্থাপন করেন। কয়েক বছর এমনকি তিনি কলকাতায় চলে যাওয়ার পরও সেটির অস্তিত্ব ছিল, অবশেষে লাইব্রেরী পরিচালনায় কর্মীর অভাব হওয়ায় পুস্তকগুলি কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদান করা হয়। মনে হয় এটিই তরুণদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোন্নগরে প্রথম লাইব্রেরী।

ফুটবল খেলায় বঙ্কিমের খুবই উৎসাহ ছিল। শোনা যায় বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে তিনি একটি নতুন ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন, নাম দেন পাত্রবাগান ক্লাব, পরবর্তী সময়ে বর্তমানের কোন্নগর ওলিম্পিক ইনষ্টিটিউটের সংগে এটি মিশে যায়।

১৯১৯ সালে বঙ্কিম কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ (বর্তমানে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজ) শিক্ষার্থী হয়ে ভর্তি হন রাজেন্দ্রনাথের আর্থিক অনটন সত্ত্বেও পাঠে উদ্যম ও আগ্রহে ব্যয় সাধ্য চিকিৎসা বিদ্যায় ছেলেকে পাঠাতে দ্বিধা করেন নি।

কিছুদিন পরে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে। রাজেন্দ্রনাথের অভাবের সংসারে তাঁর দানশীলা স্ত্রীর বেহিসাবী খরচের জন্য উদ্বিগ্ন ছিলেন। এই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। মাতৃভক্ত পুত্র বঙ্কিম মাতার পক্ষ নিয়ে পিতার সহিত বচসা করেন। ফলে পিতার সাথে তাঁর সংঘাত লাগে এবং তিনি পুত্রকে তিরস্কার এবং তাড়না করেন, অবশেষে সম্পর্ক ছেদেব কথাও বলেন। অভিমানী পুত্র বাড়ি থেকে নিঃশব্দে হাসিমুখে বেরিয়ে যান।

কলকাতায় আত্মীয়দের বাড়িতে থাকতে পরিবারের সঙ্গে এই আত্মীদের মনোমালিন্যের আশঙ্কায় নিশ্চিত হয়ে আশ্রয় ত্যাগ করেন। এমনকি বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য গ্রহণে দ্বিধা বোধ করেন। তবুও কয়েক মাস বন্ধু বান্ধবদের আশ্রয়ে থাকার পর অবশেষে বাধ্য হোয়ে পড়াশোনা ত্যাগ করে কিছুদিন সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্সে সেবা [illegible]াগ দিয়েছিলেন সেখানেই সম্পূর্ণরূপে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে চুক্তিমুক্ত নিঃস্ব নিরাশ্রয় ভারতীয় মজুররা মেটিয়াবুরুজের শিবিরে থাকাকালে সেন্টজন এ্যাম্বুলেন্স কর্তৃপক্ষ তাদের সেবার বন্দোবস্ত করলে বঙ্কিমও এই সংস্থার কর্মী হিসেবে সেবাকার্যে

ব্রতী হন। কলকাতার চৌরঙ্গী শাখার অধ্যক্ষ এফ, আই জেমসের নজরে পড়েন বঙ্কিম এবং তাঁরই অনুগ্রহে চৌরঙ্গীর ওয়াই, এম, সি-এর গ্রন্থাগার কর্মী রূপে নিযুক্ত হন।

কঠোর পরিশ্রমে ও অনিশ্চিত জীবন যাপনের ফলে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে এবং তিনি প্লুরেসি রোগে আক্রান্ত হন। তবুও বঙ্কিম তাঁর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় গুণে বিরূপ অদৃষ্টের সংগে সংগ্রাম করেন, অবশেষে ১৯৩০ সালে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে এম, এম, এফ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেই সময়ে এদেশে দন্ত চিকিৎসা বিদ্যার প্রতি লোকের কোন আগ্রহ প্রকাশ পায়নি, কিন্তু বঙ্কিম ছাত্রাবস্থাথেকেই দন্ত চিকিৎসার প্রতি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন, এবং তাঁর মনে হয়েছিল দন্ত চিকিৎসা একদিন গুরুত্ব লাভ করবে। তাই তিনি মেডিক্যাল কলেজের ভিজিটিং সার্জেনের কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠার দ্বারা মন জয় কবেন। সেই ইংরেজ সার্জেনের শিক্ষায় বঙ্কিম বিশেষ দক্ষতা লাভ করেন, এবং শেষ পরীক্ষায় ডেণ্টাল সার্জারি বিষয়ে প্রথম স্থান লাভ করে স্বর্ণ পদক লাভ করেন।

বঙ্কিমের আর্থিক সঙ্গতি না থাকলেও তিনি স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেন এবং তার জন্য তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হোত দিনের পর দিন। এই কঠোর পরিশ্রমের সফলতা স্বরূপ তিনি ব্যবসায় কিছুটা সাফল্য লাভ করেন, কিঞ্চিত অর্থলাভের সংগে খ্যাতি লাভও ঘটে। কিন্তু বঙ্কিমের মনে গভীর উচ্চাশা থাকায় দন্ত চিকিৎসা বিদ্যায় আরো পারদর্শিতা লাভের জন্য ইংলণ্ডের রয়াল অব সার্জন্স-এ দন্ত চিকিৎসা সম্পর্কে পড়তে কৃত সংকল্প হলেন। তখনকার দিনে ওই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর অন্যতম প্রতিষ্ঠান ছিল।

ক্রমে ক্রমে বঙ্কিম বিলাত যাবার জন্য সব প্রস্তুতি শেষ করলেও চার বছরের পাঠক্রমের জন্য যে বিরাট পরিমান অর্থের প্রয়োজন, এবং সেই অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হন অবশেষে তাঁর বিশেষ বন্ধুঅধ্যাপক নির্মল বসু এবং আরো কয়েকজন বন্ধু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এবং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে তিনি লণ্ডনে পৌছান।

এই বিদেশে বঙ্কিমের আবার এক কঠোর সংগ্রাম শুরু হলো। চার বছরের পাঠক্রমকে তিন বছরে সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং তাঁর এই

প্রচেষ্টা ফলপ্রসূও হয়ে ছিল। অর্থের প্রয়োজনে তিনি লণ্ডনের ওয়াই এম সি তে চাকরি নিলেন। বঙ্কিমের এই নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা দেখে সেখানকার অধ্যক্ষ তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হোয়ে তাঁকে নানা ভাবে সাহায্য করতে লাগলেন।

বঙ্কিম ইংলণ্ডের এল-ডি-এস আর-সি-এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ হস্‌পিটালে ক্লিনিক্যাল এসিস্‌টেণ্ট রূপে কাজ করেন। অবশেষে ১৯৩৭ সালে দেশে ফিরে আসেন জয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে।

এবার তাঁর জীবনের আর এক অধ্যায় শুরু হলো। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দন্ত বিভাগের সঙ্গে সিনিয়র হাউস সার্জেন হিসাবে যোগাযোগ রেখেছিলেন। বিলাত থেকে পাশ করে ফিরে আসার পর বঙ্কিমকে ভিজিটিং সার্জন করা হল না, তথাপি তিনি ক্লিনিক্যাল টিউটর হিসাবে অবৈতনিক কাজ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তাঁর বড় উদ্দেশ্য ছিল এদেশে দন্ত চিকিৎসক বিদ্যার প্রসার ও উন্নয়ন ঘটানো যাতে দন্ত বিভাগকে উন্নত স্তরের একটি স্বতন্ত্র কলেজে রূপান্তরিত করা যায়। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন সফল না হওয়ায় ১৯৪৮ সালে মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন, তখন তিনি সেখানে ভিজিটিং সার্জেন হিসাবে কাজ করছিলেন।

এর অনেক আগে বিখ্যাত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ আর, আহমেদ নিজের অর্থে কলকাতায় ডেণ্টাল কলেজ স্থাপন করেছিলেন, বঙ্কিম তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। সেই সময়ে এদেশে দন্ত রোগাক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল, এবং সরকারের এ বিষয়ে কোন আগ্রহ দেখা না যাওয়ায় বঙ্কিম ও ডাঃ আর আহমেদের যুগ্ম চেষ্টায় অনেকদিন সংগ্রাম করে অবশেষে ক্যালকাটা ডেণ্টাল কলেজ এণ্ড হসপিটাল সরকারী বিদ্যাভবনে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং সেখানকার ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী ডাক্তার হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

তিনি নিজের প্রাকটিস নিয়ে সন্তুষ্ট না থেকে তাঁর লক্ষ্য ছিল রাজ্যস্তরে ডেণ্টাল কলেজ ও হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করা যা রাজ্যের দন্ত চিকিৎসা বিদ্যার এক শক্তিশালী ও প্রধান প্রতিষ্ঠান রূপে যোগ্য ভূমিকা পালন করবে। এই দীর্ঘ প্রচেষ্টার পদক্ষেপগুলি হল—প্রথমে যথা State Medical Faculty-র সভ্য হয়ে দন্ত চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতির জন্য যাতে বৈজ্ঞানিক পন্থার

উপযুক্ত বন্দোবস্ত হয় সরকারী State Medical Faculty-র শাখা হিসাবে Dental Council প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হন। ধীরে ধীরে State Medical Faculty-র Govorning Body-র সভ্য হন, ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেন্টিস কাউন্সিলের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন, ডেণ্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ার পরিচালন সমিতির সভ্য হন। কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার Dental Advisory Committee প্রতিষ্ঠা করলে, তিনি এই কমিটির সভাপতি হন।

১৯৫১ সালে বঙ্কিম লোক শিক্ষার জন্য "দন্ত স্বাস্থ্য সপ্তাহ" উৎসব ও "দন্ত স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেন নিজ ব্যয়ে। মৌলিক চেষ্টা হিসাবে এই আয়োজন ছিল ভারতবর্ষে প্রথম। প্রদর্শনীটি রাজভবনে মার্বেল হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তদানীন্তন রাজ্যপাল উদ্বোধনী সভার সভাপতি হয়েছিলেন।

Dental Studies-র মহাব্রত উদ্‌যাপনে বঙ্কিম খ্যাতি-অখ্যাতি ও সবকিছু বাধা বিপত্তিকে সহজেই সমাধান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য একথাও ঠিক নয় যে, বঙ্কিমের একক চেষ্টায় দন্ত চিকিৎসা বিদ্যার উন্নতি হয়েছে, সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য লাভ সম্ভব হয়েছে।

দন্ত চিকিৎসক বঙ্কিমের কর্মধারা একদিকে অন্যদিকে, মানব দরদী বঙ্কিম চরিত্রের অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তিনি মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতেন, ওয়াই এম সি, এ ও মেডিকেল কলেজের সাধারণ কর্মচারীরাও তাঁকে আপনজন মনে করত। বঙ্কিম অনেকের দুঃখের দিনে তাদের সাহায্য ও সহানুভূতির মাধ্যমে আপন করে নিতেন। তিনি আত্মীয় ও অনাত্মীয় অনেককেই হাতধরে দন্ত চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী করেছিলেন এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে দন্ত চিকিৎসক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর ওয়াটারলু ষ্ট্রিটের ঘরটি শুধু চিকিৎসাকেন্দ্রই ছিল না, এখানে বিদগ্ধ মানুষের সমাবেশের এক মিলন ক্ষেত্র ছিল।

বঙ্কিমের মধ্যে পুরুষানুক্রমে স্বদেশপ্রেমের বীজ নিহিত ছিল, তাঁর সব কিছু কাজের মধ্যে এই স্বাদেশিকতার ভাব লক্ষিত হতো। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামী ও দেশসেবকদের এমনকি তাঁর গ্রামবাসীদের বিনামূল্যে দন্ত চিকিৎসা করতেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণোৎসব উপলক্ষে ১৯৬০ সালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের আহ্বানে মহাজাতি সদনে এক সভার আয়োজন করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সুবোধ মিত্র সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

কোন্নগর পুরসভাও তাঁর স্মরণে একটি রাস্তার নামকরণ করেন ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জী স্ট্রিট। তাঁর ভ্রাতা নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে ও অর্থদানে ওলিম্পিক ইনস্টিটিউটের খেলার মাঠের নাম করা হয় বঙ্কিম ময়দান এবং কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গনে কোন্নগরের প্রথম নাট্যমঞ্চ বঙ্কিম মঞ্চ নির্মিত হয়। তাছাড়া বিপিন মুখোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে ও ৫০০০ হাজার টাকা অর্থদানে কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থগারের পাঠকক্ষ স্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালে বঙ্কিম মুখার্জী স্মৃতি পাঠ্য পুস্তক শাখা (কলেজ বিভাগ) স্থাপিত হয়। এই ক্ষেত্রে আরো অনেক প্রতিষ্ঠান ও গুণমুগ্ধদের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়।

কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের প্রতি বঙ্কিমের গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তাঁর আদর্শ বঙ্কিমকে দেশ সেবায় বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তাই শিবচন্দ্র দেবের এক জন্মোৎসবে ডাঃ বঙ্কিমের ভাষণ যা ১৩৫৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় অধুনালুপ্ত কোন্নগর প্রকাশিকায়' প্রকাশিত হয়েছিল তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো—"বন্ধুগণ, আজ হতে ১৪০ বৎসর পূর্বে পুণ্যসলিলা ভাগীরথী তীরে আমাদের এই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম কোন্নগরে শঙ্খধ্বনি করে আহ্বান গীতি গেয়ে এক মহামানবকে আরাধনা করা হয়েছিল আজও সেই শঙ্খধ্বনি বেজে চলেছে বৎসরের পর বৎসর—সে মহামানব আর কেহ নয় আমাদের গ্রামের পিতা নর দেবতা শিবচন্দ্র দেব। বরণীয় যারা, স্মরণীয় যারা একই কথা বৎসরের পর বৎসর শুনেও পুরাতন হয় না।" আরো উদ্ধিতি—"আপনাদের কাছে আরো দুটি নিবেদন আমার আছে। প্রথম, আমি শুনেছি নরদেব শিবচন্দ্রের পবিত্র চিতা ভস্ম আছে কোন এক ব্রাহ্ম পরিবারের কাছে। এখন আমাদের সেই চিতাভস্ম নিয়ে সমাধি স্তম্ভ তৈরি করা পাঠাগার বা স্কুল যেখানেই আপনারা বিবেচনা করবেন আর পুণ্য তীর্থ ব্রাহ্ম মন্দির। একি কেবল ব্রাহ্ম সমাজ trustee দের আমাদের কিছু না। এটা ভাঙনের পথে চলেছে। এটি সংস্কার করার দায়িত্ব আমাদেরও, শুধু trustee দের নয়।

Trustee দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলার দোরে দোরে ভিক্ষা করে এটাকে বাঁচান প্রধান এবং প্রথম কাজ।—কোন্নগরের সবাই মিলে শিবচন্দ্রের অমর আত্মাকে জানাই—

ভুলি নাই, ভুলি নাই, আপনার নাম

ভুলি নাই আপনার মহাপ্রাণ

উপরের উদ্ধৃতি থেকে বঙ্কিমের সাহিত্য চর্চারও নিদর্শন পাওয়া যায়।

এরপর ডাঃ বঙ্কিমের উদ্যোগে ১৯৫৫ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে শিবচন্দ্র দেবের আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন ও মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন চিতাভস্ম স্থাপন করেন।

১৯৫৮র ২৯ নভেম্বর ৬০ বছর বয়সে এই সংগ্রামী ও উদ্যোগী পুরুষের জীবনাবসান ঘটে।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

বিঃদ্রঃ ।। এটি রচনার সময় বঙ্কিম মেমোরিয়াল কমিটির পক্ষে শক্তি মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা এবং 'কোন্নগর প্রকাশিকা'র শ্রাবণ ১৩৫৭ সংখ্যার সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২১. ১১. ১৯০০

দেহাবসান ঃ ১.৮.১৯৭৬

প্রয়াত ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রথম সন্তান তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি ১৯১৭ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২১ সালে কলা বিভাগে (আর্টস) স্নাতক হন। ওই বছরেই ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্টে চাকরিতে যোগদান করেন এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে সম্মানের সাথে কাজ করে ১৯৬৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। যুবক অবস্থা থেকেই তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন, চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর এই কাজের পরিধি আরো বিস্তৃত হয় এবং তিনি সেই কাজে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে নিয়োজিত করেন।

সমাজ সেবা কাজে তাঁর সহকর্মীরা ছিলেন বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিম বিহারী মুখোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের জন্মলগ্ন অর্থাৎ ১৯২৩ সাল থেকেই তিনি এর সাথে যুক্ত ছিলেন এবং দীর্ঘদিন ব্যাঙ্কের পরিচালন সমিতির অন্যতম সদস্য হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার, কোন্নগর ওলিম্পিক ইন্‌স্টিটিউট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়া আরো নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন অরবিন্দ বিদ্যাপীঠের সম্পাদক পদে আসীন ছিলেন।

১৯৫৪ সালে কোন্নগর পুরসভার ১নং ওয়ার্ড থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে পুর সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৫৮এ প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির সমর্থিত প্রার্থী রূপে তিনি পুনরায় পুর সদস্য নির্বাচিত হন। পুর সদস্য হিসাবে তিনি খুবই সক্রিয় ছিলেন। তিনি সর্বদাই নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন এবং বোর্ডের সভায় ইসুভিত্তিতে পুর বোর্ডকে সমর্থন করতেন এবং যা সঠিক মনে

করতেন তাতেই তিনি অটল থাকতেন। পুর সভার উন্নয়ন মূলক কাজে সব সময়ই তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যেত। ১৯৬৫ সালের পুর নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হননি, তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর।

একজন দৃঢ়চেতা ও কর্মঠ মানুষরূপে কোন্নগরে তাঁর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে থাকবে।

কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ভবনে তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণ সভার আহ্বায়ক ছিলেন (১) বিষ্ণু দত্ত, পুর প্রধান, কোন্নগর পুরসভা, (২) নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক, (৩) মুরারি মিত্র, সম্পাদক, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার (৪) ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, (৫) মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, (৬) গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য পশ্চিম বিধান সভা, (৭) অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

শিশির কুমার মিত্র

জন্ম ঃ ৬. ১২. ১৯০১

দেহাবসান ঃ ২৬. ১২. ১৯৭৬

শিশির কুমারের পিতা কৃষ্ণ চন্দ্র মিত্র অল্প বয়সে মারা যান। মাতা ভানুমতী দেবী পিত্রালয়ে আসেন ভ্রাতা যতীন্দ্র নাথ রায়-এর বাড়িতে। মামা যতীন্দ্রনাথ রায়-এর আদর্শবাদিতা, দেশপ্রেম, ধর্মপ্রাণেতা ও জ্ঞান পিপাসা শিশির কুমারকে শৈশব থেকেই অনুপ্রাণিত করেছিল এবং তাঁর চরিত্র গঠনে সহায়তা করেছিল।

তিনি ছিলেন মিতভাষী, বিনয়ী অথচ দৃঢ়চেতা এবং তেজস্বী। তিনি তরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন না, আবার তাঁর মধ্যে রসবোধ ছিল। অনেকের সঙ্গে মেলামেশা থাকলেও তিনি তাঁর নিজস্ব জগৎ তৈরি করে নিয়েছিলেন।

তরুণ বয়স থেকেই তিনি খুবই সাধাসিধে ভাবে চলতেন এবং রুচি সম্মত ব্যবহার করতেন। নিয়মনিষ্ঠা, সময়ানুবর্তিতা প্রভৃতি সদগুণগুলি কিশোর বয়সেই তাঁর চরিত্রের অঙ্গ হয়েছিল। অবসর সময়ে স্থানীয় গ্রন্থাগারে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়তেন। অনাথ ভাণ্ডার, বন্যাত্রাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজে তিনি সব সময়েই নিবেদিত প্রাণ ছিলেন।

গার্হস্থ্ জীবনের প্রতি তাঁর সেরূপ আকর্ষণ ছিল না। কৈশোর থেকে স্ত্রী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও তার থেকে তিনি দূরত্ব বজায় রাখতেন। পড়াশোনা ও আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ আকর্ষণ।

১৯১৭ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৯২০ সালে শ্রীরামপুর কলেজে আই, এ ক্লাসে ভর্তি হন। পড়াশোনায় মেধাবী ছাত্র ছিলেন শিশির কুমার, বিশেষ করে ইংরাজীতে তিনি খুবই পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সেই সময়ে ১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে

রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ, গান্ধীজী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলন, বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ার জন্য আই. এ.-র শেষ পরীক্ষায় বসলেন না। তাঁর পরিবারের নিকট আত্মীয় তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত করার জন্য চাকরীতে নিযুক্ত করিয়ে দেন—চাকরী ক্ষেত্রে তাঁকে মাত্র ২ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হত। এই ভাবে তিনি দশ বছরের বেশি সময় চাকরী করেন, এবং এই সময়ে অবসর কালে বিশেষ করে ইংরাজী রচনা লেখাতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতেন। অন্যদিকে সেই সময় মাতুলের প্রেরণায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি অনুরাগী হন ও স্বামীজী রচিত পুস্তক সমূহ গভীর যত্ন সহকারে পাঠ করতে থাকেন এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেন। এর পূর্বে ছাত্রাবস্থায় ইংরাজী সাময়িক পত্র সমূহে তাঁর রচনা পাঠাতে থাকেন।

তিনি ১৯৩১ সালে বিশ্বভারতীতে যান, সেখানে আটবছর রবীন্দ্র সান্নিধ্যে থেকে শিক্ষাদান কার্যে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি সংস্কৃত, ইতিহাস ছাড়াও নানা বিষয়ে অধ্যক্ষকে সাহায্য করতেন।

মাতা ভানুমতী প্রয়াত হলে শিশির কুমারের পারিবারিক বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রী অরবিন্দের প্রতি আকৃষ্ট হন—তাঁদের রচনাবলী পাঠ করে ও তাঁদের সম্বন্ধে নানা আলোচনার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করেন। তাই তিনি অবশেষে ১৯৩৯ সালে দিলীপ কুমার রায়-এর অনুপ্রেরণায় ও রবীন্দ্রনাথের সম্মতিতে ১৯৪০ সালে পণ্ডিচেরীতে গমন করেন। এবং তিনি তাঁর কাঙ্খিত বস্তুকে এতোদিনে লাভ করেন। পণ্ডিচেরীর শ্রী অরবিন্দ আশ্রমেই ১৯৭৬-র ২৬ ডিসেম্বর তাঁর কর্মবহুল জীবনের সমাপ্তি হয়।

ছাত্রাবস্থা থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় যথা Modern Review, Prabudha Bharat, Forward, Advance, Bombay Chronicle, Indian Review প্রভৃতিতে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হত। এছাড়া তিনি আরো অনেক পুস্তকের রচয়িতা, যথা—Sri Arabinda-a Homage, Towards Victory of the Light Supreme, Indias Cultural Empire and her Future, Cultural History of Bengal প্রভৃতি।

এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য যে, Forward পত্রিকায ধবাবাহিক ভাবে প্রকাশিত তাঁর Art and cultural of Ancient India রচনাটি প্রশংসার দাবী বাখে।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

(শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় শ্রীদেবপ্রসাদ রায় লিখিত শিশির কুমার মিত্র শীর্ষক রচনা এবং রামকৃষ্ণ সরকার লিখিত কোন্নগরের ইতিহাস গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে।)

অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৯০২

দেহাবসান ঃ ১৯৯৯

অনিল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর জন্ম ৩০আগস্ট ১৯০২ (বঙ্গাব্দ ১৪ ভাদ্র ১৩০৯) মাহেশে মামার বাড়িতে। পিতা সিদ্ধেশ্বর ছিলেন অতি সাধারণ গৃহস্থ। কোন্নগরে তাঁর জ্ঞাতিদের সংলগ্ন কয়েক কাঠা জমিসহ ছোটো বসতবাটী। গঙ্গার খুব কাছে।

সিদ্ধেশ্বর ছিলেন রামনারায়ণের একমাত্র সন্তান। আর তাঁর প্রথম সন্তান অনিল চন্দ্র। মামার বাড়িতে থেকে শ্রীরামপুর কলেজিয়েট স্কুল থেকে ম্যাট্রিকে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তারপর ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে শিক্ষানবিশ হিসাবে যোগ দেন। এমন সময় ১৯২১ সালে মৃত্যু হল সিদ্ধেশরের। বিধবা মা আর তিনটি ছোটো ছোটো ভাই ও এক বোন নিয়ে সংসারের ভার পড়ল অনিলের ওপর। কিছু দিনের মধ্যে আর একটি বোন জন্মাল। শুরু হয়ে গেল কঠোর জীবন সংগ্রাম। অনিল রিষড়াব চটকলে সামান্য কাজ করে সংসার চালাতে লাগলেন। তারপর একে একে নানা জায়গায় চাকরি করে উপার্জন বাড়ানো আর ভাই বোনদের মানুষ করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভদ্রেশ্বরের অ্যাঙ্গাস মিলে একটু ভদ্রগোছের কাজ মিলল। সেখান থেকে চাকরি নিয়ে এলেন কলকাতায় ফেনার কোম্পানিতে ক্যাশ বিভাগে। এখানে দীর্ঘদিন সুনামের সংগে কাজ করে ১৯৭১ সালে অবসর নেন। ইতিমধ্যে ভাইদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বোনদের বিয়ে দিয়েছেন, আত্মীয় স্বজন সহ একান্নবর্তী পরিবারের সকলের প্রতি যথাকর্তব্য পালন করে তাদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রেখেছেন। তবে এসবের পিছনে ছিল চরম আত্মবঞ্চনা, সংযম ও সরল জীবন যাপন।

অনিলচন্দ্রের জ্ঞান তৃষ্ণা ছিল প্রবল। নিয়মিত লেখাপড়া করতেন। আর্থিক অনটনের মধ্যেও ফুটপাথ থেকে বাংলা ও ইংরেজি বই কিনে একটু একটু করে নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ গড়ে তোলেন। এ ব্যাপারে বিশেষ

প্রেরণাদাত্রী ছিলেন তাঁর মা ক্ষণপ্রভা। স্বভাবতই বাড়িতে পড়াশোনার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। কলকাতার সাহিত্যিক মহলে অনিলচন্দ্রের ভালো যোগাযোগ ছিল। বিচিত্রা, প্রবাসী, মানসী ও মর্মবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। অনিল চন্দ্র ফটোগ্রাফী ও ম্যাজিকে পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রচুর ভালো ভালো ছবি তুলেছেন এবং ম্যাজিক দেখিয়ে ও শিখিয়ে অনেকের মনোরঞ্জন করেছেন। শরীরচর্চা ও খেলাধূলার প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল।

নানা সামাজিক কাজকর্মে ও রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন অনিলচন্দ্র। কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। স্বগ্রামের নানা জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। পাঠচক্র, সমবায় ব্যাংক, লাইব্রেরী, ছেলেদের ও মেয়েদের স্কুল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাঁর উল্লেখযোগ্য কর্মকৃতিত্বের নিদর্শন আছে। অন্যান্য বিবিধ সংস্থার সংগেও তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারে তিনি দীর্ঘকাল সম্পাদকের দায়িত্ব বহন করেছেন। তাঁর আমলে গ্রন্থাগার ভবনের সম্প্রসারণ এবং গ্রন্থাগারটি নগর গ্রন্থাগারে পরিণত হয়। দ্বাদশ মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার তীর সংরক্ষণ ও সংস্কারের জন্য যে দ্বাদশ মন্দির উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয় তিনি তার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

অনিলচন্দ্র ছিলেন ধর্মপ্রাণ। তিনি প্রৌঢ় বয়সে সীতারামদাস ওঁকারনাথের শিষত্ব গ্রহণ করেন। কয়েক বছর আগে নিজস্ব ভবনের গায়ে শংকরাচার্য যখন রাজরাজেশ্বরী সেবামঠ গড়ে তুলতে থাকেন তখন তিনি পরম আনন্দ লাভ করেছিলেন। রোগশয্যায় শুয়ে ওই মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টা শুনে তৃপ্তি পেতেন।

সাম্প্রতিক কালে অনিলচন্দ্রকে সাধারণ পাঠাগার, পাঠচক্র ও সমবায় ব্যাংকের তরফে আলাদা আলাদা অনুষ্ঠানে বর্ষীয়ান নাগরিক হিসাবে সংবর্ধনা জানানো হয়।

৬ জানুয়ারি ১৯৯৯ (বঙ্গাব্দ ২১ পৌষ ১৪০৫) তিনি পরলোক গমন করেন।

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

তথ্য ঃ শ্রাদ্ধঅনুষ্ঠানে বিতরিত স্মরণিকা

ব্রজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী

জন্ম ঃ ১২ জানুয়ারী ১৯০৩

দেহাবসান ঃ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

দেশ বিভাগের পূর্বে কোন্নগরে বিদ্বজ্জনের সংখ্যা এখনকার চেয়ে খুবই কম ছিল। অবশ্য সে সময় জন সংখ্যাও বেশি ছিল না। দেশভাগের পর গুণীজন সমাবেশ ঘটতে থাকে। সেদিনের সেই স্বল্প সংখ্যক বিদগ্ধ জনের মধ্যে শ্রী ব্রজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ছিলেন একজন।

অবিভক্ত বাংলার নোয়াখালি জেলার ফেণী মহকুমার অন্তঃপাতী বসন্তপুর গ্রামের তৎকালীন ভূস্বামী বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত পিতা গগন চন্দ্র চক্রবর্তী ও মাতা বঙ্গেশ্বরী দেবীর সাত-পুত্রের (কন্যা ছিল না) দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ১২ জানুয়ারি, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নিজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। শোনা যায়, তাঁর পূর্বসুরীদের বেশ কয়েক পুরুষ একদা বর্ধমান জেলার সাতগাছিয়ায় বসবাস করতেন। ব্রজেন্দ্র কিশোর প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার আড়িয়াল গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়িতে চলে আসেন শিক্ষার পরবর্তী পর্বের জন্য এবং ঐ গ্রামের স্বর্ণময়ী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে স্কলারশিপ সহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলকাতায় এসে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে রিপন (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন এবং১৯২৩-এ প্রথম বিভাগে আই, এস, সি পাশ করেন। দু'বছর পর সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পদার্থ বিজ্ঞানে অনার্স সহ বি, এস, সি পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম হন। শিবপুর বি, ই কলেজে কিছুকাল সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিষয়ে অধ্যয়ন করেন। দ্বিতীয় বর্ষে ইঞ্জিনীয়ারিং পড়া ছেড়ে বিজ্ঞান কলেজে পদার্থ বিজ্ঞানে এম, এস, সিতে ভর্তি হন এবং ১৯২৮-এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে এম, এস, সি পাশ

করেন। সেবারে কোনো ছাত্রই প্রথম শ্রেণী পান নি। এই পরীক্ষায় গবেষণামূলক পত্র 'X-ray diffraction and Scattering' উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। পরীক্ষক ছিলেন তিন বিশিষ্ট দেশবরেণ্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি. রমন, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা।

এম, এস, সি পাশ করে পূর্ব বাংলার একটি কলেজে ব্রজেন্দ্রকিশোর কিছুদিন অধ্যাপনা করবার পর ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলা সরকারের সমবায় দফ্তরে সরকারী চাকরিতে যোগদান করেন। ১৯৪৯-এর মাঝামাঝি সময়ে তিনি কর্মব্যপদেশে কোন্নগরে আসেন। ঐ সময়ে অখণ্ড বাংলা সমবায় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয় অধুনা বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার নওগাঁ শহর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে কোন্নগরে পুনর্স্থাপিত হয়। কোন্নগরের তখনকার মিলিটারি ক্যাম্পের পূর্ব অংশটুকু নিয়ে স্থাপনা হয় সমবায় প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। তিনি এই প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ হয়ে কোন্নগরে আসেন। এইভাবে দীর্ঘ তিরিশ বছর ঐ দফতরের বিভিন্ন উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকে সিনিয়র ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সমতুল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে ১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে পুণর্নিয়োগ করেন। এর ফলে সমবায় দফ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে তিনি অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হন।

চূড়ান্ত অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি কিছুকাল রোমান ক্যাথলিক মিশন পরিচালিত বেঙ্গল রিফিউজি সার্ভিস-এ কলকাতা কেন্দ্রের একজন প্রধান আধিকারিক ছিলেন।

স্বাধীনোত্তোর পর্বে কোন্নগর মিলিটারি ক্যাম্পের পশ্চিমাংশে শরণার্থী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এই পুনর্বাসন কর্মে ব্রজেন্দ্র কিশোর বাবুর উদ্যোগ ও পরামর্শ ছিল অত্যন্ত মূল্যবান। ফলস্বরূপ তদানীন্তন শরনার্থীরা তাঁকে একজন বড়মাপের মানুষ মনে করে "বড়ো বাবু" অভিধায় ভূষিত করেছিলেন। সমগ্র অঞ্চলটি এখন 'কালীতলা কলোনী' নামে পরিচিত।

ব্রজেন্দ্র কিশোর তাঁর জ্ঞানের বিস্তৃতির জন্য সুপরিচিত ছিলেন। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলিতে অ্যাকাউন্টেসি, অডিট, ব্যাঙ্কিং এর মতো বিষয়গুলিতে তাঁর অবাধ এবং অনায়াস বিচরণের

ফলে তিনি অধ্যাপক হিসাবে ছাত্রদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। অন্যদিকে ধর্মীয় সাহিত্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে তাঁকে বিদগ্ধ আলোচকের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার অতি সুললিত পদ্যানুবাদ করেন। বারানসী, ভট্টপল্লী, কালীঘাট ও নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে তিনি সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। এইভাবেই প্রথাগত চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে তিনি প্রজ্ঞা বিতরণের মাধ্যমে জনসেবা করে গেছেন।

পুত্র কন্যাদের মধ্যেও তাঁর সাফল্য সূচিত হয়েছিল। তিন পুত্র ও এক কন্যা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। মধ্যম পুত্র একজন প্রাক্তন আই, পি, এস অফিসার।

রচনা ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

নটশ্রী বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২২. ৯. ১৯০৫

দেহাবসান ঃ ১৮.৭.১৯৮৮

নটশ্রী বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়-এর পিতা কোন্নগরের বিশিষ্ট মুখোপাধ্যায় পরিবারের রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। মাতা উত্তরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায়-এর ভাগ্নি চূনীবালা দেবী। চূনীবালা দেবী ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব ও মানসিক গুণ সম্পন্না।

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে বিশেষ কোন বিষয় সম্পত্তি লাভ করেন নি, তিনি লাভ করেছিলেন স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রেম ও চরিত্রবল।

এমন পিতা মাতার সন্তান বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় উদ্যমী, দুঃসাহসী ও মুক্তমতি হবেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। তাই দেখা যায় তখনকার দিনের প্রচলিত চলার পথ তাঁর ছিল না, তিনি ছিলেন ভিন্নপথের দৃঢ়চেতা মানুষ।

১৯২৩ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁর সহপাঠীরা ছিলেন শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, সুধীর কুমার বসু, রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যয় প্রমুখ। আই, এ, পাশ করার পর একদিকে আর্থিক সমস্যা, অন্যদিকে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনের আহ্বানে অনুপ্রাণিত হওয়ায় লেখাপড়ার পথে অগ্রসর হওয়া তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি। সেই সময়ে বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও নিবারণ চন্দ্র মিত্র-র নেতৃত্বে তদানীন্তন স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির অন্যতম সম্পাদক রূপে দক্ষতার পরিচয় দেন।

এরপর পারিবারিক কারণে অর্থ উপার্জনের জন্য রাইটার্স বিল্ডিং-এ করণিক পদে চাকরির জন্য পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হয়ে চাকরিতে যোগদান করেন। সেই সময়ে তিনি গোপনে দেশ বরেণ্য নেতা বিপ্লবী বিপিন গাঙ্গুলীর

সংগে যোগাযোগ রাখতেন। কিন্তু তরুণ সঙ্ঘের সভাপতি পদে ও জেলা কংগ্রেসের স্থানীয় কর্মী হিসাবে যুক্ত থাকার জন্য গোপন পুলিশ রিপোর্টের কথা জানতে পেরে তিনি স্বেচ্ছায় চাকরিতে ইস্তফা দেন।

শুরু হয় তাঁর ব্যবসায়ী জীবন। তখন বাঙালি যুবকদের মনে পরের দাসত্ব না করে স্বাধীন ব্যবসায়ের পথ গ্রহণ করার প্রতি একটা উৎসাহ দেখা গিয়েছিল। সেই উৎসাহে উৎসাহী হয়ে বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় 'লাল নীল' দিয়াশলাই তৈরির ফর্মূলা অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা করলেন ''রং দিপালী' নামে এক কারখানা। 'রং দিপালী'র এই দিয়াশলাই বেশ জনপ্রিয় হওয়ায় ব্যবসা বেশ ভালোই চলেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরে কোন অজ্ঞাত কারণে এই প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স পুনর্নবীকরণ না হওয়ার ফলে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তিনি শেয়ার মার্কেটে যোগ দেন। কিন্তু সেই সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে শেয়ারের দাম খুবই পড়ে যায়; ফলে তাঁকে আর্থিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

তখন তিনি নোতুন জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় তাঁর অগ্রজ ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়-এর বাসায় উঠেন। ইতিমধ্যে শৌখিন নটরূপে তাঁর খ্যাতি কিছুটা ছড়িয়ে পড়েছিল। শরৎচন্দ্রের ''চরিত্রহীন'' নাটকে দিবাকরের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথিতযশা শিল্পী সমন্বয়ে অভিনীত নাটকে সুযোগ পান। এবং দিবাকর চরিত্রে সফল অভিনয়ের জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পেশাদারি মঞ্চে অভিনয়ের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসে। ঠিক এই সময়ে নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর শ্রীরঙ্গম রঙ্গমঞ্চে যোগদান ক'রে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সীতা নাটকে 'ভরত', মাইকেল মধুসূদনে 'মনোমোহন', ষোড়শীতে 'ব্যারিষ্টার নির্মল' প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এরপর রঙমহল, মির্নাভা প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে চার বছর একাধিক নাটকে অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। সবশেষে ষ্টার থিয়েটারে 'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে একটি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এইভাবে মঞ্চশিল্পী হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা সুদূর প্রসারী হয়।

পরবর্তী সময়ে বাংলা সিনেমা জগতের খ্যাতনামা পরিচালক সুশীল মজুমদার, মধু বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সতীশ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী কানন দেবী,

পশুপতি চট্টোপাধ্যায প্রমুখের পরিচালনায় ৩০ খানির বেশি ছায়াছবিতে অভিনয় করে চলচ্চিত্র শিল্পী হিসাবে খ্যাতির শীর্ষে উন্নীত হন। এরই মধ্যে 'রবিন মাষ্টার', 'শেষরক্ষা', 'সংগ্রাম প্রভৃতিতে তাঁর অভিনয়ের দক্ষতা বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়।

এই জনপ্রিয়তার ফলশ্রুতি হিসাবে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতাব্দী সমারোহ উৎসবের মূল সভাপতি মন্মথ রায কর্তৃক বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়কে 'নটশ্রী' উপাধী দান এক স্মরণীয় স্বীকৃতি। চলচ্চিত্র ও মঞ্চশিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি যখন সর্বজনস্বীকৃত, তখন একদিন শুটিং চলাকালীন তিনি মৃদু হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং এই কারণে তাঁকে অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হতে হয়।

বিপিনবিহারী স্বগ্রামে ফিরে এসে স্বউপার্জিত অর্থে কোন্নগর স্টেশনের কাছে 'চলচ্চিত্রম' সিনেমা হল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর দক্ষ পরিচালনায অতি অল্প দিনের মধ্যেই 'চলচ্চিত্রম' সিনেমা হল হুগলী জেলারমধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রেক্ষাগৃহ রূপে স্বীকৃতি লাভ করে এবং এই হলে অনেক উচ্চমানের ছাযাছবি প্রদর্শিত হয়।

১৯৭৪ সালে তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেন। সেই সময়ে ই, আই এম, পি, এ'র শ্রীপরিমল সরকার কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ঐসব দেশে সিনেমা হল গুলিতে বাংলা ছবির প্রাতঃকালীন শো চালু করার জন্য সচেষ্ট হন। এর কয়েক বছর পরে শারীরিক কারণে চলচ্চিত্রম সিনেমার মালিকানা হস্তান্তর করেন অবশ্য এই হস্তান্তরের ফলে কর্মচারীদের কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি। এক সময়ে এস, পি, মুখার্জী স্ট্রিটস্থ তাঁর নিজের বাড়িতে একটি মুরগীর খামার করেন। এই ভাবে অর্থ উপার্জ্জনের জন্য নানা রকম পথে তিনি চলেছিলেন।

বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় তরুণ বয়স থেকেই তরুণ সঙ্ঘ, পাঠচক্র, প্রভৃতি স্থানীয় একাধিক প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে অথবা অন্যভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া বঙ্কিম চন্দ্রের জন্মশত বর্ষ উৎসব, কোন্নগর স্যাটারডে ক্লাব পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সংগীত প্রতিযোগিতা, কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান পরিচালিত নিখিলবঙ্গ শৌখিন একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতা, হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন, কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানে পুষ্প প্রদর্শনী

প্রভৃতিতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হুগলী জেলা সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর কোন্নগরে আগমন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া অসংখ্য সংস্থা আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতি বা প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন।

১৯৭৬-৭৭ সালে পুরসভার শিশু উদ্যান উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, মাতৃসদনের জন্য তিনি একটি জেনারেটরের ক্রয়মূল্য দান করবেন। ২৪ এপ্রিল ১৯৮১ সালে (বাংলা ১লা বৈশাখ ১৩৮৮) রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গনের রঙ্গমঞ্চ কমপ্লেক্সের সাধারণ নাটক মহলা কক্ষের দ্বার উদঘাটন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন। ৩১.১০.৮৩তে চড়কতলা পূজা মণ্ডপে অনুষ্ঠিত বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব প্রয়াত সুধাংশু কুমার দে-র স্মরণ সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং এই সভায় প্রয়াত দে মহাশয়ের স্মৃতিতে একটা রাস্তার নামকরণের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯৮১—১৯৮৮ এই সাত বছর তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন।

দাতা হিসাবে বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁরই আথিক সহায়তায় কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানে কোন্নগরে প্রথম নাট্যমঞ্চ 'বঙ্কিম মঞ্চ' প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৬ জানুয়ারী ১৯৫৭এ স্থাপিত ও কোন্নগর পুরসভা পরিচালিত মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে অষুধ দেওয়ার জন্য এককালীন দেড়লাখ টাকা, বঙ্কিম ডেণ্টাল চেয়ার প্রদান এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য আরো ৫০০০০ টাকা দান করেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে২০০০০ টাকার একটি এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড তিনিই করেছেন, এই এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড থেকে প্রাপ্ত সুদের টাকা সামগ্রিক পুরস্কার প্রদান উদ্দেশ্যে খরচ হবে, এছাড়া শিক্ষক শিক্ষাকর্মীদের উৎসাহ দানের জন্য আরো ৫ হাজার টাকার একটি ফাণ্ড গঠন করেন। কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউটের খেলার মাঠটি "বঙ্কিম ময়দান" নামকরণের জন্য ২০০০০ টাকা দান, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবকে ৫০০০ টাকা, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগারে টেক্সট বুক বিভাগ খেলার সময় ৫০০০ টাকা, উত্তম কুমার প্রতিষ্ঠিত অভিনেত্রী সঙ্ঘকে ২৫০০০ টাকা, কোন্নগর অরবিন্দ সোসাইটিকে ৫০০০ টাকা দান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। আরো অনেক দান তিনি করে

গেছেন, যার তালিকা এই লেখকের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি, আশা করি উৎসাহী পাঠক এ তথ্য সংগ্রহে প্রয়াসী হবেন।

কোন্নগর সুইমিং ক্লাবেরা শিক্ষার্থীরা যে পুকুরে দীর্ঘদিন সাঁতারের অনুশীলন করে আসছে সেই পুকুরটি কেনার জন্য তিনি কোন্নগর পুরসভাকে ৪০০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই শর্তে যে ওই পুকুরটির নামকরণ হবে, "চুনী-প্রভাদেবী সরোবর"। এই প্রতিশ্রতির উপর নির্ভর করে উপরোক্ত নির্ধারিত মূল্যে পুকুরটি কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং পুকুর হস্তান্তরের সরকারী অনুমোদন লাভের পর ওই পুকুর কেনা হয়। ইতিমধ্যে ১৮. ৭. ১৯৮৮ তারিখে বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এর কিছুদিন পরে তঁর দুই ভগ্নী ব্রজবালা দেবী ও রাণুবালা দেবী মারফৎ ৩২০০০ টাকা এবং ভ্রাতা কানন বিহারী মুখোপাধ্যয় মারফৎ ৮০০০ টাকা মোট ৪০০০০ টাকা পুর তহবিলে জমা পড়ে।

২২. ৯. ১৯৮৫ তারিখে বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়-এর আশি বছর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে 'চলচ্চিত্রম' সিনেমা হলের কর্মীবৃন্দের পক্ষে মহাদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমল সরকার, রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়-এর আহ্বানে এক সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয় চলচ্চিত্রম প্রেক্ষাগৃহে। এই অনুষ্ঠানে কোন্নগর তথা আশপাশের এলাকা থেকে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় এই ভাবে তাঁর জীবনের দীর্ঘদিন মানুষের মধ্যে ও মানুষের জন্য অতিবাহিত করেছেন, এমন একজন স্বনামধন্য, সংস্কৃতিবান ও দানশীল মানুষের পুণ্য স্মৃতি মানুষের মনে চিরদিন জাগরুক থাকবে এ প্রত্যাশা নিশ্চয়ই আমরা করতে পারি।

তাঁর দেহাবসানের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন পুর প্রধান শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আহ্বানে নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হলে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় সভায় কোন্নগরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর বহুমুখী কর্মময় জীবন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

২২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ তারিখে সন্ধ্যায় বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর পৈত্রিক বাড়িতে শ্রীমতী বিনতী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর আহ্বানে বিপিন বাবুর ৯৩ তম জন্মদিন পালিত হয়। সভায়

প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীঅধীর কুমার মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। আহ্বায়কদ্বয় তাঁদের প্রিয়জনের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের পর বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়-এর স্মৃতিচারণা করেন অধ্যাপক রথিন চক্রবর্তী, অধ্যাপক সত্যেন সাহা, অজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী চিনু সাহা। প্রাক্তন পুর প্রধান শ্রী বিষ্ণু দত্ত বিপিন বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য পাঠ করেন। সভায় সংগীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়, খগেন্দ্র মোহন সেন, বসুন্ধরা মুখোপাধ্যায়।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র

জন্ম ঃ ৪ মার্চ ১৯০৫

দেহাবসান ঃ ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮২

কোন্নগরের সাত বকুতলায় মিত্র-পরিবারে ১৯০৫র ৪ মার্চ, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ দেবের স্নেহধন্য নবচৈতন্য মিত্র। ঠাকুর কৃপাধন্য নব চৈতন্যের গৃহে একাধিকবার পদার্পণ করেছেন। ১৩ বছর বয়সে শৈলেন্দ্র কৃষ্ণর পিতৃ বিয়োগ হলে সংসারের সকল দায় দায়িত্ব তাঁকেই বহন করতে হয়। এই সময় তাঁর মাতুল অক্ষয় কৃষ্ণ ঘোষ এর সহযোগিতায় দাঁ-সেন এণ্ড কোম্পানীতে একজন সাধারণ টাইপিষ্ট হিসাবে কাজে যোগদান করলেও এই কাজে তিনি তৃপ্ত হতে পারেন নি। বড় হওয়ার অদম্য নেশা, সেই তাঁর নিষ্ঠা, একাগ্রতা, অটুট মনোবল, অধ্যবসায় ও সীমাহীন পরিশ্রম শক্তি তাঁর জীবনধারাকে নিয়ত তাড়িত করেছে। এরই ফলে পরবর্তী জীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে কর্মবীর রূপে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সদ্যসমাপ্ত, কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত, অসহযোগ আন্দোলন শুরু, অফিস আদালত বয়কট, কলেজ ইউনির্ভাসিটি বর্জন, দেশের এই মহাদুর্যোগের সময়ে ১৯২১ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের আহ্বান--বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী, বাঙ্গালি ছেলেদের ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে হবে নচেৎ ভবিষ্যত অন্ধকার। এই উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাত্র ৩০ টাকা মূলধন নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র কলকাতার ক্যানিং স্ট্রিটে। এছাড়া আচার/চাটনি তৈরি করে বিশেষ করে সাহেব পাড়ায় ফেরি করে বেড়াতেন এবং মনে মনে ভাবতেন এই ফেরি ব্যবসার ভবিষ্যত কোথায়? এই সময়ে সাহেব পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত সহৃদয় ইংরেজ ভদ্রলোক স্যার ম্যাকলে'র সুপারিশে গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে আর, এস, এন কোম্পানিতে তিনি তাঁর তৈরি দ্রব্য সরবরাহের অর্ডার পান। কিন্তু

অন্যদিকে তাঁকে প্রচণ্ড অর্থাভাবের সম্মুখীন হতে হয়। এই সময়ে শৈলেন্দ্র বাবুর এক বন্ধু তাঁর ব্যবসায়ে অংশীদার রূপে যোগ দেন, কিন্তু পরবর্তী কালে এই অংশীদার বন্ধু সমস্ত ব্যবসা আত্মসাৎ করায় শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ বাবুকে চরম বিপর্যয়ে পড়তে হয়। অবশেষে ১৯৪৩-৪৪ সালে মামলায় জয়ী হয়ে একদিকে পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা নিয়ে অন্যদিকে পরম হিতৈষী জীবন কৃষ্ণ দে র ঐকান্তিক সহযোগিতায় তিনি পুনরায় ব্যবসা শুরু করেন এবং সাফল্যের পথে এগিয়ে যান।

এরপর '৪৩র মন্বন্তর, '৪৬র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সর্বোপরি '৪৭এ স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও সংগে সংগে দেশভাগ। দেশভাগ হওয়ার ফলে কাঁচামাল সংগ্রহে তাঁকে আবার সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। কাঁচা মালেব জন্য তিনি মালদাব গ্রামে গঞ্জে ঘুরতে থাকেন এবং কাঁচা আমের ফলনকে সংরক্ষণের পদ্ধতি শেখালেন এবং সফল হলেন, ফলে কাঁচামালের যোগান বাড়ে, সংগে সংগে তাঁর ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় এই সময়ে দেশের বাইরে চাটনী রপ্তানীর কথা ভাবতে শুরু করেন, ফলে বিদেশী মুদ্রা আমদানী শুরু হয়। ইউরোপ মহাদেশেব সকল বড়বড় দেশে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে ১৯৪৯ সালে তাঁর জীবনে এক স্মবণীয় দিন এলো, যেদিন 'মিডা এণ্ড কোম্পানি'র (MIDA & CO) রপ্তানীর অর্ডার আসতে শুরু হলো। ১৯৫৫ সালে মিডা এণ্ড কোম্পানির উৎপাদিত মালের গুণমান সম্পর্কে ক্রেতাদেব মতামত জানা ও তাদের বোঝানোর উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ড, ইটালি, সুইজারল্যাণ্ড, সুইডেন, পশ্চিম জার্মানী, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ৪০ বার ভ্রমণ করে ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য লাভ করেন। এবং ভারতবর্ষের একজন প্রকৃত বাঙালি হয়ে চাটনী ব্যবসায়ে একজন কৃতী ব্যক্তিত্ব রূপে চিহ্নিত হন ও স্বীকৃতি স্বরূপ অল ইণ্ডিয়া ফুড প্রিজার্ভস এসোসিয়েশন (All India Food Preservers Association) তাঁকে তাঁদের ইষ্টার্ণ জোনের (Eastern Zone) সহ সভাপতি রূপে নির্বাচিত করেন। অতঃপর তাঁরই প্রচেষ্টায় মিডা এণ্ড কোম্পানির উৎপাদিত দ্রব্য সমূহের খ্যাতি সুদূর অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি জায়গায় ছড়িয়ে

পড়ে এবং ভারতবর্ষের মিডা এণ্ড কোম্পানি আমের চাটনী প্রস্তুতকারক হিসাবে প্রথম স্থানের অধিকারী হয়।

১৯৬২ সালে শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র মহাশয় আমাদের এই গ্রামে ৬ একরের বেশি জায়গায় পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সমশ্রেণী পর্যায়ভুক্ত চাটনীর কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন।

এহেন কর্মবীরের জীবন আলোচনা করে কোন্নগর বাসী নিশ্চয়ই গর্ব অনুভব করবেন।

রচনা ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৬

দেহাবসান ঃ ৫জুন, ১৯৮৪

নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়-এর জন্ম ১৯০৬ সালের মহাসপ্তমীর দিন। পিতা ননীগোপাল এবং মাতা কিরণবালা দেবী। নগেন্দ্রনাথই এই পরিবারের প্রথম পুত্র সন্তান।

শ্রীরামপুরের শ্রীশ্রী রাধাবল্লভ ঠাকুরের বাড়ির বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের রাধিকা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, তাঁর পিতা দানপত্র দ্বারা সম্পত্তির কোনও বিলি ব্যবস্থা না করায় এবং তাঁর পরলোক গমনে নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুরমা ভবতারিণী দেবী তাঁর নাবলক পুত্রদের নিয়ে শ্রীরামপুরের শ্বশুর ভিটা ত্যাগ করে কোন্নগরে পিত্রালয়ে চলে আসতে বাধ্য হন, কেননা তখনকার আইন অনুযায়ী তাঁরা পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হতে পারতেন না। ভবতারিণী দেবীর পিতা হেমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কোন্নগর শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের উপর পুষ্করিণী সংলগ্ন একখণ্ড জমি কন্যাকে দান করেন। সেই জমির উপরই এই মুখোপাধ্যায় পরিবার বসবাস করছেন। ভবতারিণী দেবী অতিশয় ব্যক্তিত্বশালিনী এবং দারুণ মনোবল সম্পন্না মহিলা ছিলেন। নিদারুণ দারিদ্রের মধ্যে অতিশয় কৃচ্ছ সাধনের দ্বারা তিনি তাঁর একার চেষ্টায় তাঁর নাবালক পুত্রদের মানুষ করে তুলেছিলেন।

নগেন্দ্রনাথের জন্মের অব্যবহিত পূর্বে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বন্দেমাতরম মন্ত্রে দেশ তখন উদ্বেল। ১৯০৬-০৭ সালে এই আন্দোলন তুঙ্গে, ইংরেজ সরকার তখন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বন্দে মাতরম ধ্বনি বেআইনী ঘোষণা করল। কিন্তু স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ মানুষের কণ্ঠ তখন রোধ হয়নি। বড়দের কণ্ঠে 'বন্দে মাতরম ধ্বনি', শিশু নগেনের তখনো ভালো করে কথা ফোটে নি। আধো আধো ভাষায় বলে 'বন্দো' বন্দো', সেই থেকে নাম হলো "বন্দো"—শিশু বয়স থেকেই মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হলেন।

যথাসময়ে বিদ্যারম্ভ হলো, সতীর্থরা সকলেই প্রায় মেধাবী ছাত্র, কিন্তু তাঁর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া হলো না। কারণ, বন্ধুবৎসল বন্দোর প্রাণের বন্ধুর পারিবারিক কারণে পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছিল না। নগেন্দ্র মেতে রইলেন যাত্রা-থিয়েটার নিয়ে। কিন্তু ঘরেতে অভাব, একটা চাকুরীর বিশেষ প্রয়োজন। হিল্লেও ঠিক হয়ে গেলো, জ্যেষ্ঠতাত প্রয়াত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের সুপারিশে ইংলণ্ডের বিখ্যাত ইয়ুল পরিবারের এণ্ড্রু ইয়ুল কোম্পানীতে একটি নগণ্য পদে তিনি ১লা মে ১৯২৪ সালে যোগদান করেন। কর্মজীবনে অশেষ দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ সুদীর্ঘ প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর টানা কর্মজীবন শেষে সেদিনকার নগণ্য পদাধিকারী নগেন্দ্রনাথ ওই কোম্পানীর একজিকিউটিভ্ পদ থেকে থেকে অবসর গ্রহর করেন।

কর্মজীবনে তিনি এক ঈর্ষণীয় সম্মানের অধিকারী ছিলেন। মালিক-কর্মচারী বিরোধে তিনি ছিলেন উভয় পক্ষের আস্থাভাজন। কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে তিনি তাঁদের আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা,অন্যদিকে মালিক পক্ষে তিনি কোম্পানীর প্রকৃত হিতাকাঙ্খী বিশ্বস্ত অফিসার ও নিরপেক্ষ পরামর্শদাতা, এমনটি বড়ে দেখা যায় না। তাঁর অন্যতম কীর্তিঃ কর্মচারী-স্বার্থে তাঁর কোম্পানীতে কো-অপারেটিভ প্রতিষ্ঠাকরণ।

কোন্নগরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিরিশ দশকের গোড়ায় মহাত্মাগান্ধীর নেতৃত্বে—অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ ও হরিজন আন্দোলনের ঢেউ খেলে যায় আসমুদ্র হিমাচল। কোন্নগর সে আন্দোলনে পিছিয়ে থাকেনি। এই সব আন্দোলনে নগেন্দ্রনাথের সক্রিয় উদ্যোগ উল্লেখযোগ্য। আমৃত্যু তিনি গান্ধীজীর জন্ম দিবসটি হরিজন দিবস বলে মেনে এসেছেন। প্রতি বছর ঐদিনে তিনি কোনো একজন হরিজনকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করে নিজপাশে বসিয়ে একসঙ্গে আহার করতেন। ব্রাহ্মণত্ব বাধা হতো না।

১৯৬৯ সালে তদানীন্তন বাম ঘাঁটি রূপে পরিচিত উত্তরপাড়া কেন্দ্রে বিধানসভার অন্তবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন। উল্লেখযোগ্য যে, ইংরেজ কোম্পানীতে চাকরী করা সত্ত্বেও তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কখনও সংঘাতের পথে যায়নি। তিনি এবং

তাঁর বয়স্যদের এক রাজনৈতিক মতধারা হওয়া সত্ত্বেও অন্য মতবাদীর প্রতি তিনি অমিত্রতা পোষণ করতেন না। এটাই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

কোন্নগরের সমাজ জীবনে নগেন্দ্রনাথের অবদান বিপুল। নগরের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, নাট্যসংস্থা, ব্যায়াম-চর্চা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, সমবায় ব্যাঙ্ক ও পৌরসভা প্রভৃতি কোন্নগরের সমস্ত প্রতিষ্ঠানই তাঁর দীর্ঘ সেবার স্বাক্ষর বহন করছে।

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়কে প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নয়ন, নতুন গৃহ নির্মাণ, সমবায় ব্যাঙ্কের ক্রমোন্নতি, কোন্নগরের প্রাচীন নাট্য সংস্থা বীণাপাণি থিয়েট্রিকেল ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, একাধিকবার কোন্নগর পৌর সভার নির্বাচিত সদস্য তাঁর এগুলি কর্মযজ্ঞের কিছু কিছু নিদর্শন, কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির ঘাট উন্নয়ন সমিতির তিনি অন্যতম অছি ছিলেন। সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন তাঁর জীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত।

১৯২৮ সালে হাওড়া জেলার আন্দুল গ্রামের বাসিন্দা তৎকালীন ভারতের অন্যতম পীঠস্থান এশিয়াটিক সোসাইটির একজন বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও বিদ্যোৎসাহী যোগেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা নিবেদিতা দেবীর সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। নগেন্দ্রনাথের আরব্ধ কর্ম সম্পাদনের জন্য গৃহকোণে বসে নিবেদিতা দেবী প্রকৃত সহধর্মিনীর ভূমিকা পালন করতেন।

১৯৮৪ সালে ৫ জুন প্রায় ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁর দেহবসান হয়।

সূত্র ঃ শ্রদ্ধাবাসরে নিবেদিত স্বরণিকা থেকে সংক্ষেপিত।

লেখক ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১০. ৮. ১৯০৬

দেহাবসান ঃ ১২. ১. ১৯৯৭

১৯০৬ সালের ১০ আগষ্ট হুগলী জেলার শ্রীরামপুর শহরে মাতুলালয়ে নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পরিবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ হরিপাল থেকে কোন্নগরে এসে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর পিতামহ ডাঃ শশীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা পারিশ্রমিকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতেন এবং কলকাতায় ক্লাইভ স্ট্রিটে একটি আমদানি প্রতিষ্ঠানে তিনি চাকরি করতেন। তিনি শিবনাথ শাস্ত্রীর ঘনিষ্ট ছিলেন ও কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি তাঁর কন্যাদের বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখাতেন, তখনকার দিনে এই কাজটি কোন্নগরে প্রগতিশীল কাজ রূপে গণ্য হয়েছিল।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর পিতা প্রসাদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা হরিদাসী। পিতা প্রসাদ কুমার প্রথম জীবনে কলকাতার এক মেসে চাক্‌রি করতেন পরে নিজে এক আমদানি ব্যবসা শুরু করেন। মাতা হরিদাসী একজন ব্যক্তিত্বময়ী মহিলা ছিলেন। এমন এক পরিবারের সন্তান নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ভবিষ্যতে একজন স্বনামধন্য ব্যক্তি হবেন এটাই স্বাভাবিক।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি ১৯২৪ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জেলা-বৃত্তি লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি ইংরাজী ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে লেটার পান। তাঁর সতীর্থরা ছিলেন হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ঘোষাল, সুবোধ মিত্র, শিশির ঘোষ, প্রসন্ন কুমার দাঁ, সরোজ কুমার বসু প্রমুখ। এঁদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী জীবনে ও সমাজে কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছিলেন।

১৯২৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই, এ, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩২ সালে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ (বর্তমানে আর, জি, কর মেডিকেল) থেকে কৃতিত্বের সাথে এম. বি. ডিগ্রি লাভ করেন ; এবং স্বাস্থ্য (মেডিকেল) বিষয়ে স্বর্ণ পদক লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন। তারপর তিনি দীর্ঘ ৬৪ বছর নিজ গ্রাম এই কোন্নগরে চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।

চিকিৎসক হিসাবে তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ৮৫ বছর বয়সেও তিনি যথারীতি কর্তব্য পালন করে গেছেন এমনকি এই বয়সেও অধিক রাত্রে রোগী দেখা থেকে কখনো কাউকে বিমুখ করেন নি। দরিদ্র রোগীদের প্রতি দয়াশীল ছিলেন। তিনি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় কি চিকিৎসা ক্ষেত্রে বা অন্যান্য কর্মে সর্বদা ব্রতী থাকতেন—ক্লান্তি কি তা তিনি জানতেন না।

সাহিত্য সেবী হিসাবে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি অনেক কবিতা এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। কোন্নগর পাঠচক্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আজীবন তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং তারই ফলে তাঁকে নানা বিষয়ের উপর উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখতে হয়েছে। কোন্নগরের ইতিহাসের নানা দিক নিয়ে তিনি চর্চা করেছেন— কোন্নগরের পথঘাট, অতীত দিনের মহান ব্যক্তিদের জীবনী, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দেব দেউল, এমনকি অঞ্চল সমূহের নামের ইতিবৃত্তও রচনা করেছেন। অসংখ্য ব্যায়াম, শিক্ষা, খেলাধূলা, জনসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে সভায় উপস্থিত থেকে ও ভাষণ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন। এমনকি বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থেকেছেন। "আমাদের কোন্নগর" নামক কোন্নগরের এই ইতিহাস গ্রন্থটি তাঁর জীবনের এক মহান কীর্তি।

কোন্নগর থেকে প্রকাশিত "কোন্নগর প্রকাশিকা" মাসিক পত্রিকাখানি প্রকাশে তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল এবং এই পত্রিকায় তাঁর অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য ব্যতীত ধর্ম, বিজ্ঞান, মনস্তত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পাঠের পরিধি ছিল বহু বিস্তৃত। নানা বিষয়ের গ্রন্থাদিতে পূর্ণ তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল।

তিনি রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কোন্নগর কংগ্রেস কমিটিতে দীর্ঘদিন নানা

দায়িত্ব পূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। অবশ্য কংগ্রেস ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর (সিণ্ডিকেট কংগ্রেসের আবির্ভাবের পর) তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগর পুর সভার উপ পুরপ্রধান ও পুর সদস্য হিসাবে যথাক্রমে আট ও ছ'বছর মোট চোদ্দ বছর যুক্ত থেকে যথেষ্ট কর্মদক্ষতা দেখিয়েছেন।

১৯৫৭ সালে কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা থেকেই তিনি ও ডাঃ গোকুল দত্ত সামান্যমাত্র সম্মান দক্ষিণায় 'পরিদর্শক ডাক্তার' হিসাবে মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত সেবাকর্মের যে অবদান রেখে গেছেন কোন্নগরের মানুষ তা চিরদিন স্মরণে রাখবে।

সামগ্রিক ভাবে রাজ্যের পুরসভাগুলির সমস্যা অনুধাবন ও সেগুলির উন্নয়নের জন্য ১৯৩৬ সালে হাওড়া শহরে অল্ বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৪৯সালে এই এসোসিয়েশনের নাম হয় ওয়েষ্টবেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশন। এবং ১৯৩২ সালের ৫ ডিসেম্বর বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট চালু হয়। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন এমন কয়েকটি সম্মেলনের সাল এবং স্থানের তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১৯৫৬ সাল ১৮ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বোলপুরে। এই সম্মেলনে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সভাপতি এবং তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য মনোনীত হন।

১৯৫৭ সালে ১৯ তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল জিয়াগঞ্জে। এই সম্মেলনে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন সদস্য হিসাবে যোগদান করেন।

১৯৭৯ সাল, ২৫ তম সম্মেলন অনুঠিত হয়েছিল বাঁকুড়ায়। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন।

১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৯৭র ১২ জানুয়ারী অর্থাৎ মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিন কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়া তিনি অসংখ্য সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব

করেও মূল্যবান ভাষণ দেন এবং অনেক প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেছেন নীচে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখিত হলো, যদিও তালিকাটি অসম্পূর্ণঃ

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (চিকিৎসা কেন্দ্র)	২২৫০/=	টাকা
কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ	৫০০০/=	”
সার্বজনীন পূজা মণ্ডপ কমিটি বিশালাক্ষী সড়ক	৫০০/=	”

এছাড়া গরিব কন্যাদের বিবাহের জন্য কয়েক হাজার টাকা দান করেছেন।

১৯৫৮-১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন এবং দীর্ঘদিন কোন্নগর হিন্দু উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমানে এই বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এই বিদ্যালয়ের তিনি যে যে পদ অলংকৃত করেছিলেন তা নীচে দেওয়া হলো।

১৯৪৪-১৯৪৮	কোষাধ্যক্ষ
৩০.১১.৫০ থেকে ১৯৫৭/৫৮	সদস্য
১৯৭৫-১৯৭৮	সভাপতি
১৯৭৮র ডিসেম্বর থেকে	সদস্য

বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী কমিটির সভাপতি (রায় সাহেব জ্যোতিষ চন্দ্র গাঙ্গুলীর পরে)

১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসব কমিটির সহ সভাপতি

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের কোন্নগর শাখার প্রতিষ্ঠার দিন থেকেই এই শাখার সভাপতি ছিলেন।

আই, এস, আই মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখার অষ্টম সম্মেলনে (সম্ভবত ১৯৭৫-৭৬) তিনি সহ সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু ওই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

১৯৮২ সালে গঠিত নৃসিংহদাস বসু জন্মশতবর্ষ কমিটির সভাপতি মনোনীত হন। স্মৃতিরক্ষা উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়েছিল ১৯.৯.১৯৮২ তারিখে এবং ব্যাপক কর্মসূচি গৃহীত হয়েছিল যার মধ্যে ছিল নৃসিংহদাস

বসুর আবক্ষমূর্তি স্থাপন, একখানি স্মরণিকা প্রকাশ এবং ছাত্রবৃত্তি প্রদানের জন্য তহবিল গঠন। ১৯৮৪ সালের ১১ ও ১২ই ফেব্রুয়ারী দু'দিন সমাপ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর পৈত্রিক বাড়ি থেকে প্রাপ্ত তাঁর অংশের দোতলায় ১৯৯২ সালে তাঁরই তৈরি 'কুডরো' (KUDRO) র তহবিল থেকে পিতৃব্য বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্মরণে "বিনয়কৃষ্ণ পাঠাগার ভবন" নির্মাণ করেন।

তিনি তাঁর অর্জিত অর্থ থেকে ১৫০০০০/- স্থায়ী আমানত রেখে ২০.৩.১৯৮০ সালে মাতা হরিদাসী দেবী ও পিতা প্রসাদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে "হরি-প্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড" গঠন করেন। এই তহবিলের আনুমানিক বার্ষিক সুদ ১৫০০০/- টাকা থেকে কোন্নগরের বিভিন্ন সমাজ কল্যাণ মূলক ব্যায়াম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি, পাঠাগার ধর্ম ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক আর্থিক অনুদানের মাধ্যমে সহায়তা করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান, কোন্নগর আরবান ডেভেলপমেন্ট ও রিলিফ অরগানাইজেশন (সংক্ষেপে কুড়রো)। এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোন্নগর পুরসভাকে কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে যথাক্রমে একটি ও দুটি ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য ২,৬০.০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে পরে এবং পরে মাতৃসদনের উন্নতিকল্পে এই প্রতিষ্ঠান থেকে আরো আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সম্প্রতি শকুন্তলা বারোয়ারীকে 'সেবা ভবন' নির্মাণের জন্য ১০০ ০০০ টাকা দানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

উপরোক্ত দু'টি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠনের জন্য ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কষ্টার্জিত আয় থেকে ১২,০০ ০০০ টাকা দান করেছেন।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সাধারণ ঘরে জন্ম গ্রহণ করে অতি সহজ-সরল অনাড়ম্বর দীর্ঘ জীবন যাপন করেছেন। তাঁর জীবনের মহান কর্মধারা বহুধা বিস্তৃত এবং দানশীলতা একটা উদাহরণের সৃষ্টি করেছে। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এই আদর্শস্থানীয় জীবনালেখ্য কোন্নগরের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

সুবোধ কুমার মিত্র

জন্ম ঃ ১৯০৬

দেহাবসান ঃ ১৯৯৩

সুবোধ কুমার মিত্র-র পিতা হরিসত্য মিত্র, মাতা কমলিনী মিত্র। অতুল মিত্র লেন যাঁর স্মরণে তিনি ছিলেন ফ্রেণ্ডস্ ড্রামাটিক ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং সুবোধ কুমার মিত্র-র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

সুবোধ কুমার ১৯২৪ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন এবং এখান থেকেই বি. এস. সি পরীক্ষায় পাশ করেন। এরপর তিনি কষ্ট এ্যাকাউণ্টেসি শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং Fellow of the Costing & Management Accounts এর London Institute থেকে FICWA ১৯৪০ সালে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তখন ভারতবর্ষে এই ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল না। তিনি দিল্লীর Controller General of Defence Accounts এর Deputy Controller পদে আসীন ছিলেন।

সুবোধ কুমার জাপান, জার্মানী, কানাডা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের Costing Institute গুলিতে Problemetie Cases-র বক্তৃতা দিতে নিমন্ত্রিত হতেন। Cost Accountant সম্পর্কীয় বিভিন্ন দেশের পত্রিকায় তাঁর প্রচুর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লণ্ডন ইনস্টিটিউট থেকে পাশ করার পর সেখানকার জার্নালে লেখা ও বক্তৃতা দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকেন।

তারপর তিনি কলকাতায় সদর স্ট্রিটে Indian Institute of Cost & Works account (I. I. C. W. A) প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ নেন এবং তা গড়ার পর ওই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হন। London Costing Institute তাঁকে Cost Audit প্রাকটিস করার জন্য লাইসেন্স দিয়েছিল।

চাকরি থেকে অবসর নেবার পর স্বাধীনভাবে Cost Audit প্রাকটিস করার জন্য দিল্লীতে I. K. Mitra & Co, Cost accountants এই নামে

একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন, তাঁর মৃত্যুর এক বছর আগে পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

জনসেবা ও সাংস্কৃতিক মূলক কাজ কর্মে তাঁর ভূমিকা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। কোন্নগরের নানা নাট্যসংস্থা যথা ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন, মেরী ক্লাব ও স্যাটারডে ক্লাবের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে মুখ্য স্ত্রী চরিত্রে অবতীর্ণ হতেন।

কোন্নগরের বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান পাঠচক্রের কার্যকলাপে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতেন। সাহিত্য বিষয় ব্যতীত সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিতর্কমূলক বিষয় সমূহও আলোচনার বিষয় বস্তু হতো। ১৯৩৯ সালে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় বিধান সভায় ড. রাওদেশমুখ হিন্দু বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব আনেন। সেটিকে উপলক্ষ্য করে মানুষের মধ্যে বিতর্ক ও আলোড়ন সৃষ্টি করে। কোন্নগরেও এর ঢেউ এসে লাগে, কোন্নগর পাঠচক্রে স্বভাবতই এটিকে একটি আলোচনার বিষয়বস্তু করে। এই আলোচনাকে সংগঠিত করার জন্য সুবোধ কুমার মিত্র এগিয়ে আসেন। তিনি বাংলা দেশের বিশিষ্ট পণ্ডিত যথা শ্রীজীব বাবু ও অশোক শাস্ত্রী প্রমুখ পণ্ডিতগণকে আমন্তণ করে নিয়ে আসেন এবং নিজেকেও ঐ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য তৈরী করতেন। এই আলোচনা সভাকে কেন্দ্র করে কোন্নগরের রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তনপন্থী তথা প্রগতিশীলতার মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। প্রায় ৬০ বছর আগে যেটা বিতর্ক ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বর্তমানে তা একটি স্বাভাবিক সামাজিক বিষয়রূপে স্বীকৃত।

হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক রূপে তাঁর অবদান উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৪৮ সালে তখন এই বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ান হত এবং সেই অনুপাতে শ্রেণী কক্ষের সংখ্যাও ছিল অল্প। সেই সময় এই বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত ব্যক্তিগণ যথা ননীগোপাল বসু, অনিল কুমার ঘোষ, নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উদ্যোগী হয়ে নূতন কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন করে এই দুটি বিষয় অর্থাৎ দশম শ্রেণীতে বিদ্যালয়কে উন্নীত করা এবং সেই অনুযায়ী বিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণ করা। এই দুরূহ কাজ দুটিকে রূপায়িত করার জন্য তাঁরা মনে প্রাণে সঙঘবদ্ধ হন, নূতন সম্পাদক সুবোধ কুমার মিত্রকে ঘিরে এঁদের উদ্যম ও জনসাধারণের সাড়ার ফলে এই কাজ দ্রুত সমাধানের

পথে অগ্রসর হয়। ১৯৫০ সালে সুবোধ বাবু দিল্লী বদলী হয়ে যান। তখন সম্পাদক হন নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তিনি এই কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁরই কার্যকালে বিদ্যালয় দশম শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং গৃহ সম্প্রসারণের কাজও সম্পন্ন হয়।

এছাড়া তিনি কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ও পাঠকক্ষের কার্যনির্বাহী সমিতির সভ্য হিসাবে ঐ প্রতিষ্ঠানের সেবা করেছেন।

সুবোধ বাবু কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের দু'বার চেয়ারম্যান মনোনীত হয়ে ব্যাঙ্কের উন্নয়নের কাজে তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

তিন পুত্র ও চার কন্যা রেখে সুবোধবাবু প্রয়াত হন। বর্তমানে তাঁর পুত্র কল্যাণ মিত্র দিল্লিস্থ Small Scale Industries এর ডেপুটি হিসাবে অবসর নিয়েছেন এবং এক দৌহিত্র ডাঃ অভিজিত পাল এম. ডি, Assembly of God Church Hospital এর চিকিৎসক। তাঁর এক ভাই সুধীর কুমার মিত্র, কোন্নগর পুরসভার দু'বার সদস্য হয়েছিলেন এবং কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ ভাই সুনীল কুমার মিত্র এক সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। মিত্র পরিবার এই ভাবে কোন্নগরের সমাজ জীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তাঁর জীবনের প্রথম ভাগ কোন্নগরের নানা সাংগঠনিক কাজে নিবেদিত হয় আর দ্বিতীয় ভাগ কোন্নগরের বাইরে এক উদ্যোগী ও সফল পুরুষের কর্মোদ্যোমে রূপ পায়।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

(বিঃদ্রঃ—লেখার উৎস—কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের শতোত্তর জন্মজয়ন্তীর স্মারক ও কোন্নগর পাঠচক্রের সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মারক গ্রন্থ এবং ভাগিনেয় জিতেন্দ্র নাথ বসুর সাক্ষাৎকার।)

ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী

জন্ম ঃ ১৯০৮

দেহাবসান ঃ ৩০. ৫. ১৯৮৩

ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী ১৯০৮ সালে জন্ম গহণ করেন। পিতা হেমচন্দ্র চৌধুরী। হেমচন্দ্র চৌধুরী ৩২ বছর বয়সে বিপত্নীক হলে দুই পুত্র অনিল চৌধুরী এবং এক কন্যা কণকলতাকে নিয়ে জীবন কাটাতে থাকেন। এঁদের পূর্ব পুরুষ কাশ্মীর রাজ জটাধর নাগ ও কর্কট নাগ। সেজন্য এঁদের পদবী নাগ। অমল চন্দ্র চৌধুরীর প্রপিতামহ নদীয়া জেলার ধরমপুর গ্রামের জমিদার ছিলেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে জমিদার হয়েও তিনি তাঁর ধানের গোলা খুলে দিয়ে বহু নিরন্ন পরিবারের জীবন রক্ষা করেন। তারই ফলে ব্রিটিশ সরকার তাঁকে 'রায়চৌধুরী' উপাধি দেন এবং সেই থেকেই এঁরা 'চৌধুরী' উপাধি ব্যবহার শুরু করেন।

ড. অমল চৌধুরী মাতৃহারা হয়ে কিছুদিন মামার বাড়িতে থাকার পর তাঁর পিতা তাঁকে নিজ কর্মস্থলে অর্থাৎ তিনি যে যে উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন সেখানেই পুত্র অমলকে নিয়ে থাকতেন।

ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী পাঠশালার এক পরীক্ষায় অঙ্কে ফেল করায় পিতার কাছে যথেষ্ট তিরস্কৃত হন। তিরস্কৃত হয়ে তিনি বলেন "সেদিন আমি বাড়ি ফেরার সময় বাগানের কাঁটাতারের তলা দিয়ে সর্টকার্ট করতে করতে প্রতিজ্ঞা করলাম আমি অঙ্ক শিখবই। বাড়ি ফিরে ক'দিনের মধ্যে পাটিগণিতের সব অঙ্কই কষে ফেললাম এবং তারপর থেকে অঙ্কে ১০০র মধ্যে ১০০ই পেতাম"

খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ও পরে আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এস, সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালোভাবে

গণিতে এম, এস, সি করেন। সেই বছরেই রিসার্চ স্কলারশিপ্ পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট টাইম লেকচারার নিযুক্ত হন।

১৯৪৩ সালে সুপণ্ডিত জার্মান বিজ্ঞানী ড. এফ, ডব্লিউ লেভি সাহেবের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করে ডক্টরেট হন। তাঁর অসাধারণ মেধা, অঙ্কে ক্ষুরধার পাণ্ডিত্য এবং নিজস্ব অবদানে তিনি অধ্যাপকের পুত্রাধিক প্রিয় ছিলেন। শুধু তাই নয় ড. মেঘনাদ সাহা, ড. সত্যেন বসু প্রমুখ বিজ্ঞানীরা তাঁকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। অঙ্ক শাস্ত্রে তাঁর নতুন নতুন উদ্ভাবন ও পদ্ধতি সারা ভারতবর্ষে ও বিদেশের পত্র-পত্রিকায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসিত হয়েছিল। সুদীর্ঘকাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যাপনা করে বিভাগীয় প্রধান হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। ইউ, জি, সি থেকে তঁকে রিনাউণ্ড সাইয়েন্টিস্ট হিসাবে আরো কয়েক বছর রিসার্চ গাইড হিসাবে তাঁকে নিযুক্ত করেন।

১৯৪৯ সালে কোন্নগরে জাষ্টিস এম, এন, বসু লেনে (মাষ্টার পাড়া) বাড়ি করে বসবাস শুরু করেন এবং এখানকার সমাজ ও শিক্ষা জীবনের সাথে নিজেকে যুক্ত করে শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সেবায় ব্রতী হন।

ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের (বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়) পরিচালন সমিতিতে ৩০. ৪. ৬০এ সহ সভাপতি এবং ১২. ৯. ৬০ থেকে ৭. ১০. ৬৭ পর্যন্ত সভাপতি ছিলেন। এছাড়া কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ প্রতিষ্ঠিত একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতি বা উপদেষ্টা রূপে যুক্ত ছিলেন এবং নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজের সাথে নানা ভাবে যুক্ত ছিলেন।

এইভাবে ড. অমল চন্দ্র চৌধুরী সার্থক ও সফল জীবন যাপনের পর ১৯৮৩র ৩০মে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্বনামধন্য স্ত্রী অধ্যক্ষা, সংগীতাজ্ঞা লেখিকা ড. বাসন্তী চৌধুরী, একমাত্র পুত্র, পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক অরুণাংশু চৌধুরী, পুত্রবধূ ও পৌত্রীকে রেখে যান।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ৩০ এপ্রিল ১৯০৯

দেহাবসান ঃ ১০ জুন ২০০০

কাননবিহারীর বাবা কোন্নগরের বিশিষ্ট মুখোপাধ্যায় পরিবারের রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় এবং মা উত্তরপাড়া নিবাসী বিখ্যাত জমিদার মনোহর মুখোপাধ্যায়-এর ভাগ্নি চুনীবালা দেবী। চুনীবালা দেবী ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক গুণসম্পন্না মহিলা। রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় উত্তরাধিকার সূত্রে কোন বিষয় সম্পত্তি লাভ না করলেও তাঁর মধ্যে ছিল স্বাধীন চিন্তা, দেশপ্রেম এবং তিনি ছিলেন দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। এই পরিবারেই কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর জন্ম এবং দশ ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সপ্তম, বাবার আদর্শবাদিতা, সাহিত্যানুরাগ, চিত্তের দৃঢ়তা এবং মা-র রাজসিকতা, সৃজনশীলতা ও নেতৃত্বশক্তি কাননবিহারী জন্ম সূত্রে পেয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর চরিত্রে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলেছিলেন তাঁর সেজদা বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও ন'দাদা প্রখ্যাত অভিনেতা বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়।

কানন বিহারীর পড়াশোনা শুরু হয় কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে। কিন্তু তিনি যখন এই বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র তখন বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় ছাত্রদলের অধিনায়ক হিসেবে বিপ্লবী দলের গুরুর নির্দেশে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধতায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিদ্যালয় থেকে বিতাড়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তিনি উত্তরপাড়া গভর্ণমেণ্ট হাইস্কুলে ভর্তি হন, এবং এখান থেকেই কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে উত্তরপাড়া কলেজ থেকে আই, এ, বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স সহ বি, এ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পাশ করেন।

এম, এ পরীক্ষায় পাশ করার পর তাঁর ইচ্ছা ছিল চাকরী জীবনে প্রবেশ

করার আগে ভারত পরিক্রমাটা সেরে নেবেন এবং গোপনে তারই তোড়জোড় করতে থাকেন, এমন সময় খবরটা আসে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে একজন সাহিত্যরসিক অধ্যাপক খুঁজছেন। খবরটা আসে কাননবিহারীর দাদা ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়-এর বন্ধু অধ্যাপক নির্মল বসু-র মাধ্যমে। খবরটি শুনে কানন বিহারীর মনে কোন উৎসাহ জাগল না। তাঁর তখন একমাত্র লক্ষ্য ভারত পরিভ্রমণ। তখন তাঁর এক কবি বন্ধু কানন বিহারীকে বললেন—রবীন্দ্রনাথের মতো মহাপুরুষের সান্নিধ্যে যদি আসতে পারেন ভারতবর্ষ ঘুরে না দেখলেও কোন ক্ষতি হবে না। কথাটা বিদ্যুৎ চমকের মতো তাঁর মনকে নাড়া দিল এবং তিনি ভারত পরিভ্রমণ ইচ্ছার পথ থেকে সরে এসে শান্তি নিকেতনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। কানন বিহারীর জীবনে শুরু হলো শান্তিনিকেতন পর্ব।

শান্তিনিকেতনে পৌঁছে কবির সচিব অনিল চন্দ্রের সংগে এসেছিলেন গুরুদেবের কাছে। কবির ধ্যানদীপ্ত জ্যোতির্ময় মূর্তি, সরস অথচ প্রখর ব্যক্তিত্ব ও সুরেলা তেজোদীপ্ত বাক্যালাপে কাননবিহারী তন্ময় হয়ে গেলেন। গুরুদেবের সঙ্গে 'তপতী' ও 'রাজারাণী' নাটক নিয়ে আলোচনা হলো। এবং এই সময় থেকে আমরণ কানন বিহারীর জীবনে রবীন্দ্র স্মরণ, মনন ও কীর্তন হলো একমাত্র ব্রত।

দিন দশেক হলো কাননবিহারী রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত বিশ্বভারতীর কাজে যোগদান করেছেন, রবীন্দ্রনাথও তাঁকে কাছে টেনে নিয়ে নিজের গ্রন্থ সম্পাদনার সব ভার দিলেন। কাননবিহারীর এখানে দৈনন্দিন কাজের সূচী হলো, সকাল বেলা শিক্ষাভবন এবং পাঠভবনে অধ্যাপনা ও বিকেলে 'উত্তরায়ণে' গিয়ে কবির ঘনিষ্ঠ-তত্ত্বাবধানে সাহিত্য সম্পাদনার কাজ। 'গল্পগুচ্ছ' নতুন করে সম্পাদনার কাজ শুরু এখান থেকেই। জানা যায় ১৯৩৬র সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৩৮'র জুলাই মাস পর্যন্ত কানন বিহারী রবীন্দ্র সান্নিধ্যে অতিবাহিত করেছেন।

সাহিত্যের কাজ ভালোই এগোচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ ছন্দপতন ঘটল। যে সম্পাদনার কাজ কাননবিহারীকে রবীন্দ্রনাথের কাছে টেনে এনেছিল, সেই কাজেই একদিন তাঁকে কবিগুরুর সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল। গল্পগুচ্ছ সম্পাদনার পর 'বাংলা কাব্য পরিচয়' সংকলনের কাজের দায়িত্ব দিলেন

কাননবিহারীকে, কিন্তু এই গ্রন্থ প্রকাশের পর প্রত্যক্ষ ভাবে জড়িত থাকায় নানা কারণে কাননবিহারীর ওপরও দারুণ চাপ এসে পড়ে এবং তারই ফলে ক্ষুব্ধ কাননবিহাবী শান্তিনিকেতন ছাড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শান্তি নিকেতন থেকে ফিরে এসেই মহাকবির বৈচিত্র্যময় ব্যক্তিত্বের মূল স্বরূপ অন্বেষণে রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রগামী ও বিভিন্ন খণ্ডসত্ত্বার সমন্বয়ে যে ব্যক্তিসত্ত্বা তার বিশ্লেষণ করে তিনি লিখলেন 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ'। এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে। এরপর তিনি জীবন কথা লেখার কাজে হাত দিয়ে লিখলেন 'স্বামীজির জীবন কথা' (জানুয়ারী ১৯৪০) এবং এই সূত্র ধরেই 'রবীন্দ্র জীবন কথা' রচনা করেন এবং প্রথম প্রকাশিত হয় মে, ১৯৪৩।

কাননবিহারী শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে এসে বোম্বাইয়ে লিন্টেস কোম্পানীতে যোগ দেন কিন্তু সেখানকার অতিরিক্ত সাহেবিকেতা, অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন ব্যবহারে তাঁর রাবীন্দ্রিক মন সায় না দেওয়ায় তিনি চাক্‌রি ছেড়ে কলকাতা চলে আসেন এবং আর এক সাহেব কোম্পানীতে যোগ দেন কিন্তু সেখানেও বেশিদিন কাজ করতে পারেননি। অবশেষে লেখালেখির দিকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করেন।

একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, কাননবিহারী মুখোপাধ্যায় 'মানুষ রবীন্দ্রনাথ' নিয়ে যে লেখা শুরু করেছিলেন 'শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের লীলাকথা'র মধ্যে তার পরিণতি লাভ করে। প্রথমে লেখেন 'লীলা কথা' (১৯৫০) পরে 'শ্রীশ্রী সারদামণি'। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শরৎচন্দ্র প্রমুখের জীবনী লেখার সঙ্গে সঙ্গে ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি সাহিত্য সৃষ্টি করেন এবং সেগুলি প্রকাশিত হয় বিচিত্রা, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বসুধারা ইত্যাদি পত্রিকায়। তিনি 'যে নদী মরুপথে' ও 'ঘুম পাড়ানী গান' নামক দুখানি উপন্যাসও রচনা করেন। বিদেশী কথা সাহিত্যে সপ্ত কিশোরী ভাষান্তরিত অনুরচন কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়-এর আর একখানি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যসৃষ্টি।

কানন বিহারী পশ্চিম বঙ্গ সরকারের প্রচার বিভাগে সহ অধিকর্তা রূপে যোগদান করেন। কলকাতা থেকে কোন্নগরে চলে আসেন এবং ১৯৪৪ সালে গীতাদেবীর সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন এবং তিনটি কন্যার জনক হন।

কিন্তু এর পরে তাঁর জীবনে পরপর দুটি বিপর্যয় ঘটে। প্রথম, অল্পদিন রোগ ভোগের পর ১৯৫১ সালে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। দ্বিতীয়, উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধের ফলে সরকারী চাকরি থেকে পদত্যগ করেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র চল্লিশ অতিক্রম করেছে। ১৯৫৬ সালে তঁর বাবা এবং মা পরলোক গমন করেন। এই সময়ে কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর ভাইঝি ও রবীন্দ্র-ঘনিষ্ঠ সুনন্দা দেবীকে বিবাহ করেন।

স্ত্রী, বাবা ও মার পরলোক গমনে তিনি ভেঙে না পড়ে সম্পূর্ণ রূপে নিজেকে উৎসর্গ করলেন লেখাপড়া ও প্রকাশনার কাজে। শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন কবিগুরু তাঁকে পাঠ্যপুস্তক রচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা তাঁর স্মরণে থাকায় এই পথেই তিনি অগ্রসর হলেন। তাঁর রচিত 'মহামানুষদের কথা' (১৯৪০) ও 'স্বামীজির জীবন কথা' বিদ্যালয়ের দ্রুত পাঠ্য হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল। এছাড়া এই সময়ে তিনি আরো অনেক বই লিখেছিলেন।

কাননবিহারী যখন লেখার কাজে নিমগ্ন সেই সময় তিনি মহাজাতি সদন থেকে প্রথম কর্মসচিব রূপে যোগদানের ডাক পেলেন এবং কৃষ্ণ কৃপালনীর উদ্যোগে প্রাথমিক কাজের পর তিনি মহাজাতিসদনের প্রথম কিউরেটর হন। কাননবিহারী মহাজাতি সদনকে স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা ও গবেষণার পীঠস্থানে পরিণত করতে চেয়েছিলেন।

কয়েক বছর পরে রবীন্দ্র ভারতীর মিউজিয়মের অধ্যক্ষ রূপে কাজ করার ডাক পেলে তিনি তা গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালে রবীন্দ্রভারতী থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁর কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটে।

মুক্ত প্রকৃতির মধ্যে বাস করার কানন বিহারীর অনেক দিনের আশা, মনোমত বাগান সহ বাড়ি তৈরি করে সেখানে সপরিবারে বাস করবেন, এবং বসরাস শুরুও করেন, ফলে ক্রমশঃ লোক চক্ষুর আড়ালে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেন। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্র ছিন্ন হওয়ায় তিনি বিরূপতার শিকারের মধ্যে পড়েন এবং নিদারুণ আত্মচারিতার জন্য তিনি ঘরে বাইরে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হন।

বার্ষিক বক্তৃতার জন্য অর্থদান ও গবেষণার জন্য তাঁর সাহিত্য সংগ্রহ ও গরেষণা পত্র তিনি রবীন্দ্র ভারতীকে দান করেছেন।

সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তারই ফলে ছাত্রাবস্থায় 'কোন্নগর পাঠচক্র' স্থাপনাকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। মহাকবির দেওয়া নামানুসারে শান্তিনিকেতনে 'সাহিত্যিকা', কলকাতায় 'কলকাতা সাহিত্যিকা' এবং কোন্নগরে 'জন সাহিত্যিকা' স্থাপনা তাঁর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

গুণীজন সমাজে কাননবিহারী মুখোপাধ্যায়-এর বিশেষ কদর ছিল। তিনি শরৎচন্দ্র, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, উপেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৌমেন ঠাকুর, মীরা দেবী, প্রতিমা দেবী, রথী ঠাকুর, কৃষ্ণ কৃপালিনী, তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ সাহিত্য জগতের দিকপালের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।

তাঁর সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর তাঁকে পুরস্কৃত করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের ১২৫ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত করা হয়।

সূত্র ঃ ১।। অচিন রায় রচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

২।। আনন্দ পত্রিকা

ডাঃ গোকুলেন্দ্র মোহন চৌধুরী

জন্ম ঃ ১৯১০

দেহাবসান ঃ ১০ জুন ২০০০

ডাক্তার গোকুলেন্দ্র মোহনের আদি নিবাস বীরভূম জেলার লিচকরণ গ্রামে। থানা—নানুর। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালে ভালোভাবে ম্যাট্রিক পাশ করেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আই. এস. সি পাশ করেন ১৯২৮ সালে। তারপর ১৯৩৪ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. বি (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)পাশ করে পদক লাভ করেন। তাঁর সহপাঠী কয়েকজন পরে খ্যাতনামা চিকিৎসক হয়েছিলেন।

মধ্যবিত্ত পরিবারভুক্ত ছিলেন বলে ডাঃ গোকুলেন্দ্র মোহন ১৯০৭ সালে নদীয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমায় ডাক্তারী আরম্ভ করেন। এই সময় কিছু প্রভাবশালী ডাক্তারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। মাত্র দু' থেকে চার টাকা ফি-তে তিনি মহকুমার বিরাট অঞ্চলে সাইকেলে যাতায়াত করে চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেন। স্বাধীনতায় দেশভাগ হলে ডাঃ চৌধুরী ওই অঞ্চল ছেড়ে ধুলিয়ানের (মুর্শিদাবাদ) ভগবতী চরণ চ্যারিটেবল্ ডিস্পেনসারিতে মেডিক্যাল অফিসার হিসাবে যোগ দেন। এই ডিস্পেনসারি চালাতেন 'রায় বংশের' জমিদার। ডাঃ চৌধুরীর বন্ধু ছিলেন হোম সেক্রেটারী শ্রী জি. সি. মণ্ডল মহাশয় তাঁকে সাহায্য করে ছিলেন, মাইনে ছিল মাসিক ৮০ টাকা। প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার অধিকার ছিল। তাঁর প্রসার ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। তাঁর ফিস ধার্য ছিল ২ টাকা থেকে ৫ টাকা। ১৯৭৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার উক্ত ডিস্পেনসারি বন্ধ করে দেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন সিদ্ধার্থশংকর রায় এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী অজিত পাঁজা। কোনো আবেদনেই সরকারী অনুমতি পাওয়া গেল না। তাঁর ডাক্তারী খ্যাতি গোটা মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে পড়ল। এবং বন্যা বা অন্য কোন বিপর্যয়ে তিনি লোক হিতকর প্রয়াসে তাঁর পারিশ্রমিক ৪ টাকার উপর বাড়ান নি। যদিও তাঁর বাড়ি থেকে এই ফিস বাড়নোর যথেষ্ট চাপ ছিল।

এর পরে ডাক্তার গোকুলেন্দ্র মোহন চৌধুরী ধুলিয়ান ত্যাগ করে কোন্নগরে সপরিবারে চলে আসেন ১৯৮৪ সালে এবং নরেন্দ্র ব্যানার্জী সরণিতে বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস শুরু করেন কিন্তু তাঁর লোক হিতকর কাজের ধারা অব্যাহত থাকে। তিনি কোন্নগর আই-এম-এ-র সদস্য হোয়ে লোক হিতকর কাছে ব্রতী হন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ডাঃ আই. এস. রায় যখন মেডিকেল কলেজের চক্ষু হাসপাতালের ডিরেক্টর, তখন একবার ডাঃ গোকুলেন্দ্রের তাঁর সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন হয়, সময়টা ১৯৮৫ সাল। ডাঃ আই. এস. রায় বেরিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন, এবং বলেন অতীত দিনের মেডিকেল জুয়েলের দেখা পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করছেন। ডাঃ গোকুলেন্দ্র মোহন চৌধুরীর রোগী বুঝবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। এমনও দেখা গেছে, বেশ নামী জাক্তারের চিকিৎসায় থেকে রোগীর উন্নতি হচ্ছে না দেখে তখন তিনি তাঁর ক্লিনিক্যাল চোখ দিয়ে রোগ নির্ণয় করে এমন অষুধ দিতেন যে রোগী আরোগ্য লাভ করল, এমন একাধিক দৃষ্টান্ত আছে।

এই বিশিষ্ট চিকিৎসক গোকুলেন্দ্র মোহন চৌধুরীর জীবনাবসান হয় ১০ জুন ২০০০ সাল শনিবার। কোন্নগরের বহু মানুষ তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাস ভবনে উপস্থিত হন। ২৫ জুন ২০০০. তারিখে কোন্নগর আই. এম. এ শোক সভার আয়োজন করেন।

লেখক ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোরঞ্জন হাজরা

জন্ম ঃ ৩০-৮-১৯৯১/দেহাবসান ঃ ২৭-১২-২০০১

এই রাজনৈতিক নেতার জীবন ঘটনাবহুল ও বৈচিত্রময়।

৩০/৮/১৯১১ সালে তিনি শ্রীরামপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা গণেশচন্দ্র হাজরা। কিশোর বয়সে ছাত্রাবস্থা থেকে নানা জনহিতকর ও রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন। এরপর কৃষকদের নানা সমস্যা যথা খাল খনন ও সংস্কার প্রভৃতি সেবামূলক কাজে যোগ দেন। এবং ইণ্ডিয়ান পিপলস্ রেভোলিউশনারী নামে এক বামপন্থী রাজনৈতিক পার্টির সভ্য হয়ে সেই সময়কার অন্যান্য বিশিষ্ট নেতাদের সহযোগে শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনে জড়িত হন। এর পর ১৯৩৪ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হন।

পরবর্তীকালে ১৯৪৭ সালে শ্রীদুর্গা সুতাকলের শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করেন। মালিকের অবর্ণনীয় শোষণ অত্যাচারের সাথে সাথে প্রশাসনের মালিক তোষণ নীতির বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠিন সংগ্রামে তিনি নেতৃত্ব দেন। অনেক শ্রমিক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন, পুলিশের অত্যাচার চরমে উঠে, কোন্নগর বাজারের কাছে সার্জেন্টের রিভলবারের গুলিও চলে।

এই সময়েই তিনি শ্রীদুর্গার শ্রমিকদের নিয়ে কমিউনিষ্ট পার্টির এক গ্রুপও তৈয়ারী করেন।

১৯৪৭ সালেই কোন্নগরের বাজারের নিকট শ্রীদুর্গা শ্রমিকদের আন্দোলনের সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত থাকেন চট্টোগ্রাম অস্ত্রগার দখলের প্রখ্যাত নেতা গণেশ ঘোষ ও সুহাসিনী গাঙ্গুলী এবং হুগলী জেলার গিরিজা মুখার্জী প্রভৃতি।

অবশেষে সেই সময়ের বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সম্পাদক মহম্মদ আমিনের উপস্থিতিতে মালিকের সঙ্গে এক চুক্তি হয়।

এরপর ১৯৪৮ সালে কমিউনিষ্ট পাটির কোলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে পি সি জোশীর পরিবর্তে বি টি রণদিভে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হলে পার্টি এবং সংগ্রামী কর্ম কৌশল গ্রহণ করে। সেই

সময়ে ডাঃ বিধান রায় পার্টিকে বে আইনী ঘোষণা করেন। এবং মার্চ মাসে মনোরঞ্জন হাজরাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই কালে মনোরঞ্জন হাজরা এবং তারক দাস চ্যাটার্জীর নেতৃত্বে কোন্নগরে কমিউনিষ্ট পাটির ইউনিয়ন গঠিত হয়।

পরে জেল থেকে মুক্ত হবার পর ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনে মনোরঞ্জন হাজরা কমিউ নিষ্ট পার্টির সমর্থিত প্রার্থী হয়ে উত্তরপাড়া বিধান সভা আসন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং কংগ্রেস প্রার্থী অমর নাথ মুখার্জীকে ছয় সহস্রাধিক ভোটে পরাজিত করেন। আর শ্রীরামপুর লোকসভা আসনে তুষার চ্যাটার্জী জয়ী হন। এই ভাবে উত্তরপাড়া বিধান সভা এলাকায় রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রগতিশীল শক্তির দিকে দীর্ঘ সময় ধরে ঝুকে পড়ে।

এই নির্বাচনের পর ১৯৬৪ সালে কোন্নগর পুর সভা নির্বাচনে প্রগতিশীল শক্তি তথা কমিউনিস্ট জোট জয়ী হয় এবং বার বার ১৯৯৫ সাল পযন্ত সেই 'জয়' বজায় থাকে।

১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের পরবর্তী কালে ইনি বার বার নির্বাচিত হন এবং এক সময়ে আরামবাগ লোকসভা আসনটিও লাভ করেন। তিনি বিধায়ক ও সাংসদ হিসাবে সফলতার সঙ্গে কাজ করেন এবং জনজীবনের প্রগতিশীল শক্তির সহায়তায় নানা উন্নয়নমূলক ও সাংস্কৃতিক কাজে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অবলম্বন করেন।

এরপর তার সাহিত্য সৃষ্টির কথায় আসা যাক। তিনি একজন সুলেখক ছিলেন। তার লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে—পলিমাটির ফসল, নোঙর হীন নৌকা। মহানগরের দাবানল, ক্রাইপার রোডে ঝড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন।

তিনি একাধারে সংগঠক ও সুবক্তা ছিলেন। জীবনের শেষের কিছুকাল প্রায় এক দশক তিনি সি পি এম পার্টির পথ থেকে ভিন্ন পথে বিচরণ করেছিলেন। যে কারণে অনেকের কাছে তা ছিল বেদনাদায়ক।

অবশেষে ২০০১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তাঁর কর্মবহুল জীবনের সমাপ্তি হয়।

লেখক—বিষ্ণু দত্ত

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৯১৪

দেহাবসান ঃ ১৫. ৫. ১৯৯০

তারকদাস চট্টোপাধ্যায় ১৯৩০ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায উত্তীর্ণ হন। তাঁর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন পঞ্চানন বসু মল্লিক, সাহিত্যিক নীহার রঞ্জন গুপ্ত প্রমুখ।

প্রথম জীবনে তিনি কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন এবং সেই সময়ে বয়েজ স্কাউটের সংগঠক রূপে খ্যাতিলাভ করেন। স্কাউটের সংগঠক রূপে ছাত্রদের নিয়ে নানা জায়গায় ক্যাম্প করার ফলে ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রূপে পরিচিত হন।

এরপরে কাশীপুরে গ্যান এণ্ড শেল ফ্যাক্টারিতে মিলিটারী এ্যাকাউন্টস বিভাগে কাজে যোগদান করেন। পরবর্তীকালে সিন্ধ্রি ফারটিলাইজার লিমিটেডে বি, বি, জে'র পক্ষে এ্যাকাউন্টস অফিসার ছিলেন। চাকরি ছেড়ে তিনি নিজের জমিতে চাষবাসের সংগে প্রাইভেট টিউশনি শুরু করেন।

১৯৫৮ সালের ২৮ নভেম্বর কোন্নগর পুরসভার পুর প্রধান থাকাকালীন চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চীফ্ এগ্‌জিকিউটিভ অফিসারের কার্যভার গ্রহণ করার ফলে তিনি কোন্নগর পুরসভার পুর প্রধানের পদে ইস্তফা দেন।

তিনি সংস্কৃতিমনস্ক ও সংগঠন প্রিয় মানুষ ছিলেন। 'শক্তি কুটির', শক্তিসংঙ্ঘ, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, খেলাঘর (নাট্যসংস্থা), প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যুক্ত ছিলেন এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেই গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শক্তি সঙ্ঘে থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন, আবার ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে যখন সম্পাদক ছিলেন, সেই সময়ে তাঁরই চেষ্টায় হকি খেলা চালু হয়েছিল।

বিদ্যাচর্চায় তাঁর নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল প্রগাঢ়। এক সময়ে প্রবন্ধ রচনা করে পুরস্কার স্বরূপ বার্ট্যাণ্ড রাসেল-এর ইংরেজি পুস্তক লাভ করেন।

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়-এর রাজনীতি জীবনের সূত্রপাত হয় অরুণ বসুর প্রভাবে। অরুণ বসু ছিলেন হুগলি জেলার বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট নেতা অজিত বসুর ভাই। সেই সূত্রেই তারকদাস চট্টোপাধ্যায় কমিউনিজমে দীক্ষা লাভ করেন এবং ১৯৪৭-৪৮ সালে মনোরঞ্জন হাজরার সহযোগিতায় কোন্নগরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৯ সালে বে-আইনী কমিউনিস্ট পার্টির একজন নেতা হিসাবে অনেকের সাথে বিচারাধীন হোয়ে হুগলি জেলে বন্দি ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে সারা রাজ্যের বন্দি শালায় বন্দিরা অনশন শুরু করলে তিনিও অনশনে যোগ দেন। মুক্তি লাভের পর আরো বেশি উৎসাহ ও উদ্যমে এই অঞ্চলে শক্তিশালী ইউনিট গঠনে প্রবৃত্ত হন। ১৯৫০-৫১ সালে নোতুন পথ গ্রহণ করে এবং প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হয়। এরই প্রেক্ষিতে কোন্নগরের পশ্চিমে এবং কোন্নগরে নির্বাচনী সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি উদ্যোগী হয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনেকের সাথে যোগদান করেন। শক্তিশালী সংগঠন গড়ে ওঠার ফলে সেই সময়ে বিধান সভা ও লোকসভা নির্বাচনে দুই আসনেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করে।

১৯৫৪ সালে কোন্নগর পুরসভার নির্বাচন প্রাক্কালে প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি গঠিত হয় এবং পুরনির্বাচনে ১২টি আসনের মধ্যে ৭টিতে সমিতির প্রার্থীরা জয়ী হন। প্রথম বোর্ড সভায় তারকদাস চট্টোপাধ্যয় পুর প্রধান নির্বাচিত হন এবং পশ্চিম বঙ্গে তিনিই প্রথম কমিউনিস্ট পুর প্রধান।

তারকদাস চট্টোপাধ্যায় পুর প্রধান থাকাকালীন পুরসভার প্রশাসন ব্যবস্থার ও আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়। পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃক রচিত ৭,৩৮.০০০ টাকার জলকল প্রকল্প রূপায়ন, মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পুরকর্মচারীদের জন্য সংশোধিত বেতন কাঠামো নির্মাণ, বিল্ডিং প্ল্যান আইন প্রভৃতি কার্যসূচি গ্রহণ করা হয়। এরই সঙ্গে পুরসভাগুলিকে সরকারী অনুদান বৃদ্ধির জন্য ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মাধ্যমে দাবী উত্থাপন তাঁরই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। এই সব উল্লেখযোগ্য ভূমিকার ফলশ্রুতি ১৯৫৮ সালের পুর

নির্বাচনে নাগরিক সমিতির প্রার্থীদের অধিক সংখ্যক আসন লাভ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনৈতিক আদর্শগত চিন্তাধারায় তারকদাস চট্টোপাধ্যায় কমিউনিস্ট ভাবধারায় অনেক যুবককে উদ্বুদ্ধ করতে পারায় অনেকে মার্কসবাদী রাজনীতিতে অনুরাগী হয়েছিল। তিনি ১৯৬২ সালের শেষদিকে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, পরে আবার কংগ্রেসের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

খেলা ধূলার প্রতি তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। কলকাতার বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীর কাছে তিনি কিছুদিন সংগীত শিক্ষাও করেছিলেন। চারের দশকে নববর্ষ উৎসবকে উৎসাহ দানের অঙ্গ হিসাবে শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

শিশু ভারতী প্রতিষ্ঠা ও তার অগ্রগতিতে এবং কানাইপুর হাইস্কুল প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কানাইপুর হাই স্কুলে তিনি একসময়ে শিক্ষকতাও করেন।

সংগঠক রূপে তাঁর খ্যাতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও প্রসারিত হয়েছিল। খেলাধূলা, সংস্কৃতি চর্চা, নাট্যাভিনয়, আবৃত্তি, সংগীত চর্চা, প্রবন্ধ রচনা, হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ ও জনসেবা প্রভৃতিতে ছিল তাঁর অনুরাগ। আবার জীবিকা নির্বাহের জন্য চাষবাসে নিজেকে নিযুক্ত রাখতেন, অন্যদিকে গৃহ শিক্ষক রূপে অত্যন্ত দরদী মনোভাবাপন্ন হয়ে ছাত্রদের শিক্ষাদান করতেন।

তারকদাস চট্টোপাধ্যায়-এর এই বৈচিত্র্যময় জীবন, প্রতিটি কাজে নিষ্ঠা ও নিপুণতা এক অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৯১৫

দেহাবসান ঃ ১৭. ৭. ২০০০

প্রভাত মুখোপাধ্যায়-এর জন্ম ১৯১৫ সালে, রাজস্থানের জয়পুরে। পিতা পার্বতী চরণ এবং মাতা মাধুরী দেবী। প্রভাত বাবু হিন্দু কলেজ থেকে বি. এস. সি পরীক্ষায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এস. সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

১৯৪২ সাল। যে সময় 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করলে বিদেশী শাসকের শাসনে কঠিন কঠোর শাস্তি পেতে হতো। ঠিক সেই সময়ে ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে 'বন্দেমাতারম' গান বেজে ওঠায় রাজদ্রোহিতার কড়া হুমকি সহ গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে হাজির হন বড় কর্তা সেন সাহেব, আসেন পুলিশের বড় কর্তা এরিক রবার্টসন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লোয়ালিন। ওপরওয়ালার নির্দেশ মতো প্রভাত বাবু চাকরি থেকে বরখাস্ত হন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাত বাবু ন'দিন অনশন পালন করেন। কিন্তু ফ্রিলড্রেন সাহেবের আন্তরিকতায় প্রভাত বাবু সে যাত্রায় বরখাস্ত হওয়ার হাত থেকে রেহাই পান এবং প্রভাত বাবুকে ঢাকা থেকে কলকাতায় বদলি করা হয়। সংগে ১০ ঘা বেত্রাঘাতের নির্দেশ থাকে।

ল্যাওলেন ফিল্ড্রেনের প্রেরণা ও তাঁর সময়ানুবর্তিতায় মুগ্ধ হয়ে প্রভাতবাবু ১৯৩৮ সালে আকাশবাণীতে যোগদান করেন এবং ১৯৫১ সাল পর্যন্ত তিনি আকাশবাণীর কাশ্মীর, ঢাকা, উড়িষ্যা ও অসমীয়া বেতার বিভাগে অধিকর্তা হয়েছিলেন। তাঁর কর্মজীবনের অন্যতম কীর্তি শান্তিনিকেতনে আকাশবাণীর ষ্টুডিও প্রতিষ্ঠা।

প্রভাতবাবুর সাহিত্যের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তাঁর রচিত প্রথম বই 'অভিনেতা' ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া ক্রন্দসী কাশ্মীর, অমরনাথ

তীর্থ যাত্রা, শিরডির সাঁইবাবা প্রভৃতি ১৬ খানি বই রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নন্দিতা' ১৯৪১ সালে প্রকাশিত হয়। আরো জানা যায় 'রিডার ডাইজেস্ট' ইংরাজী পত্রিকায় একশো চুরাশিটি ছদ্মনামে বিশ্বের ভিন্ন দেশের ৫৩৮টি অপরাধ মূলক সত্যি ঘটনার বর্ণনা লিখে বিশ্বের রেকর্ড করেছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ আছে 'লিম্‌কা বুক অফ্‌ রেকর্ডের ১৯৯৪ সালের সংস্করণে। এছাড়া ইংরাজী ও বাংলা ভাষার অনেক লেখা লিখেছেন এবং কিছু ইংরাজী বইয়ের অনুবাদও করেছেন।

চলচ্চিত্র শিল্পের জন্য তাঁর প্রাণ ছিল নিবেদিত। চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নতি সাধনের ক্ষেত্রে একজন খ্যাতনাম পরিচালকের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে আমরণ অনশনের অঙ্গীকার নিয়ে ন'দিন অনশন করেন।

তাঁর প্রথম ছবি 'মা' ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবি 'বিচারক'। এ ছাড়াও বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া, হিন্দী এবং কাশ্মীরি ভাষায় সতেরোখানি সিনেমা পরিচালনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবিগুলো 'পবেরণ', বাংলা 'বিচারক', কাশ্মীরি ছবি শায়ার-এ কাশ্মীর মেহজুর, ওড়িয়া ছবি ত্যাগপত্র। তাঁর শেষ তথ্য চিত্র হলো এভারেস্টের উচ্চতা নিরুপনকারী রাধানাথ শিকদারকে নিয়ে । পরে কলকাতা ছেড়ে মুম্বাই গিয়ে কাশ্মীরের প্রেক্ষাপটে মল্লিকা সারাভাইকে নিয়ে একটি হিন্দি ছবি করেছিলেন।

সমাজ সেবার ক্ষেত্রেও তাঁর দান উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর মেহরৌলি গ্রামে গরিবদের জন্য পাঁচ বেডের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করেছেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়কে কিছু টাকা দান করেছেন এবং শিবচন্দ্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীর কৃতি ছাত্রকে পুরস্কার প্রদানের জন্য আর্থিক সাহায্য করেছেন। গরিবদের বিনা খরচায় চিকিৎসার জন্য কোন্নগর মাতৃসদনে একটি শয্যার ব্যবস্থা করেছেন।

তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী অরুন্ধতী দেবীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে এবং তাঁর একমাত্র কন্যার মৃত্যু হয় ১৯৯৩ সালে। তাঁর পুত্র বাঙ্গালোরে বসবাস করেন, তাঁর সংগে প্রভাত বাবুর কোন যোগাযোগ নেই।

জীবনের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। তখন তাঁর কাজ ছিল সাঁইবাবার সাধনা বই পড়া এবং গবেষণা ধর্মী রচনা লেখা। এরই সূত্রে হীরালাল সেন ভারতীয় সিনেমার যথার্থ পথিকৃত, বিষয়টিকে প্রমাণ করতে অনেক গবেষণা করে একখানি বইও লেখেন।

১৭ জুলাই ২০০০, কোন্নগরে তাঁর ভাইয়ের বাসভবনে প্রভাত মুখোপাধ্যায় শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

(সূত্র—শ্রীরামপুর সমাচার,

আজকাল ১৮/৭/২০০)

সুহাসিনী সেন

জন্ম ঃ ১৯১৬

দেহাবসান ঃ ১৯৯৭

১৯১৬ সালের নভেম্বর মাসে বর্তমান বাংলা দেশের বরিশাল জেলার বাউকাটি গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে সুহাসিনী সেন জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের আর্থিক অনটনের মধ্যেও অনেক সংগ্রাম করে ১৯৩৬ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ১৯৪২ সালে প্রাইভেটে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় বিশিষ্ট নেত্রী মনিকুন্তলা সেনের সহিত পরিচয়ের ফলে মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। পরবর্তীকালে হুগলী জেলায় বসবাসের সময় সুশীতল রায় চৌধুরীর (হুগলী জেলার সি, পি, আই সম্পাদক) স্ত্রী শ্রীঅমিয়া রায় চৌধুরীর সহিত পরিচয় হয়। সেই সূত্রে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্যা হন। তিনি বিভিন্ন শহরের বিদ্যালয়ে চাকরী পান কিন্তু রাজনৈতিক কারণে কোন বিদ্যালয়েই স্থিত হতে পারেন নি। অবশেষে ১৯৫১ সালে কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে চাকরী পান এবং এখানেই ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘকাল সুনামের সাথে শিক্ষকতা করার পর অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি কোন্নগরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সংগঠিত করেন ও তার সভানেত্রী হন। সেই সমিতির নেতৃত্বে কোন্নগরে মহিলারা সংগঠিত হয়ে নানা গঠনমূলক কাজে ব্রতী হন। এছাড়া সেই সময়ে শিক্ষক আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং এ, বি, টি এর ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা নির্বাচিত হন।

১৯৯১ সালে জাতীয় শিক্ষক হিসাবে তিনি রাষ্টীয় পুরস্কারে ভূষিতা হন। পুরস্কারের অর্থ তিনি বিভিন্ন জন কল্যাণ মূলক কাজে দান করেন।

অবশেষে ১৯৯৭ সালে বারাসাতের নিজ ভাইয়ের বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কোন্নগরের মানুষ শিক্ষিকা ও সমাজ কল্যাণে ব্রতী এক নারী হিসাবে সুহাসিনী সেনকে স্মরণে রাখবে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

অধ্যাপক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৮. ৩. ১৯১৮

দেহাবসান ঃ ২২. ৭. ১৯৮৭

অধুনা বাংলা দেশের ফরিদপুর জেলার দেওড়া গ্রামে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অধ্যাপক মনোমোহন চট্টোপাধ্যায় আজীবন অধ্যাপনা করেন। মাতা মনোরমা দেবীর শঙ্খলাপরায়নতাপূর্ণ জীবন পুত্র কন্যাদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল।

বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়-এর শিক্ষা জীবন শুরু হয়েছিল চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল বিদ্যালয়ে, এখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করার পর উত্তরপাড়া সরকারী স্কুলে সপ্তম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ১৯৩৩ সালে ৪টি বিষয়ে লেটার সহ উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে সেন্টজেভিয়ার্স কলেজ থেকে গণিতে অনার্স সহ পরীক্ষায় পাশ করেন এবং ছাত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশুদ্ধ গণিত পরীক্ষায় সকল পত্রে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং ফলিত গণিতেও সর্বোচ্চ নম্বর পাওয়ার জন্য দেবেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশুদ্ধ গণিতে রিসার্চ স্কলার হন। এবং ১৯৮০ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তখন তিনি বিদ্বৎ সমাজে খ্যাতির শীর্ষে অধিষ্ঠিত। এই সময়ে তিনি অর্থশাস্ত্রের উপর অনেক মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন, যেমন Abstruct Algebra, Linear Algebra ও Toplogyর ইত্যাদি বিষয়ে।

শিক্ষার প্রসার ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদ্যালয় ও কলেজ স্থাপনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে। ১৯৪৮-৪৯ সালে কোন্নগর উচ্চ

ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন। এবং এর পরেই শিক্ষা প্রসারে স্থানীয়ভাবে ও অন্যান্য অনুন্নত অঞ্চলে নিজেকে উৎসর্গ করেন। কোন্নগরে যে সমস্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলি হোল (১) কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় (১৯৫০) (২) কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ বালিকা শিক্ষা সদন (উচ্চ বিদ্যালয়, ১৯৬৩) (৩) অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ (দশম শ্রেণী) (৪) কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ বালিকা শিক্ষা সদন—নিম্ন বুনিয়াদী (১-৫ শ্রেণী, ১৯৬২), (৫) কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ শিক্ষা সদন— নিম্ন বুনিয়াদী (৬-৮ শ্রেণী, ১৯৬১)। শিক্ষাসদন কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয় (গোপাল বসু সরণি) ইত্যাদি।

১৯৫২-৫৩ সালে তাঁরই উদ্যোগে কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ স্থাপিত হয় ও ১৯৫৬তে তা রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। এরাই প্রথমিক বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠা করে।

নিম্নলিখিত বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠায় তিনি সহযোগিতা করেন—

১।। ক্যানিং-এ বঙ্কিম সর্দার কলেজ

২।। বগুলা কলেজ (নদীয়া)

৩।। কমলা হাই স্কুল (কলকাতা)

কোন্নগরে শিক্ষা প্রসারে ও বিদ্যালয় স্থাপনে তাঁকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন ড. মাখন লাল রায় চৌধুরী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐস্লামিক চেয়ার হোল্ডার), ড. অমল চৌধুরী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), বিজয় নন্দী, শৈলেন্দ্র চক্রবর্তী, ড. হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় (পরবর্তীকালে সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের অধ্যক্ষ), ভ্রাতা গোপাল চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী প্রমুখ। তিনি এক সময়ে All Bengal School Association-র সভাপতি ছিলেন।

১৯৪৩ সালে মন্বন্তরের সময়ে তিনি রিলিফের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

১৯৭৯-৮০ সালে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলকাতায় চলে যান এবং ভবলিউ, সি বোনারর্জি স্ট্রিটে ভাড়া বাড়িতে বসবাস শুরু করেন এবং পরবর্তী কালে তিনি এই বাড়ি কিনে নেন।

১৯৮৭ সালে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ৪ পুত্র, এক কন্যা এবং স্ত্রীকে রেখে যান।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

তারাপদ ভট্টাচার্য

জন্ম ঃ ১৩২৬ বঙ্গাব্দ (অনুঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ)

দেহবসান ঃ ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ (অনুঃ ১৯৯০)

আষাঢ় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (আনুমানিক ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ) তাঁর জন্ম। তিন বছর বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর শিবপুরে মাতুলালয়ে পালিত হন।

খুব কষ্টের মধ্যে তাঁকে লেখাপড়া চালাতে হয়। অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি লেখাপড়ার পথ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। সেই সময় এক জাপানী আমদানী সংস্থায় জাহাজের মাল বোঝাই ও খালাসের পরিদর্শকের কাজে যোগদান করেন। পরে ১৯৪৬/৪৭ সালে ঐ জাপানী সংস্থাটি বন্ধ হয়ে যায়।

ঐ সংস্থা থেকে আনুমানিক যে চারশত টাকা লাভ করেন তাই দিয়ে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসা আরম্ভ করেন। বহু পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দ্বারা নিজ নামে টি, পি, ভট্টাচার্য এণ্ড কোং-র নামে কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে ও যথারীতি সংস্থা প্রতিষ্ঠা ও তাকে নথীভুক্ত করে পুরোপুরি ব্যবসা শুরু করেন। পরবর্তীকালে কঠোর পরিশ্রম অধ্যবসায় ও সততার দ্বারা ব্যবসায়ে সাফল্য লাভ করেন। তাঁর মিতব্যয়িতা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও মাতৃভক্তি ছিল উদাহরণ স্বরূপ ও জীবন সাফল্যের সোপান।

পরবর্তীকালে কোন্নগরের বসতবাটি মেজ ভাইকে প্রদান করে ৪৭নং সি, এস, মুখার্জী স্ট্রীটে জমি সংলগ্ন পুরাতন বাড়ি ক্রয় করে মাকে সঙ্গে রেখে সাংসারিক জীবন যাপন করতে শুরু করেন।

দীর্ঘদিন নিরলস কর্মজীবন যাপনের পর শারীরিক কারণে এবং সাবালক পুত্রদের অনুরোধে ব্যবসা থেকে অবসর নেন।

তিনি আজীবন বহুলোককে নানাভাবে সাহায্য ও সহায়তা করেছেন। কোন্নগরের নাগরিক জীবনও তাঁর সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়নি। মাতৃসদনের

উন্নয়ন তহবিলে, হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ তহবিলে, এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে অকৃপণ ভাবে দান করেছেন। বিশালক্ষ্মী সড়কস্থ (সি, এস, মুখার্জী স্ট্রীট) সর্বমঙ্গলা শিশুউদ্যানের জমি ও জমি সংলগ্ন গৃহাদি তাঁরই সক্রিয় আনুকূল্যে ও উদ্যোগে পুরসভা লাভ করে।

তিনি দেড় লক্ষ টাকার চারু-দুর্গা ট্রাষ্ট ফাণ্ড গঠন করেন, যার বার্ষিক সুদ থেকে নানা প্রতিষ্ঠান আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে।

সূত্র ঃ শ্রীরাখহরি ভট্টাচার্য কৃত প্রতিবেদন

ও শ্রী গোবিন্দ চ্যাটার্জীর সংযোজন

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সমর কুমার মিত্র

জন্ম ঃ ১০. ৯.১৯২২

দেহাবসান ঃ ২০. ১২. ১৯৮৭

সমর কুমার মিত্র একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। অবশ্য বিশিষ্ট সমাজসেবী হিসাবেই তাঁর বেশি পরিচয় ছিল। তাঁর পিতৃব্য নিবারণ চন্দ্র মিত্র সেই সময়কার একজন খ্যাতিমান কংগ্রেস নেতা ছিলেন এবং গোপন বিপ্লবী আন্দোলনের সংগে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবন ছিল দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত। পিতৃব্য নিবারণ চন্দ্রের এই প্রভাব সমর কুমারের উপর পড়েছিল এবং সেই সূত্রেই খ্যাতকীর্তি অজিত বসুর সংগে গোপনে সম্পর্ক রেখে চলতেন ও বন্দীমুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করতেন।

১৯৪৭-৪৮ সালে কোন্নগর শ্রী দুর্গা কটন মিলে যখন শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় তখন তিনি নানাভাবে সেই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সহায়তা করেন। উল্লেখ্য, ঐ আন্দোলন চলাকালে কোন্নগর বাজারের কাছে প্রথম গুলি চলে, যদিও এই গুলিতে কেউই আহত.হয়নি। এই ধর্মঘটী শ্রমিকদের সমর্থনে কোন্নগর বাজারে মেডিক্যাল হল-এর (অধুনা লুপ্ত) সামনে যে সভা হয়, সেই সভায় চট্টগ্রামখ্যাত গণেশ ঘোষ প্রধান বক্তা ছিলেন এবং সভার শেষে তিনি সমর বাবুর বাড়িতে বিশ্রাম নেন।

১৯৪৮ সালে বিধান চন্দ্র রায় যখন প্রধান মন্ত্রী (রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী তখন ঐ ভাবেই পরিচিত হতেন), তাঁর আদেশে ২৬ মার্চ পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিষ্ট পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হলে সমর কুমার মিত্র গ্রেপ্তার হন এবং সিকিউরিটি প্রিজনার হিসাবে হুগলি জেলে থাকেন। মুক্তিলাভের পর কিছুদিনের মধ্যে ১৯৫০ সালের পুর সভার নির্বাচনে ৪ জনের দলের অন্যতম প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি তাঁর ২ নং ওয়ার্ডে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়ে জয়ী হন এবং তিনিই ছিলেন সেই সময়ে সব চেয়ে কনিষ্ঠ পুরসদস্য। পুর সদস্য

হিসাবে তিনি বি, এম, এ্যাক্ট (১৯৩২) এ পারদর্শী হন এবং জনপ্রিয় ও কর্মঠ কর্মী সদস্য রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

এর পর ১৯৫৪ সালের পুর নির্বাচনে কোন্নগরে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য, সহযোগী এবং বন্ধুরা প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি গঠন করে নির্বাচনে অবতীর্ণ হন এবং সমর কুমার মিত্র ছিলেন অন্যতম প্রার্থী। ২ নং ওয়ার্ড়ে ৬ টি আসনেই প্রগতিশীল নাগরিক সমিতির প্রার্থীরা জয়ী হন। অন্যদিকে ১নং ওয়ার্ডে নাগরিক সমিতির প্রার্থী অমিতাভ মুখোপাধ্যায় জয়লাভ করেন।

এর কিছুদিন পূর্বে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য হন, কিন্তু ১৯৫৮ সাল নাগাদ তিনি পার্টির সাথে সকল সম্পর্ক ছেদ করে কংগ্রেসে যোগ দেন।

তিনি মোট ১৪ বছর পুর সভার সদস্য হিসাবে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। কংগ্রেসের অন্যতম নেতা হিসাবে পুরসভায় নিজের যোগ্যতা প্রমান করেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ধ্রুবনাথ মিত্র

জন্ম ঃ ১৯২৩

দেহাবসান ঃ ১৮ আগষ্ট ১৯৯৬

ধ্রুবনাথ মিত্র কোন্নগরের মিত্র পরিবারের ১৯২৩ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা প্রয়াত পরেশ নাথ মিত্র, এবং মাতা স্বর্গতা মৃণালিনী দেবী। ধ্রুবনাথ মিত্র ১৩ বছর বয়সে পিতৃহারা হন। লেখা পড়া শেষ করে খুব অল্প বয়সে তিনি কোন্নগর পৌর সভায় আমীরের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কর্ম্মদক্ষতায় ও নিষ্ঠায় পৌর সভায় বিভিন্ন বিভাগে কাজে মনোনিবেশ করেন। তাঁর এই গুণে পৌর সভার কর্মচারীরা তাঁকে 'ছোটবাবু' নামে ডাকতেন। তিনি তাঁর অকৃত্রিম কর্মনিষ্ঠায় ও ভালোবাসায় পৌর সভায় সকল শ্রেণীর কর্মীর মন জয় করতে পেরেছিলেন। এই পৌরসভার কর্মজীবনে তিনি প্রয়াত নৃসিংহ দাস বসু, প্রয়াত ননীগোপাল বসু, ও প্রয়াত তারক দাস চট্টোপাধ্যায়-এর সান্নিধ্যে আসেন ও তাঁদের নির্দেশে ও পরামর্শে কাজ করার সুযোগ পান। তারকদাস বাবু ধ্রুবনাথের কাজের নিষ্ঠা, যোগ্যতা ও একাগ্রতায মুগ্ধ হয়ে তাঁকে পৌরসভার নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করতেন এবং তাঁর কর্মধারায় অভিভূত হতেন। তারকদাস চট্টোপাধ্যায়-এর অনুপ্রেরণায় তিনি বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট পড়ে একেবারে মুখস্থ করে ফেলেছিলেন। পরবর্তী কালে পৌরপতিদের মিউনিসিপ্যাল আইন কানুনে বিশেষভাবে সাহায্য করে সহযোগিতা করতেন। শুধু তাই নয়, কোন্নগরের অসংখ্য মানুষ পৌরসভা সংক্রান্ত নানা বিষয়ে তাঁর কাছে আসতেন ও প্রয়োজনীয় সুপরামর্শ গ্রহণ করতেন।

ধ্রুবনাথ মিত্র কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের সংগে দীর্ঘদিন যুক্ত ছিলেন। ব্যাঙ্কের সর্বাঙ্গীন উন্নতি কিভাবে করা যায় এবিষয়ে তাঁর সজাগ দৃষ্টি থাকত। পরবর্তী কালে কোন্নগর পৌরসভার কাউন্সিলার নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি কোন্নগরের একাধিক সংস্থার সংগে যুক্ত ছিলেন। তিনি একদিকে

সাংস্কৃতি চর্চার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহী ও উৎসাহী ছিলেন। খেলাধূলা চর্চার সংস্থাব সংগে যোগাযোগ রাখতেন, সর্বোপরি নাট্য চর্চা ও অভিনয়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। একাধিক নাটকে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করে তিনি সুনাম অর্জন করেছিলেন। কোন্নগর তথা হুগলি জেলার মধ্যে প্রাচীন নাট্য সংস্থা ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নকে পুনরুজ্জীবিত করতে তাঁর প্রচেষ্টা ও প্রয়াস এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি কোন্নগর অলিম্পিক ক্লাব, নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সভা, শিল্পায়ন ক্লাব প্রভৃতি সংস্থার সংগে জড়িত ছিলেন।

১৯৯৬-র ১৮ আগষ্ট তাঁর দেহাবসান হয়।

তথ্য ঃ শ্রীগোপীনাথ মিত্র

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ড. হেরম্ব চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ

দেহাবসান ঃ

দেশ বিভাগের পরে পূর্ব বঙ্গ থেকে যাঁরা কোন্নগরে বসবাস করতে আসেন, তাঁদের মধ্যে হেরম্ব চট্টোপাধ্যায় পরবর্তী কালে একজন নামী বিদ্বান রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ও পালি, এই দুই বিষয়ে এম. এ ছিলেন এবং এই দুই বিষয়েরই অধ্যাপক ছিলেন। পরে পি. আর. এস ও পি. এইচ. ডি. হন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত কলেজ উভয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি সবচেয়ে সম্মানের আসনে সম্মানিত হয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে 'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেয়ার', ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ লাভ।

ভিজিটিং অধ্যাপক রূপে কিছুদিন লণ্ডনে ছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত রসিকতার জন্য সকলে তাঁকে ভালবাসতেন। তাঁর স্ত্রী চিন্ময়ী চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপিকা ছিলেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

(ড. চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম ও মৃত্যুর সময় সংগ্রহ করা যায় নি।
—সম্পাদক মণ্ডলী)

রতনলাল পচিসিয়া

জন্ম ঃ ১৯২৭

দেহাবসান ঃ ১৯৯৮

রাজস্থান এমন এক স্থান যেখানে মানুষকে অবিরত জীবনের অনুকূলে সংগ্রাম করতে হয়, এবং এই সংগ্রামের জন্যই অনেকে অন্য স্থানে যায়। রতনলাল পচিসিয়া এমনই একজন ভাগ্য অন্বেষণকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাজস্থানের শ্রী গঙ্গানগর জেলায় ১৯২৭ এ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা জন্মস্থানেই। তাঁর বিবাহ হয়১৯৬৪ সালে এবং তার পরেই কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এদিক ওদিক চাকরি করলেও শিঘ্রই বিয়ারিং-এর ব্যবসা আরম্ভকরেন, যদিও তাঁর ঝোঁক ছিল প্লাসটিক সামগ্রী নির্মাণে। ১৯৪৯ সালে কোন্নগরে তিনি 'রতন প্লাসটিক' নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন কয়েকটি হাত মেসিন নিয়ে। আগের বছরে অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে উক্ত 'দেবভিলা' নামক বড় বাড়িটি ক্রয় করেন। স্থানটি কোন্নগর ফাঁড়ির সন্নিকটে জি, টি রোড ও গঙ্গার মধ্যবর্তী স্থানে। পরে বর্ধিত কলেবরে অটোম্যাটিক মেসিন স্থাপন করে সোপকেস, মগ, জগ, চিরুনি এবং অন্যান্য গৃহস্থালির সামগ্রী নির্মাণ করতে থাকেন। কিছু কর্মী এই সুবাদে নিয়োজিত হয়। রতন লাল ছিলেন খুব বিচক্ষণ এবং স্থির সিদ্ধান্তের মানুষ ছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল ব্যাপক। তিনি সামাজিক ভাবে বেশ পরিচিতি পেয়েছিলেন, আত্মীয় বন্ধুদের মধ্যেও ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। বিড়লা, টাপুরিয়া অন্যান্য শিল্পপতিদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক থাকার দরুন তিনি কোন্নগরে দ্বাদশ মন্দির ও ঘাট সংস্কারের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নিতে সমর্থ হন। কোন্নগরের ক্রাইপার রোডস্থ চণ্ডীতলা মন্দিরও সংস্কার করা হয়। তিনি কলকাতা এবং রাজস্থানের কয়েটি সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ট্রাষ্টি—মেমবার ছিলেন। সঙ্গে আরো যাঁরা বড় শিল্পপতি ছিলেন তাঁরাও রতনলালের পরামর্শ শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করতেন। তিনি তাঁর পরিবার পরিজনদের বলতেন, সাহায্য

প্রার্থীদের যথা সম্ভব সাহায্য করতে এবং কারো অনিষ্ট না করতে। স্থানীয় মানুষেরা এখনো তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। অত্যন্ত সাদাসিধে মানুষ ছিলেন, পরণে ধুতি পাঞ্জাবী এবং পরিস্কার জুতো ব্যবহার করতেন, একথা অনেকেরই স্মরণে আছে।

রতনলাল পচিসিয়া ১৯৯৮ সালের ৪ জানুযারি প্রয়াত হন। তাঁর পরিবারের মানুষেরা তাঁর অনুপ্রেরণায় ও সামাজিক বোধের পরিচয়ে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সংঙ্গে যুক্ত আছেন।

লেখক ঃ সন্তোষ পচিসিয়া

হরিদাস চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ঃ ১৭. ১১. ১৯০৬

দেহাবসান ঃ ৩০. ১০. ১৯৯৪

অনেকেরই মনে থাকবার কথা যে অধুনা বাংলা দেশের বরিশাল জেলার সাজাই গ্রামের তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায়-এর চতুর্থ পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিগত শতকের শেষার্ধে কোন্নগরে সাংস্কৃতিক জগতের একজন পুরোধা ছিলেন।

তারিণীচরণ আট বছর বয়সে স্বগ্রাম ত্যাগ করে কালীঘাট মন্দির চত্বরে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং পূজা ও পুরোহিতের কাজকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে নিদারুণ পারিবারিক বিপর্যয়ে সংসার বিবাগী হয়ে পড়েন।

ইতিমধ্যে হরিদাস এনট্রান্স পাশ করে হোমিওপ্যাথিতে DHMS করেছেন। তিনি প্র্যাকটিস শুরু করে সংসারের হাল ধরেন, এবং একটি জার্মান ফার্মে চাকরী গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার পর জার্মান ফার্ম ব্যবসা বন্ধ করে দেয়। তখন হরিদাস ঐ ব্যবসার হাল ধরেন এবং রাধাবাজার অঞ্চলে ঘর ভাড়া নিয়ে অন্যান্য আমদানী-রপ্তানির ব্যবসাও শুরু করে দেন। ভাগ্যের পরিবর্তন হয়।

১৯৪৮ সালে নিজস্ব গৃহ নির্মাণ করে কোন্নগরে চলে আসেন। হরিদাস নানা রকম সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। কোন্নগর মনসাতলা ব্যায়াম মন্দিরের তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। এখানে তিনি একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন ও একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মিলন সঙ্ঘেরও তিনি সভাপতি ছিলেন।

তাঁর পরোপকারী মানসিকতাই তাঁকে সমাজ জীবনের আলোকে নিয়ে আসে। কলকাতায় বাসকালে ১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় তিনি নিজ

এলাকায় লঙরখানা পরিচালনা করেন। '৪৬-৪৭ এর দাঙ্গার সময়ে তিনি অনেক পরিবারকে আশ্রয় লাভে সাহায্য করেছেন। কোন ছাত্র পড়াশোনার জন্য তাঁর কাছে অর্থ সাহায্য চেয়ে বিমুখ হয়নি। এবিষয়ে তিনি নীরবতাই চেয়েছিলেন।

বহু গ্রন্থ পাঠ করে এবং পৃথিবীর অনেক দেশ পরিভ্রমণ জনিত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে তিনি কালাতিপাত করেন।

সূত্র ঃ সুপুত্র শ্রীশিবদাস চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন
থেকে সংক্ষেপিত

লেখক ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

রাজনৈতিক কারণে দেশবিভাগের পর ওপার বাংলা থেকে যে ক'জন উদারমনা ব্যক্তি কোন্নগরকে স্থায়ী আবাস্থল হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

অধুনা বাংলা দেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণা নদীমাতৃক দেশ। ঐ পরগণার পোড়া গঙ্গা নামে পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রবাহিত একটি গভীর খালের ধারে আউটসাহী নামে এক বর্ধিষ্ণু গ্রামের অবস্থান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান বাংলা দেশের নদীমাতৃক গণ্ডগ্রামে সাধারণতঃ দৈনিক বাজার বসতো না, কিন্তু আউটসাহী গ্রামে প্রতিদিন বাজার বসতো।

ওই গ্রামের এক সম্পদশালী পরিবারে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে নরেন্দ্রনাথ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকাশহরে ডাক-তার বিভাগে চাকরী গ্রহণ করেন। কর্মসূত্রে কলকাতায় বদলি হন এবং ভবানীপুরে বসবাস শুরু করেন। বিংশ শতাব্দীর আধাআধি সময়ে চাকরি জীবন থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে ১৯৫০ সালে কোন্নগরে তৎকালীন বাগ্‌দী পাড়ায় (বর্তমানে জাষ্টিস এম, এন, বসু লেন) ৪ বিঘা পরিমান জমি কেনেন। আত্মমর্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন ও উদার হৃদয় এই মানুষটির ইচ্ছা ছিল নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি তিনি তাঁর আত্মীয় বন্ধুদের কেনা দামে বিক্রি করে এক নব আউটসাহী গড়ে তুলবেন এবং এক্ষেত্রে তিনি আংশিক সফলও হয়েছিলেন। ১৯৫৭ সালে অঞ্চলের তদানীন্তন অধিবাসীদের প্রচেষ্টায় মাষ্টার পাড়ায় সার্বজনীন দুর্গা পূজা শুরু হয় এবং তিনি প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বিধবা মহিলাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন তাই তাঁদের মধ্যে বিসর্জনের দিন প্রসাদ বিতরণের জন্য বিশেষ ভাবে উৎসাহী হন এবং এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ভাগ্যান্বেষণে এক সন্তানকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। কালক্রমে উক্ত কৃতজ্ঞ সন্তান সাংস্কৃতিক পরিষদ, মাষ্টার পাড়ার প্রাঙ্গনে পিতা নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর

স্মৃতিতে “নরেন্দ্র ব্যানার্জী স্মৃতি মণ্ডপ” ও “নরেন্দ্র ব্যানার্জী স্মৃতি নাট মণ্ডপ” নির্মাণ করেন। উদ্দেশ্য ওই স্থলে বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠান, সাংস্কৃতিব অনুষ্ঠানাদি ও জনহিতকর কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হতে পারে। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নরেন্দ্র-র এক পুত্র ও অন্যান্য আরো আটজনকে নিয়ে একটি ট্র াস্ট বোর্ড গঠিত হয় এবং এই ট্রাস্ট বোর্ডের পরিচালনায় ও অধীনে ১৯৯৮ সালে নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়। উক্ত সুযোগ্য পুত্র ১৯৯০ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে কোন্নগর পুরসভা পরিচালিত মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে মাতৃস্মৃতিতে দুই লক্ষ চৌত্রিশ হাজার টাকা দানে “তরঙ্গিনী বালা হার্ট ওয়ার্ড-এর প্রতিষ্ঠা হয়। এছাড়া তাঁর উক্ত সন্তান পিতৃ স্মৃতিতে কোন্নগরের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও জন কল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু অর্থ দান করেন।

সম্প্রতি কোন্নগর পুরসভা নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর স্মৃতিতে জাস্টিস এম, এন, বসু স্ট্রিট ও হাবাণ ব্যানার্জী লেনের সংযোগকারী নাতিদীর্ঘ রাস্তাটির নামকরণ করে ‘নরেন্দ্র ব্যানার্জী সরণি।’

এই ভাবে সন্তানের শুভ কর্মেব মাধ্যমে নরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জী কোন্নগবে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সূত্র ঃ নরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রবাসী সন্তান লেখক ঃ নৈমিযারণ্য মুখোটী ও শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্ঞানচাঁদ কাপুর

জন্ম ঃ

দেহাবসান ঃ ১. ৭. ১৯৯৬

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী ও লেখক জ্ঞানচাঁদ কাপুর ১৯৭৬ সাল থেকে কোন্নগরে দেশবন্ধু সরণিতে নিজের বাড়িতে বসবাস করতেন। তার পূর্বে কলকাতার ভবানীপুরে নিজের আত্মীয় পরিজনদের সংগে বসবাস করতেন।

যৌবনে, তিনি যখন পাঞ্জাবে বাস করতেন তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সৎপাল ডাং তাঁর খুব পরিচিত ছিলেন। এক সময়ে আই, পি, টি, এ'র কেন্দ্রীয় কমিটির মুখপত্র 'ইউনিটি'র সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। কোন্নগরে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রী লিলি কাপুর মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ও স্থানীয় আই, পি, টি, এ'র সক্রিয় সদস্যা ছিলেন।

চাকরী জীবনে তিনি Standard Pharamaceutical Ltd. এ উচ্চ প্রশাসনিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কাপুর সাহেব নানা পত্র পত্রিকা ও সংবাদ পত্রে বিশেষ করে Frontier ও Statesman প্রভৃতিতে দীর্ঘকাল ধরে মূল্যবান লেখা প্রকাশ করে এসেছেন, শুধু তাই নয়, তিনি একজন নিপুণ আলোক চিত্র শিল্পীও ছিলেন। কোন্নগরের শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের একাধিক সংস্থার সংগে তিনি যুক্ত ছিলেন—যেমন, ভারত সোভিয়েৎ সংস্কৃতি সমিতি, কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ, কোন্নগর উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ কমিতি, বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'বিজ্ঞান-মানস', কোন্নগর সায়েন্স ক্লাব, অভিযাত্রী সঙ্ঘ, শিশুচক্র প্রভৃতি। এছাড়া মে দিবস, নভেম্বর দিবসের অনুষ্ঠানে, জাতীয় সংহতি বিষয়ক ও শ্রমিকদের অন্যান্য সভায় যোগদান করতেন। ১৯৯৩ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর পুরসভা পরিচালিত জাতীয় সংহতি শোভাযাত্রায় এবং প্রতি বছর ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর প্রভাতফেরীতে তিনি যোগদান করতেন।

হুগলির জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতির হুগলির নেতৃস্থানীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

দুরারোগ্য ক্যান্‌সার রোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১. ৭. ৯৬ তারিখে ৭৮ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী লিলি কাপুর, পুত্র দীপ কাপুর ও পৌত্র আনৈষকে রেখে গেছেন।

শক্তিশালি ও নির্ভিক লেখক রূপে, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও বর্ণময় ব্যক্তিত্বের জন্য কোন্নগরের একজন অগ্রগণ্য বুদ্ধিজীবী হিসাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

৭ জুলাই ১৯৯৬ এ অধ্যাপক সত্যেন সাহার সভাপতিত্বে জ্ঞানচাঁদ কাপুর-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেই সভায় তাঁর পরিবারের লোকজন ব্যতীত বহু সংগঠনের প্রতিনিধি ও তাঁর গুণমুগ্ধরা উপস্থিত থেকে তাঁর জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় দু'টি বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হয়৲ এক, তাঁর বাড়ির কাছে যে খেলার মাঠটি আছে সেখানে পুর সভার উদ্যোগে তাঁর স্মরণে একটি শিশু উদ্যান ও খেলার মাঠ স্থাপনা করা। দুই, তাঁর অমূল্য রচনাগুলিকে সংগ্রহ করে একখানি সংকলন প্রকাশ করা। এই বিষয়ে কোন্নগরবাসীর কিছু উদ্যোগের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বিপিন বিহারী চন্দ্র

জন্ম ঃ

দেহাবসান ঃ

১৯০১ সালে বিপিন বিহারী চন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি পুরাতন বাজার স্ট্রিট (বর্তমানে শ্রী অরবিন্দ রোড) এর চড়কতলা নিবাসী মতিলাল চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র। এঁদের বাড়ির নাম 'চন্দ্র কুটিব'। এই বাড়ি কিছু দিন আগে শ্রী অশোক কুমার দে-র স্ত্রী মমতা ক্রয় করেছেন। বিপিন বিহারী উত্তর ভারতে পূর্ত বিভাগে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। শেষ দিকে সম্ভবত, বিহারে চাকরিতে নিযুক্ত থাকার সময় পাটনাতে গর্দানিবাসে গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে থাকেন। পাটনা ষ্টেশনের নিকট দুই ছেলের দুটি পরিচিত দোকান আছে নাম 'চন্দ্র ব্রাদার্স'। সাহিত্য রচনায় বিপিন বিহারীর খুব ভালো হাত ছিল। তিনি দু'খানি বইও লিখেছিলেন সংক্ষিপ্ত মহাভারত ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। এর মধ্যে একখানি বই ছাপা হয়েছিল। বিপিন বিহারী কোন্নগরের প্রাচীনতম নাট্য সংস্থা ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন-এর সক্রিয় সভ্য ছিলেন।

১৯২২ সালে কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পুরাতন চার চালার পরিবর্তে ১৯০০ টাকা ব্যয়ে নোতুন ঘর তৈরি হয়। বিপিন বিহারী চন্দ্র ও তাঁর বড় ভাই বিনোদ বিহারী চন্দ্র তাঁদের পিতা মতিলাল চন্দ্র-র স্মৃতিরক্ষার্থে কিছু টাকা দেন। এবং বিপিন চন্দ্রের বন্ধুগণ যথা হরিসত্য মিত্র, মন্মথ নাথ মিত্র, প্রফুল্ল মুস্তাফী, জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র প্রমুখের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত 'কোন্নগর সম্মিলনীর' উদ্যোগে ১৯২২ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বান্ধব নাট্য সমিতি' কর্ত্তৃক নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে ১২৯৯ টাকা সংগৃহীত হয়। এই ভাবে দফায় দফায় তখনকার মত ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়।

তিনি কোন্নগরের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে দান করেছেন। কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশু মঙ্গল প্রতিষ্ঠানে অর্থদান করেন।

তিনি কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত অধুনা লুপ্ত 'প্রকাশিকায়' প্রধানতঃ কোন্নগরর পুরাতন কাহিনীকে ভিত্তি করে নানা লেখা দিতেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

(জন্ম ও মৃত্যুর সময় সংগ্রহ করা যায় নি।—সম্পাদক মণ্ডলী)

করতেন তাতেই তিনি অটল থাকতেন। পুর সভার উন্নয়ন মূলক কাজে সব সময়ই তাঁর সহযোগিতা পাওয়া যেত। ১৯৬৫ সালের পুর নির্বাচনে তিনি আর প্রার্থী হননি, তখন তাঁর বয়স ৬৫ বছর।

একজন দৃঢ়চেতা ও কর্মঠ মানুষরূপে কোন্নগরে তাঁর স্মৃতি চির অম্লান হয়ে থাকবে।

কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ভবনে তুলসী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই স্মরণ সভার আহ্বায়ক ছিলেন (১) বিষ্ণু দত্ত, পুর প্রধান, কোন্নগর পুরসভা, (২) নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সভাপতি, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক, (৩) মুরারি মিত্র, সম্পাদক, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার (৪) ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, সভাপতি, কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, (৫) মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, (৬) গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, সদস্য পশ্চিম বিধান সভা, (৭) অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক, কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট।

রচনা ঃ বিষ্ণু দত্ত

কাজল সরকার

(১৯৩৪-২০০১)

বিশিষ্ট নাট্যকর্মী ও ছড়াকার। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'ছোটে বকুলপুরের যাত্রী' অবলম্বনে একাঙ্কিকা যা সফলভাবে ১৫০ রজনী অভিনীত হয়। অন্যান্য রচিত নাটক খয়রাতির খাল, রক্তাক্ত দর্পন, মহাপুরুষ, সূর্য্যসাধ, অরুপকথা এবং পথনাটিকা ভেলকি, ভয়, পালা বদলের পালা। এছাড়া শ্রুতিনাটক ঝোড়ো সংলাপ উল্লেখ্য। মধ্যপ্রদেশে ভেলকি নাটিকা অভিনয় করতে গিয়ে শংকর গুহ নিয়োগীর সঙ্গে কারাবরণ করেন।

শেষজীবনে ছড়া রচনায় আত্মনিয়োগ করেন।

তথ্য ঃ পুত্র সুনীত সরকার — লেখক—গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

কোন্নগরে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

কোন্নগর এমন এক জনপদ যেখানকার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটা বড় অংশ শিক্ষা সংস্কৃতিতে সতত সক্রিয়। তাই এখানে বিগত এক শতক ধরে সাহিত্য, ধর্মচর্চা ও রাজনৈতিক জগতের প্রথিতযশা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মণীষীগণ কোন্নগরে পদার্পণ করে এখানকার মানুষের জাগরণে বিশেষ ভূমিকা রেখে গেছেন। যাঁরা সাধারণত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার, ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির, দ্বাদশ মন্দির, রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি স্থানে স্থানে ভাষণ দিয়ে গেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল—

রামকৃষ্ণদেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মেরী কারপেন্টার, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, বীরেন্দ্র নাথ রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অতুল্য ঘোষ, ডাঃ রণেন সেন, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিম চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়,গীতা মুখোপাধ্যায়, রেণু মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিত গুপ্ত, বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশ গুপ্ত, জ্যোতি বসু, বাসব পুন্নাইয়া, এস, বি, চ্যবন, উৎপল দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য,সবিতাব্রত দত্ত, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ইলা মিত্র, অধ্যাপক গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ড. লাডলী মোহন রায় চৌধুরী, ড. কালিদাস নাগ, দেবব্রত বিশ্বাস, অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র গাঙ্গুলী, অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য, তাপস সেন, তুলসী গোস্বামী, অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, বিনয় সরকার, সত্যেন্দ্র নাথ রায় (আই. সি. এস), অধ্যাপক জে. আর. ব্যানার্জী, ড. প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, পল্লব সেনগুপ্ত, পীযূষ কান্তি সরকার, অনিল বসু, শিপ্রা সরকার, রেভাঃ ডব্লু. এস. উরখাহার্ট, স্যার দেব প্রসাদ সর্বাধিকারী, অধ্যাপক কৃষ্ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যক্ষ পঞ্চানন সিংহ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অবনীভূষণ চ্যাটার্জী (আই. সি. এস), ড. মেঘনাদ সাহা, অধ্যক্ষ কে. ডি. ঘোষ, ভূপতি মজুমদার, ড. রাধা কুমুদ মুখার্জী, ড. ত্রিগুণা সেন, ড.

নিমাই সাধন বসু, দিলীপ কুমার বিশ্বাস, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রিয় রঞ্জন সেন, উপেন্দ্র নাথ গঙ্গে ।পাধ্যায়, জয় গোপাল ব্যানার্জী, মহেন্দ্র নাথ সরকার, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল মুখার্জী, অধ্যক্ষ বি. এন. সেন, কুমুদিনী বসু, সরলা দেবী, ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রফুল্ল কুমার সরকার, বিশ্বপতি চৌধুরী, শশিভূষণ দাসগুপ্ত, তান্-য়ূন-সান, অতুল চন্দ্র গুপ্ত, গুরুসদয় দত্ত (আই. সি. এস), এস. ওয়াজেদ আলী, বিমল ঘোষ, ড. নীহার রঞ্জন রায়, জানকী বল্লভ ভট্টাচার্য, প্রমথ নাথ বিশী, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, কালী কিঙ্কর সেনগুপ্ত, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র নাথ মিত্র, হর প্রসাদ মিত্র, অশোক মিত্র, কাজী আবদুল ওদুদ্, সৌরীন্দ্র মোহন মুখার্জী, ত্রিপুরা শঙ্কর সেন, ধীরেন্দ্র লাল ধর, ড. অজিত কুমার ঘোষ, বিনয় ঘোষ, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য, ডাঃ গোপাল দাস নাগ, অন্নদা শঙ্গর রায় (আই. সি. এস), কবিতা সিংহ, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সমরজিৎ কর, রমাপ্রসাদ দাস, সুমথ নাথ ঘোষ, গজেন্দ্র কুমার মিত্র, সুবোধ চক্রবর্তী, ছায়া বেরা, পদ্মা খাস্তগীর, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, ড. অম্লান দত্ত, শিবনারায়ণ রায়, ভবেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। (তালিকা অসম্পূর্ণ)

সংগ্রাহক—বিষ্ণু দত্ত

অনুচ্ছেদ—৫

কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান

(ক) এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ

(খ) এলাকার গ্রন্থাগার ঃ

(গ) সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান ঃ

(ঘ) নাট্য সংস্থা ঃ

(ঙ). খেলাধূলা ও শরীর চর্চা প্রতিষ্ঠান ঃ

(চ) সামাজিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ঃ

(ছ) ধর্ম প্রতিষ্ঠানের পরিচিতি ঃ

(জ) বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ঃ

কোন্নগর উচ্চ-বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কোম্পানী দেখল দেশটা শাসন করতে হলে শুধু ইংরেজ কর্মচারীর ওপর নির্ভর করলে চলবে না কারণ এদেশের লোকসংখ্যার তুলনায় ইংলন্ডের লোকসংখ্যা অনেক কম। আর শাসন করার জন্য সব ইংরেজকে ত আর এদেশে আনা চলে না, তাই তারা ঠিক করল এদেশীয় লোকের সাহায্য নিতেই হবে। যেহেতু তারা প্রথমে বাংলায় এসেছে অতএব বাঙ্গালিদের মধ্যে থেকেই প্রথম বিদগ্ধ মানুষদের খুঁজতে লাগল।

কিন্তু কথাবার্তা ভাব বিনিময় করতে দরকার হল ভাষা। অতএব এদেশের লোককে যদি একটু ইংরেজী শিখিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ভাল হয়। আবার অপরদিকে জোর করে ইংরেজী চালু করলে এদেশের মানুষ চটে যেতে পারে, এই ভয়ে তাঁরা সংস্কৃতর ওপরও জোর দিলেন। শুধু এড়িয়ে চললেন পার্শী ও উর্দ্দুকে কারণ ও দুটোই এতদিন ছিল রাজশক্তির ভাষা। সেই রাজশক্তির কাছ থেকে দেশ কেড়ে নিয়ে আবার তাদের ভাষাকে প্রশ্রয় দিলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

হিন্দু বাঙ্গালিরা এই সুযোগ নিতে এগিয়ে এল। উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণর বাঙ্গালি হিন্দুরা ইংরেজী শিখতে এগিয়ে এল। স্কটল্যান্ডবাসী ডেভিড হেয়ার (জন্ম ১৭৭৫) ১৮০০ সালে এদেশে আসেন। তিনি অনুভব করেছিলেন এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলিত না হলে এদেশের উন্নতি হবে না। ১৮১৪ সালে রামমোহন পাকাপাকিভাবে কলকাতায় বাস করতে এলে হেয়ার-এর সংগে তাঁর সখ্যতা হয়। ১৮১৬ সালে হেয়ার একদিন রামমোহনের কলকাতার বাড়িতে এসে তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। ফলশ্রুতি, হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (২০।১।১৮১৭)।

কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব পড়তে গিয়েছিলেন এই কলেজেই। পেয়েছিলেন অতীব গুণী শিক্ষক ডিরোজিও ও অনেক প্রতিভাবান সতীর্থকে।

ইংরেজী শিক্ষার উপকারিতা তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ১৮৫০ সালের পর তাঁর সঙ্গে কোন্নগরের যোগাযোগ পুনঃস্থাপিত হলে এবং তিনি নিজে এখানে একটি বসতবাটি নির্মাণ করলে তাঁর মনে কোন্নগরের শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে ভাবনার উদ্রেক হয়। জনকল্যাণের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "হিতৈষিণী সভা" (১৮৫২)। এই সভারই একটি অধিবেশনে তিনি কোন্নগরে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বাসনা ব্যক্ত করেন। সভা সম্মত হলে তিনি জি.টি. রোডের পার্শ্বস্থিত ১ বিঘা ৫ কাঠার মত তাঁর নিজস্ব জমি ও চার হাজার টাকা দিয়ে দেন। হিতৈষিণী সভা এদ্দিনে ভেঙে গেছে। সুতরাং তাঁর একক চেষ্টাতেই ১৮৫৪ সালের ১লা মে তারিখে 'কোন্নগর সেমিনারি' নামে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৬ সালেই এর নাম বদলে হয় কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়। সরকারী স্বীকৃতি লাভ হয় ১৮৫৫ সালে।

১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের বছরে প্রতিষ্ঠিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথম প্রবেশিকা (Entrance) পরীক্ষা গৃহীত হয় ১৮৫৮ সালে। কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর পাঠ সমাপনকারী কিছু ছাত্র ঐ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় (৭ জন)। সফল হন চারজন—বিধুরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণধন ঘোষ ও শ্যামাচরণ দেব। এঁর মধ্যে তৃতীয়জন ছিলেন ভারতপূজ্য শ্রী অরবিন্দর পিতা। আর চতুর্থজন ছিলেন শিবচন্দ্রের জ্যাঠামশাই জগন্নাথ দেবের পৌত্র।

এখানকার মূল ভবনটি যে ভূখণ্ডের ওপর অবস্থিত সেটি ছিল শিবচন্দ্রের নিজের। ওইটি তিনি একটি ট্রাষ্ট ডীড করে ১৮৮৮ সালে একটি বোর্ড অব ট্রাষ্টীর হাতে তুলে দেন। প্রথম ট্রাষ্টী ছিলেন ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সত্যপ্রিয় দেব।

এই ভূখণ্ডের পেছনের বা পশ্চিমের জমিটি ছিল শিবচন্দ্রের দাদা ঈশ্বরচন্দ্রের, আর দক্ষিণের জমির মালিক ছিলেন গিরিশচন্দ্র দেব ও রাধিকা নাথ বসু ভ্রাতৃত্রয়ের পিতৃদেবের। কালক্রমে ধীরে ধীরে এগুলি সব স্কুল কিনে নেয়। দক্ষিণে থাকে খেলার মাঠ ও বঙ্গ বিদ্যালয় ভবন। পশ্চিমেও রাখা হয় বাস্কেট বলের কোর্ট। জমির পরিমাণ তখন দাঁড়ায় একলপ্তে ৫ বিঘা ৬ কাঠার মত। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরে জি.টি. রোডের পূব দিকের গঙ্গাতীরবর্তী

১ বিঘা ৩ কাঠার মত জমি ২৫০০ টাকায় কিনে নেন। তারই একাংশে এখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিবচন্দ্র শিশু উদ্যান। যেটির সংরক্ষণ করছেন কোন্নগর পুরসভা। এইভাবে বিদ্যালয়ের এখন মোট জমির পরিমাণ ৭ বিঘা ৯ কাঠার মত।

বাড়ির ইতিহাস ঃ— বিদ্যালয় যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন যে দুটি ঘর ও সঙ্গের হলঘর নির্মিত হয় তা আজ আর নেই। সেগুলির অবস্থান ছিল এখনকার মধ্যবর্তী উঠোনের মাঝখানে। ঘর ছিল পুবে এবং হল ছিল পশ্চিমে। ১৮৫৮ সালে যখন পাবলিক লাইব্রেরী তৈরী হল তখন এ ঘর দুটোর দক্ষিণ একটা সিঁড়ি তুলে দোতলায় একটা গোলপাতার চালা ঘর করে সেখানে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৬৩ সালে হল ঘরের পশ্চিমে আর দুটো ঘর তৈরী করা হয়। ১৮৬৪-র ঝড়ে গোলপাতার ছাউনি উড়ে গেলে দোতলার ছাদ পাকা করা হয়। এরপর ১৮৯৩ সালে এই মূলকাঠামোর দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে আর দুটো পাকা ঘর নির্মাণ করা হয় যা আজ মূল বাড়িটার অন্তর্ভুক্ত আছে (দক্ষিণের সিঁড়ির পশ্চিম পাশের ঘর।)

১৮৯৭ এর ১২ই জুন বিকেলে হয় এক বিরাট ভূমিকম্প। ১৮৯৩-র আগে নির্মিত সব ঘরই খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এবং ঐ পুরণো বাড়ির দোতলা ভেঙে ফেলা হয়। তার বদলে পশ্চিমের ঐ ঘর দুটোর লাগোয়া আর দুটো ঘর উত্তরের দিকে নির্মাণ হয়। এই সব ঘরগুলোই বর্তমান বাড়ির অংশ হিসেবে আজও আছে যদিও সব ছাদ পরে বদল করা হয়।

এরপর ১৯১৩ সালে ডাঃ চণ্ডীচরণ ঘোষাল সম্পাদক থাকাকালে পরিচালন সমিতি স্থির করে ১৮৯৩-এর আগে নির্মিত ভবন ভেঙে ফেলা হবে, পশ্চিম প্রান্তের পাশাপাশি চারখানি ঘরের সামনে দিয়ে টানা বারান্দা তৈরী করা হবে, এই বারান্দার উত্তর দক্ষিণে দুটো সিঁড়ি করা হবে এবং দোতলায়ও ঐ রকম ঘর করা হবে। খরচ ধরা হল আনুমানিক ১২০০০ টাকা। বিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ উমাচরণ ঘোষাল তাঁর বাল্যবন্ধু বর্ধমানের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল, তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে আবেদন করলে তিনি ১২০০০ টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং এক হাজার টাকা আগাম দিয়ে দেন। পরে তিনি মারা গেলে তাঁর ছেলে দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাকী টাকাটা দিয়ে দেন। আরও ১২০০০ টাকা সরকারী অনুদান পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে

পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করে ৩৪০০০ টাকার পরিকল্পনা করা হয়,যার ফলে হাজার টাকা চাঁদা হিসেবে সংগ্রহর ব্যবস্থা হয়।

এরপর সরকারী ইঞ্জিনীয়ার ক্রাউচ সাহেবের পরিকল্পনা ও ননীগোপাল বসু মহাশয়ের নক্সা অনুযায়ী নতুন ভবন নির্মাণ শুরু হয় ১৯১৬ সালে। ভবনটির উদ্বোধন করেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৮ সালে। কথিত আছে ঘর দেখতে দেখতে নর্দমা না দেখতে পেরে স্যার আশুতোষ নাকি বলেন—কী ননীগোপাল তোমরা কোনদিন ঘর ধোবে না নাকি? মহামানবের দৃষ্টিই কত সূক্ষ্ম।

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী তখনও এই বাড়িটির দোতলার উত্তরের ঘরে ছিল। পরে লাইব্রেরীর নিজস্ব ভবন নির্মিত হলে লাইব্রেরী এখান থেকে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৮ সালে নির্মিত হয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন।

ছাত্রসংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকলে বিদ্যালয় ভবনের দক্ষিণ বাহুকে সম্প্রসারিত করে আরও একটি দ্বিতল ভবন সংযোজিত হয়, ব্যয় হয় ৭০০০ টাকা। নীচের তলায় হয় বিজ্ঞান গ্যালারি। দোতলায় হয় মিটিং রুম ও প্রধান ও সহপ্রধান শিক্ষকের ঘর।

বিদ্যালয় ভবনে পরবর্তী সংযোজন হয় তিনতলা মাল্টিপারপাস (সর্বার্থ সাধক) ভবন ১৯৫৪-৫৭ সালে। দোতলা তিনতলায় থাকে ক্লাসরুম, একতলায় গবেষণাগার। স্বতন্ত্র শেডে নির্মিত হয় ওয়ার্কশপ। এরপর ১৯৬১-৬৩ সালে নির্মিত হয় রিক্রিয়েশন হল বা শিবচন্দ্র বিনোদভবন। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রম পরিবর্তিত হলে ১৯৮১ সালে ওয়ার্কশপ শেডের একাংশে নির্মিত হয় ছাত্রদের কমনরুম ক্লাস গেমস্ রুম। পরে তার দোতলায় একটি শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করা হয়। ১৯৮১ সালে শিক্ষকদের ঘরের লাগোয়া একটি টয়লেট নির্মাণ করা হয়।

জমি ও বাড়ির প্রসঙ্গর পরেই আসে শিক্ষা ও শিক্ষক বিষয়ক কিছু কথা। ১৮৫৮ সালে শিবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভার্নাকুলার স্কুল বা বঙ্গ বিদ্যালয় কালক্রমে জনপ্রিয়তা হারায়। ছাত্রর অভাবে ১৯০০ সালে বিদ্যালয়টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে যুক্ত হয়ে যায়। ক্লাস থাকে ইনফ্যান্ট, ওয়ান আর টু। প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে যদিও এক স্বতন্ত্র প্রধান শিক্ষক ছিলেন তবু সেই স্কুলটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

১৯৫৪ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা বলবৎ থাকে। ঐ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিকের দপ্তরে চলে গেল, এবং চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার স্তর নির্দ্ধারিত হলে ঐ প্রাথমিক বিদ্যালয়টি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং নাম হয় শিবচন্দ্র দেব প্রাথমিক বিদ্যালয়। যেহেতু পূর্ব পর্য্যায়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট শ্রেণী ছিল তিনটি এবং স্বতন্ত্র ভবনের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করা হল। দপ্তর রইল ওই বাড়িটিতে। ১৮৫৪ সালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এবং বিদ্যালয় শেষের চূড়ান্ত এন্ট্রান্স পরীক্ষাও প্রবর্তিত হয়নি। ১৮৪০ সালে জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশান প্রবর্তিত জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষাই ছিল তখন বিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮৫৮ সালের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষায় এই বিদ্যালয় থেকে ৭ জন পরীক্ষার্থী অবতীর্ণ হয়েছিল। ঐ এন্ট্রাস পরীক্ষার নাম ১৯১০ সাল থেকে বদলে গিয়ে হয় ম্যাট্রিকুলেশন এগজামিনেশন যা প্রচলিত থাকে ১৯৫১ পর্যন্ত। তারপর নাম হয় স্কুল ফাইন্যাল। নিয়ন্ত্রণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাত থেকে চলে যায় পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হাতে। স্কুল ফাইন্যাল থাকে ১৯৫৮ পর্যন্ত। ঐ বছর থেকে চালু হয় একাদশ শ্রেণীর সর্বার্থসাধক শিক্ষাক্রম। ১৯৬০-এ হয় তার প্রথম পরীক্ষা। ১৯৭৪-এর পর এই ব্যবস্থার আবার বদল হল। একাদশ শ্রেণীর শিক্ষাক্রমের বদল হল। তারপর আবার এল সেই দশমশ্রেণীর শিক্ষাক্রম। সঙ্গে যুক্ত হল একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর দু'বছরের শিক্ষাক্রম। শেষ পরীক্ষা হল মাধ্যমিক। পরের দু বছর ধরলে উচ্চমাধ্যমিক। সেই ব্যবস্থা এখনও চলছে।

প্রথম যুগে বিদ্যালয় নিযুক্ত শিক্ষক ছাড়াও বাইরের শিক্ষানুরাগী মহাশয় ব্যক্তিরা বিদ্যালয়ে শিক্ষা বা পরীক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। তবুও শিক্ষকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যায়। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ, উমেশ চন্দ্র দত্ত, যদুনাথ পাল, নিত্যকৃষ্ণ বসু, রমণীকান্ত চক্রবর্তী। মণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রজনীকান্ত সেন, যতীন্দ্র নাথ রায়, ননীগোপাল চৌধুরী প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে গেছেন। বিদ্যালয়ের আদিপর্বে কলকাতা ও কোন্নগরের কিছু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও খাতা দেখার কাজে স্বেচ্ছাশ্রম দান করে

বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন হেয়ার স্কুলের গিরিশ চন্দ্র দেব, হিন্দু স্কুলের গোবিন্দ চন্দ্র মিত্র, হাওড়া সরকারী বিদ্যালয়ের পাঁচকড়ি ব্যানার্জী। মেদিনীপুর সরকারী বিদ্যালয়ের সারদা প্রসাদ সরকার, প্রেসিডেন্সি কলেজের পিয়ারীচরণ সরকার। কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব, ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্গণ।

১৮৫৬-৫৭ সালে বিশ্ববিদালয়ের ছাত্রসংখ্যা ছিল সাকুল্যে ২০২ জন। এই সংখ্যা মাঝে মাঝে কমলেও ধীরে ধীরে বেড়ে চলতে থাকে। এখন পঞ্চমশ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র সংখ্যা যথেষ্ট বলা যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্র পাশের হার ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে তা হ্রাস পেয়েছে। পঠন-পাঠন ব্যাহতও হয়েছে। তবু বিদ্যালয় তার একটা মাঝামাঝি মান বজায় রেখে চলেছে।

এই বিদ্যালয় থেকে পাশ করে যাওয়া ছাত্রদের মধ্যে অনেকে কৃতী ও পরবর্তী জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী ও শতোত্তর রজত জয়ন্তী সংখ্যায় তাঁদের অনেকের নাম উল্লেখ আছে।

আগামী ২০০৪ সালে বিদ্যালয়ের শতোত্তর সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ ও উৎসব উদ্যাপিত হবে। তার আগে বিদ্যালয়ের আমূল সংস্কার কাজ চলছে। প্রাক্তন ছাত্র ও শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্য ও সহযোগিতায় এ কাজ আশা করা যায় সময়কালের মধ্যেই শেষ করা যাবে।

লেখক ঃ রথিন চক্রবর্তী

শ্রী অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ কোন্নগর

স্থাপনা ঃ ১৯৫৩

দেশ বিভাগের ফলে বহু শিক্ষাব্রতী, কোন্নগরে এসে বসবাস শুরু করেন। স্বভাবতই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে প্রসারণ ঘটে। ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চলে কয়েকটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যতম শ্রী অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ। প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ছিলেন: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ড. হেরম্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, সফল ব্যবহারজীবী রাজেশ্বর ধর, প্রতিষ্ঠালব্ধ চিকিৎসক তারাপদ চৌধুরী, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের (যার প্রতিষ্ঠা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্বে) শ্রদ্ধেয় শিক্ষাব্রতী অজিত কুমার সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিজয় কুমার নন্দী ও সুধীর দত্ত প্রমুখ। এঁদের সকলেই আজ লোকান্তরিত। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দের ১২ মার্চ প্রাথমিক স্তরের চারটি শ্রেণী নিয়ে প্রয়াত বিজয় কুমার জানার বাড়িতে বিদ্যাপীঠের শুভ সুচনা হয়। প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত নকুল চন্দ্র রায়। কোন্নগর টিনবাজারে এবং পরবর্তী সময়ে বিবেকানন্দ প্লেসে বাঁশের ঘরে কিছু দিন ক্লাশ চলবার পরে পৌর অঞ্চলের ৬ নম্বর ওয়াডের বর্তমান অবস্থানে কোন্নগর কল্যাণ পরিষদ প্রদত্ত জমিতে বিদ্যাপীঠের নিজস্ব গৃহের পত্তন হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রাথমিক বিভাগের সঙ্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণী অনুমোদন লাভ করে। তখনকার প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। তাঁরই কার্যকালে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী অনুমোদন লাভ করে। জুনিয়ার হাইস্কুল পর্যায়ের এই বিদ্যালয়ে তখন সহশিক্ষার ব্যবস্থা চালু ছিল। সে সময়কার একটি ঘটনা উল্লেখের দাবী রাখে। তখন, শিক্ষাব্রতী প্রয়াত অজিত কুমার সেন-এর সহধর্মিনী প্রয়াতা মলিনা সেন বিনা পারিশ্রমিকে দীর্ঘ তিন বৎসর শিক্ষাশ্রম দান করেন। বিদ্যাপীঠ কৃতজ্ঞ চিত্তে এই মহানুভবতাকে স্মরণ করে।

প্রয়াত সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান শিক্ষকতা কালে বিদ্যাপীঠ ১ জানুয়ারী ১৯৬৯, মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত হয়, এবং কলা ও বাণিজ্য শাখায়

নবম ও দশম শ্রেণী অনুমোদন লাভ করে। এই সময় সহশিক্ষা উঠে যায়। কিছুকাল পূর্বে প্রাথমিক বিভাগ পৃথক হয়। শ্রীমতী মঞ্জু সরকার বর্তমানে এই প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষিকা।

শ্রী রজত কান্তি চৌধুরী প্রধান শিক্ষক থাকা কালীন মেরামতি অনুদানের অর্থে বিদ্যাপীঠের কিছু সংস্কার সাধিত হয়। এই প্রসঙ্গে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও অভিভাবকদের অবদান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বিদ্যালয়টি দোতলা গৃহে অবস্থিত। পরবর্তীকালে জেলা পরিষদের আশি হাজার এক প্রাক্তন সাংসদ শ্রী সুদর্শন রায়চৌধুরীর সাংসদ কোটা থেকে এক লাখের অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয়টি বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে।

বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় দু'শ, শিক্ষক ১২ জন এবং শিক্ষাকর্মী ৩ জন।

যাঁর প্রধান শিক্ষকতায় বিদ্যাপীঠ বিংশ শতাব্দী থেকে একবিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে তিনি শ্রী পৃথ্বীশকুমার ভট্টাচার্য—যিনি বর্তমানে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রতিবেদক ঃ শ্রী নৈমিষারণ্য মুখোটী

তথ্য ঃ প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী উদয়ন চট্টোপাধ্যায়

শিবচন্দ্র শিক্ষাভবন

এস. সি. মুখার্জী স্ট্রীট (হাতির কুল), কোন্নগর

কোন্নগরে যে সব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে তার মধ্যে প্রাচীনতম ও শিক্ষাগত মানে অন্যতম শিবচন্দ্র শিক্ষাভবন। ১৯৭২ সালে এমন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন কোন্নগরে তিনজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসমীর গাঙ্গুলী, ও শ্রীদেবব্রত সেন। ইতিপূর্বে এরকম একটি বিদ্যালয় তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর সেই বিদ্যালয় সরকারী অনুমোদন লাভ করলে তাঁরা সেই বিদ্যালয়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। কোন্নগরের বহু মানুষের অনুরোধে ও উৎসাহে পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এই তিন জনের প্রচেষ্টায় ১৯৭২ সালের ৩ ডিসেম্বর এক সভায় নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফল স্বরূপ আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে যিনি কোন্নগরের পথ প্রদর্শক ও অগ্রণী পুরুষ, আধুনিক কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত "শিবচন্দ্র শিক্ষাভবন" আত্ম প্রকাশ করে ১৯৭৩ সালে ১ জানুয়ারী।

•

কোন্নগরের হাতিরকুলে ডাঃ হরিসত্য ভট্টাচার্য মহাশয়ের উঠান সহ বাড়িটি তাঁর ছেলে বর্তমানে প্রয়াত জয়ন্ত ভট্টাচার্যের অনুকূল্যে পাঁচ বছরের জন্য লীজ নেওয়া হয়। শুরু হয় ৭৮ জন ছাত্র/ছাত্রী নিয়ে পাঁচটি শ্রেণী। ইতিমধ্যে পাঁচ বছর শেষে আরও দশ বছরের জন্য লীজ নেওয়া হয়।১৯৯০ সালের ২৫ জুন প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিষ্ট্রিকৃত করার পর নিজস্ব ভবন নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হয়। বিদ্যালয়ের আদি ভবনটির কাছাকাছি থাকার আগ্রহে এবং গৃহস্বামীরও মূল ভবনটি ফেরৎ পাওয়ার প্রয়াসে উভয়পক্ষের সম্মিলিত ইচ্ছায় বিদ্যালয়ের আদি বাড়ির উত্তর দিকে গৃহস্বামীর খালি ৩১ বর্গফুট (৪ কাঠা ১৪ ছটাক) জমিটি তৎকালীন পুরপিতা শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় ২০,০০০ টাকায় ১৯৯২ সালের ক্রয় করা হয়। ছাত্র বেতনের ওপর কিছু টাকা ধার্য করে এবং দান সংগ্রহ করে গৃহ নির্মাণ তহবিল গঠন করা হয়। ১৯৯৩ সালের ১৩

জুলাই বিদ্যালয় ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন পুরপিতা শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। প্রায় তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনতলার ভিত সহ এক তলার নির্মাণ কাজ শেষ হয় এবং ১৯৯৫ সালের ১২ মার্চ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মাননীয় ড পবিত্র সরকার মহাশয় ভবনটির উদ্বোধন করেন। বর্তমানে দু'তলার এই বাড়িটি শ্রেণী কক্ষ, সভাগৃহ, অফিস, পর্যাপ্ত টয়লেট, জলের লাইন, পাম্প, বৈদ্যুতিন আলো, পাখা প্রভৃতি আধুনিক ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। নিচের শ্রেণীকক্ষ গুলি প্রয়োজন বোধে একটি হল ঘরে রূপান্তরিত করা যায়। বর্তমানে ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্য ৩৬০ জন। প্রধান শিক্ষক সহ শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ২০ জন এবং শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ৪ জন। পরিচালন সমিতিতে নয় জন স্থায়ী সদস্য, প্রধান শিক্ষক, একজন শিক্ষক প্রতিনিধি ও একজন অভিভাবক প্রতিনিধিসহ মোট ১২ জন আছেন। শিক্ষক ও অভিভাবক প্রতিনিধির কার্যকালের মেয়াদ তিন বছর। পরিচালন সমিতির সুদক্ষ পরিচালনায় বছর শেযে বাৎসরিক সভা, আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষা আধিকারিক অনুমোদিত রেজিষ্টার্ড চাটার্ড অ্যাকাউনটেণ্ট দ্বারা নিয়মিত অডিট করান ও সাধারণ সভায় পেশ করান, রিটার্ণ মারফৎ রেজিষ্ট্রারের দপ্তরে হিসাব পেশ করা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে। শিক্ষা ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালন সমিতিকে সহায়তা করার জন্য অতি সম্প্রতি প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য ছয় জন শিক্ষক সহ মোট সাত জনের একটি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। প্রতি তিন বছর অন্তর এই কাউন্সিল পুনর্গঠিত হবে। বেসরকারী বিদ্যালয় হলেও এটি কোন ব্যক্তিগত মালিকাধীন বা লাভজনক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়। বর্তমানে পরিচালন সমিতির সভাপতিরূপে অধ্যাপক রথিন চক্রবর্তী, সম্পাদক রূপে শ্রীনিতাই গাঙ্গুলী এবং প্রধান শিক্ষক হিসেবে শ্রীদুলাল চন্দ্র বিশ্বাস নিযুক্ত আছেন।

পরিচয়, শিশু এবং প্রথম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাতঃ বিভাগ এবং দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত দিবা বিভাগ—এই দুটি বিভাগে বিভক্ত করে পঠন পাঠন পরিচালনা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক বিভাগ নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পঠন-পাঠন হয়। তার বাইরে ইংরাজী পড়ান হয়। পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে সরকারী বই-এর সঙ্গে বিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রকাশিত ও বাইরের বাছাই করা কিছু বইও নেওয়া হয়। প্রতিশ্রেণীতে তিনটি করে বিভাগ (সেকসন)

এবং প্রতি বিভাগে ২৫ থেকে ৩০এর মধ্যে ছাত্র সংখ্যা রাখা হয়। ছাত্র বেতন থেকে যে আয় হয় তা থেকেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নামমাত্র সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়। অবশ্য ১৯৭৪ সাল থেকে একটা বেতন কাঠামো চালু করা সম্ভব হয়েছে। অবসরকালীন সুবিধার অঙ্গ হিসেবে গ্রাচ্যুয়িটি ও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের যতটা সম্ভব ব্যবস্থা করা আছে—যা এই জাতীয় বেসরকারী বিদ্যালয়ে অন্তত কোন্নগরে কোথাও চালু নেই।

এই অঞ্চলের ছাত্র/ছাত্রীদের সামগ্রীকভাবে উৎসাহ দানের জন্য আবৃত্তি, বানান, হাতের লেখা, নামতা প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন হয়ে আসছে ১৯৭৪ সাল থেকেই। পাঠ্য বিষয়ক ও শিক্ষামূলক রচনায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হত "শিক্ষাভবন পত্রিকা।" মূলতঃ আর্থিক কারণে এই পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ আছে।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে শিবচন্দ্র শিক্ষাভবন কোন্নগরে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার একটা দাবী বিভিন্ন মহল থেকে আসছে।

লেখক ঃ দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস
প্রধান শিক্ষক
শিবচন্দ্র শিক্ষা ভবন

গোল্ডেন জুবলি কমিটি অব্ এক্সস্টুডেন্টস ১৯৪৭-১৯৪৮

কোন্নগর এইচ স্কুল

১৮৫৪ সালে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এক মহাত্মার অনেক স্বপ্নর অন্যতম একটি রূপ এই শিক্ষামন্দির। কয়েক হাজার ছাত্র এই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দ উপরোক্ত ছাত্রদের একটি অংশ বিদ্যালয়ের সীমা পার হবার পর অন্যান্যদের মতো তারাও উচ্চশিক্ষা লাভ করে এবং পরে জীবন সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেও বিদ্যালয় জীবনের মধুর স্মৃতি কখনও ভুলতে পারেনি। কয়েক বছর আলাদা আলাদা ভাবে তারা বছরে একদিন পুর্ণমিলন উৎসব করে বাল্য স্মৃতি রোমন্থন ও আঁমোদ আহ্লাদে মেতে উঠত। পরে এই দল একত্র হয়ে নিয়ম করে প্রতি বছর এই উৎসব পালন করেছে।

১৯৯৬ সালের ১০ই জানুয়ারি অক্ষয় শান্তিকুঞ্জে যখন এই উৎসব চলছে তখন আলোচনার মাধ্যমে জানা গেল কয়েকজন সহপাঠী মারা গেছেন, যেহেতু সকলে প্রায় সমবয়সী সেইহেতু এই সংবাদ তাদের কাছে সতর্কবাণী রূপে মনে হল। ঐদিনই আলোচনা করে ঠিক হল যে, শিক্ষামন্দিরের মাধ্যমে এই সঙ্ঘবদ্ধতা এবং এখনই এই শিক্ষা মন্দিরের উন্নতিকল্পে কিছু চেষ্টা করা উচিত। এই ভাবেই শিক্ষা ভবনের কিছু ঋণ পরিশোধ করার উপযুক্ত সময়। সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে অর্থ সংগ্রহের জন্য পরের বছর ১৯৯৮ সালের পুর্ণমিলন উৎসবের পঞ্চাশ বছরের পূর্তি উপলক্ষে "গোল্ডেন জুবলি কমিটি অব্ এক্স টুডেন্টস্ ১৯৪৭ ও ১৯৪৮ কোন্নগর এইচ স্কুল" তৈরি হল।

সভ্যদের তিন বছরের চেষ্টায় যে অর্থ সংগৃহীত হল তা কমিটি বিদ্যালয়ের 'বিনোদ ভবনের সংস্কার ও সম্প্রসারণ উদ্দ্যেশ্যে ৫০ হাজার টাকা, মঞ্চটির নাম করণের জন্য ৫ হাজার টাকা এবং বিদ্যালয়ের পাঠরত ছাত্রদের উৎসাহ দানের জন্য ৩০ হাজার টাকার এনডাওমেণ্ট ফাণ্ড বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক অধ্যাপক রথিন চক্রবর্তীর বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়,—

'৪৭ ও ৪৮ সালের প্রাক্তন বিদ্যালয় ছাত্ররা আমার অগ্রজ। তাঁদের এই প্রয়াস, আমার বিশ্বাস অন্যদের করবে অনুপ্রাণিত। পরবর্তী প্রজন্ম হবে প্রভাবিত, উৎসাহিত। তারাও হয়তো এই রকমভাবে মিলিত হবে। তারাও হয়তো তাদের শিক্ষা মন্দিরের কাছে তাদের যে ঋণ তা পরিশোধে এগিয়ে আসবে। বিদ্যালয়কে সমৃদ্ধ করতে উদার হস্ত এগিয়ে দেবে। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন নয় সম্মিলিত ভাবে এগিয়ে আসবে ছাত্রধারা, আরও আরও ছাত্রদল। '৪৭ ও ৪৮ এর প্রাক্তনীরা হবেন তাঁদের পথিকৃত। তাঁরা হবেন তাদের পথ প্রদর্শক। এই ভাবেই ইতিহাস এগিয়ে চলবে বছর থেকে বছরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দী। —এটি একটি অনুকরণীয় প্রচেষ্টা।

সূত্র—শ্রী বিশ্বনাথ মিত্রের প্রতিবেদন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর নগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু বিদ্যামন্দির

(স্থাপনা ঃ ১৯৬২)

দেশ বিভাগের ফলে অধুনা বাংলাদেশ থেকে ঐ অঞ্চলের মানুষজন দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। জীবন ধারণের জন্য বিভিন্ন ধরণের নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। নতুন বিদ্যালয় স্থাপন এই চাহিদার অন্যতম এবং এই তাগিদেই প্রতিষ্ঠিত হয় নগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু বিদ্যামন্দির। স্থান, অরবিন্দ পল্লী। সরকার প্রদত্ত একখণ্ড জমির উপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৎকালীন নিয়ম অনুসারে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম ও ষষ্ঠ এই দুটি শ্রেণীর শুরুর মধ্যদিয়ে এই মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির শুভ সূচনা হয়।

প্রতিষ্ঠাকালীন সভাপতি ছিলেন সেদিনকার শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শ্রী বি.সি.শর্মা এবং সম্পাদক ছিলেন শ্রী নীলমাধব মুখোপাধ্যায়। শুরু থেকে প্রধান শিক্ষক ছিলেন শ্রী ভোলানাথ শুর।

বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আর্থিক বদান্যতায় বিদ্যামন্দিরের ভবনটি তৈরি হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ঃ প্রয়াত নগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু, প্রয়াত ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কোন্নগর মিলন সংঘ ও রোটারি ক্লাবের শ্রীরামপুর শাখা।

নগেন্দ্র নাথ কুণ্ডু বিদ্যামন্দির এই অঞ্চলের একমাত্র সহশিক্ষা (কো-এডুকেশন) বিদ্যালয়। বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা চার শতাধিক এবং ছাত্রীর সংখ্যাও তিনশর উপর। শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা ১৮ এবং শিক্ষাকর্মীর সংখ্যা ৫। এই পরিচিতি দেবার সময় প্রধান শিক্ষকের আসনে অধিষ্ঠিত আছেন শ্রী মনোজ মোহন চট্টোপাধ্যায়।

শ্রী কেশব চন্দ্র বিশ্বাস বর্তমান বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি এবং সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন শ্রী বলরাম চক্রবর্তী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে শ্রী বলরাম চক্রবর্তী মহাশয় এক সময় ১৭ বৎসর এই বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন।

বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জাতীয় খো-খো প্রতিযোগিতায় বিদ্যামন্দিরের ছাত্রী যমুনা সাহা এক সময়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী বিবেচিত হয়।

তথ্য ঃ শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তী অনুলিখন ঃ শ্রী নৈমষারণ্য মুখোটী



কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কথা

সময়ের নিজস্ব প্রবহমানতার ধারা বেয়ে আজকের কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে। দীর্ঘ ১৪১ বছর ধরে তার একটি একটি কোরক বিকশিত হয়েছে, ছাত্রী শিক্ষিকা, অভিভাবকরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ তুলির ছোট ছোট নিপুণ টানে সম্পন্ন করেছেন ও করেছে। নিজস্ব আদর্শ ও ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের শিকড়কে দৃঢ় প্রোথিত রেখে বিদ্যায়তনটি যুগোপযোগী থেকেছে, এখানেই এই বিদ্যায়তনের সার্থকতা।

১৯৬৭ সালের ৫ই ফেব্রয়ারী এই বিদ্যায়তনের সহ শিক্ষিকা হিসাবে নিজের শিক্ষয়িত্রী জীবনের সুরু করি, আর অবসর গ্রহণ করলাম প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে। বিদ্যালয়ের প্রবেশক্ষণ থেকেই নানা ছবি ও বক্তব্যের মধ্যে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের কথা শুনেছি। তখন থেকেই ইচ্ছে ছিল এই সুপ্রাচীন বিদ্যালয়ের ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠাতার কথা সকলের সামনে তুলে ধরবো। আজ সুযোগ পেয়ে কলম ধরলাম।

ডিরোজিওর ভাব শিষ্য বর্তমান কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র নিজ বাসগৃহে (বর্তমানে গৌরধাম নামে কথিত) ১৮৬০ সালে ১২ এপ্রিল মাত্র ৩২ জন ছাত্রী নিয়ে কোন্নগরের বুকে প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। স্ত্রী শিক্ষার যে বীজ তিনি নিজগৃহে সকলের অলক্ষ্যে বপন করেছিলেন তা আজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বিরাট মহীরূহে পরিণত। তিনি নিজ ব্যয়ে নিজের গাড়ীতে ছাত্রীদের আনা নেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। মাত্র মাসিক ২৫ টাকা সরকারী অনুদান তিনি পেয়েছিলেন। শিবচন্দ্র দেব নিজে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ছিলেন। কোন্নগরের গোঁড়া হিন্দু সমাজপতিদের নিঃসন্দিগ্ধ করার জন্যই সম্ভবত তিনি বিদ্যালয়টির নামের সঙ্গে হিন্দু কথাটি যুক্ত করেছিলেন। ১৮৬০ সাল থেকে '৬৫ পর্যন্ত বিদ্যালয়ের শ্রেণী সংখ্যা ছিল চারটি। '৬৬-৬৮'র মধ্যে হয় পাঁচটি, ১৮৬৯-৮৯ পর্যন্ত ছিল ছয়টি, '৯০-৯৬ সাল পর্যন্ত

ছিল ৭টি। কিন্তু '৯৭-৯৮এ আবার ছ'টিতে কমে আসে। ১৮৯৯-১৯০০ পর্যন্ত কমে হয় চারটি। কিছু কাল পরেই আবার তা বেড়ে হয় ছ'টি, এভাবে উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকে বিদ্যালয়ের জীবন। বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য কোন্নগরের সহৃদয় মানুষরা অর্থ সাহয্য করতেন। ১৮৬০ থেকে ৬৯ পর্যন্ত মাসিক দশ ও পাঁচ আনা হারে এবং ১৮৭০র পর মাসিক এক আনা হারে বেতন নেওয়া হ'ত। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই সর্বনিম্ন শ্রেণীতে মাসিক চার আনার বেশি নেওয়া হয়নি। ১৯০০ সাল পর্যন্ত প্রাপ্ত হিসেবে দেখা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ক্রমবর্ধমান।

তৎকালে উত্তরপাড়া 'হিতকরী সভা' স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ৮টি বৃত্তির ব্যবস্থা করে। এই বিদ্যায়তনের ছাত্রী শ্রীমতী বিরাজ মোহিনী দাশী প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে মাসিক ২ টাকা হারে ১ বছরের জন্য এই বৃত্তি অর্জন করেন। বিদ্যায়তনের সুখ্যাতি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ১৮৭৫ সালে ১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ জন সিনিয়ার স্কলারশিপ ও ৭ জন জুনিয়ার স্কলারশিপ লাভ করে। ১৯০০-১৯২২ বিদ্যালয়ের জীবন ছিল দুর্ভাগ্যজনক। সেই সময় নামমাত্র পরিচালন সমিতি ছিল, যার সম্পাদক ছিলেন শিবচন্দ্র দেবের ভাইপো গিরিশচন্দ্র দেব। ক্রমবর্ধমান ছাত্রী সংখ্যা, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ও স্থানাভাব সব মিলিয়ে শিবচন্দ্র দেব চিন্তিত হলেন, কিন্তু মহামানবের পথের সামনে কোন বাধাই বাধা নয়। তিনি নিজের জমির (জি, টি, রোডের পশ্চিমে) থেকে ৬ কাঠা ১০ ছটাক জমি বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণে জন্য দান করেন, এবং সেখানে নিজ ব্যয়ে প্রায় ২০০ বর্গফুট পাকা গাঁথুনির একটি চার চালা গৃহ নির্মাণ করেন পঠন পাঠনের স্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য। ১৯২২ সালে কোন্নগরের এক কৃতি সন্তান বিপিন বিহারী চন্দ্র মহাশয় বিদ্যালয়ের নোতুন ভবন নির্মাণের কাজে এগিয়ে এলেন। তিনি ১৮৭৫ টাকা ব্যয়ে ৩০০ বর্গফুট মাপের একটি নোতুন ঘর নির্মাণ করলেন পশ্চিম দিকে। এরপর কোন্নগরের বহু শিক্ষানুরাগীর দানে ও প্রচেষ্টায় ১৯৩১ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ের একতলাটি নির্মিত হয়। ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের কোন পূর্ণাঙ্গ পরিচালন সমিতি ছিল না। ১৯২২ সাল থেকে সম্পাদক ছিলেন নৃসিংহ দাস বসু মহাশয় এবং সভাপতি ছিলেন সতীশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

মহাশয়। ১৯৩৬ সালে প্রথম স্বতন্ত্র পরিচালন সমিতি গঠিত হয় এবং শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিদ্যালয়ের সংগৃহীত অর্থ ও সরকারী অনুদানের সাহায্যে দ্বিতলটি নিমিত হয় ১৯৩৮-৩৯ সালের মধ্যে। ১৯৪৩ সালে সপ্তম ও '৪৪ সালে অষ্টম শ্রেণী খোলা হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন অবনীমোহন মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি ছিলেন ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র। ১৯৪৪-১৯৫০ পর্যন্ত বিদ্যালয়টি জুনিয়ার স্তরে ছিল। ১৯৪৮ সালে কোন্নগরের সচেতন মানুষরা একটি সুচিন্তিত অভিমত প্রতিষ্ঠা করলেন যে, বিদ্যালয়টির সম্প্রসারণ ও উন্নতির নৈতিক দায়িত্ব সমগ্র সমাজের। এবং এই সময় একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। তদানীন্তন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ পরিচালন সমিতির আমূল পরিবর্তনের জন্য একটি নতুন কমিটি গঠনের প্রস্তাব দিলেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্রী ননীগোপাল বসু সভাপতি ও শ্রীসুবোধ মিত্র সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ১৯৪৯ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পঠন পাঠনের প্রচার পত্র ছাপান হল, এবং প্রধান শিক্ষিকা ও গণিতের শিক্ষিকার পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পঠন পাঠন সুরু হল এবং বিদ্যালয়টি ১৯৫০ সালের জানুয়ারীতেই উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি লাভ করলো। প্রধান শিক্ষিকার পদে যোগদান করলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী স্নেহলতা সেনগুপ্ত। কোন্নগরের সবস্তরের মানুষের আর্থিক সহযোগিতায় বিদ্যালয় ভবন সম্প্রসারণের কাজ চলতে লাগলো। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাতীরকূল নিবাসী ইন্দু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নাম। ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে ১০ হাজার টাকা সরকারী অনুদান পাওয়া গেল। কোন্নগরের অধুনালুপ্ত 'হলিডে ক্লাবের' তহবিলের ৭৫৯ টাকা ৫ আনা বিদ্যালয় তহবিলে জমা হল।

প্রতিষ্ঠাতা শিবচন্দ্র দের প্রদত্ত জমিতে স্থান সংকুলান না হওয়ায় বিদ্যালয়ের পূর্ব দিকের জি, টি, রোডের উপর পরিত্যক্ত একটি দ্বিতল বাড়ি এবং খেলার মাঠের জন্য বিদ্যালয়র পশ্চাদবর্তী ১৭ কাঠা জমির ১৪ কাঠা অধিগ্রহণের প্রচেষ্টা চলতে লাগলো। এই মর্মে দীর্ঘদিন মামলাও চলে। অবশেষে মামলার রায় বিদ্যালয়ের পক্ষে যাওয়ায় ১৯৫৫ সালের জুন মাসে খেলার মাঠের জন্য জমিটি ও পরিত্যক্ত দ্বিতল বাড়িটি বিদ্যালয়ের দখলে

আসে, ঐ বাড়িটি বর্তমানে ত্রিতল ভবনের ব্যয় নির্বাহের জন্য শ্রীমলয় কুমার দেব নগদ ১০ হাজার টাকা বিদ্যালয় তহবিলে দান করেন। সমসাময়িক যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ, শরৎচন্দ্র দেব, অনিল মুখোপাধ্যায় ও ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নামও স্মরণযোগ্য। ১৯৬৩ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। ১৯৭৪ সলে একাদশ শ্রেণী যুক্ত উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাক্রম লুপ্ত হওয়ায় এটি পুনরায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়। ১৯৮০ সালে বিদ্যালয়টি পুনরায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হয়। বিদ্যালয়ে তখন অত্যন্ত স্থানাভাব, সেই সময় বহু শিক্ষানুরাগী বিনা পারিশ্রমিকে ছাত্রীদের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানে এগিয়ে আসেন। সেই সময়ে (১৯৭২) প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী কমলা, ঘোষ, সম্পাদক শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও সভাপতি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিদ্যালয়ের বিপরীতে গঙ্গাতীরস্থ মল্লিকদের একটি জরাজীর্ণ বাড়িসহ জমিটি ক্রয় করা হয় মাত্র ১২ হাজার টাকার বিনময়ে। বাড়িটি ভেঙ্গে সেই জমির উপর নির্মিত হয়েছে আজকের সুদৃশ্য উচ্চ মাধ্যমিক ভবনটি। কোন্নগরের শিক্ষানুরাগী মানুষের দানের টাকায় পর্যায়ক্রমে নির্মিত হয়েছে কোন্নগরের বহু আশার এই উচ্চ মাধ্যমিক ভবন। কোন্নগরের কৃতী সন্তান বিপিনবিহারী মুখোপাধ্যায় এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন এবং এককালীন ২০ হাজার টাকা দান করেন।

নবনির্মিত একতলা ভবনটির দ্বারোদঘাটন করেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী ছায়া বেরা।

চলতে থাকে উচ্চ মাধ্যমিক পঠন পাঠন। এবং ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের উন্নতির কাজও চলতে থাকে। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য অনেক শিক্ষিকা নিয়োগ হয়। বিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন শ্রীমতী মনোমোহিনী দাসী (১৮৬০-৬৪) তারপর থেকে অনেক মানুষ প্রধান শিক্ষক, শিক্ষিকা, সম্পাদক, সভাপতি দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। শ্রীমতী কমলা ঘোষের পর প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বে আসেন শ্রীমতী আলো মজুমদার ১৯৮৯ সালে। এরপর ১৯৯৩ সালের মে মাসে প্রধান শিক্ষিার পদে নিযুক্ত হন শ্রীমতী মীনা বসু। বিদ্যালয়ের এর পরের ইতিহাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

কারণ সেই সময় থেকেই বিদ্যালয় ভবনের বহুবিধ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কোন্নগরের শিক্ষাসচেতন মানুষের অর্থানুকূল্যে এবং সকরকারী অনুদানে। ১৯৯৩ সালে বিদ্যালয়টি সরকারী অনুদান পায় ২৫ হাজার টাকা এবং ১৯৯৪ সালে ৫০ হাজার টাকা অনুদান পায় তৎকালীন সাংসদ শ্রীসুদর্শন রায় চৌধুরী এলাকার উন্নয়ন তহবিল থেকে। বিদ্যালয়ে মোট ১৯টি ইউনিট আছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় পাঠদান করা হয়। মোট ছাত্রী সংখ্যা বর্তমানে ১২৬০, অনুমোদিত শিক্ষিকা সংখ্যা ৪০, শিক্ষাকর্মী ৬ জন এবং ১জন গ্রন্থাগারিক আছেন। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি ছোট হলেও বেশ সমৃদ্ধ। মেয়েরা ও শিক্ষিকারা নিয়মিত বই নিতে পারেন। ১৯৯২ সাল পর্যন্ত একটি ল্যাবরেটারীতে বিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্‌টিক্যাল ক্লাস নেওয়া হত। তারপর পরিচালন সমিতি এবং প্রধান শিক্ষিকা মীনা বসুর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এখানে একে একে রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা ও ভূগোলের পৃথক পৃথক ল্যাবরেটারী নির্মাণ করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে স্থানীয় 'বিধায়ক শ্রীজ্যোতিকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে জানুয়ারী ২০০১ সালে ৫০ হাজার অনুদান পাওয়া গেছে। মেয়েদের প্র্যাকটিকাল ক্লাসের সুবিধার জন্য একটি গ্যাস প্লান্ট ক্রয় করা হয়েছে ২৫ হাজার টাকা ব্যয়ে। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যায়তনে মহাত্মার কোন মর্মর মূর্তি ছিলনা। প্রধান শিক্ষিকা মীনা বসুর উদ্যোগে এবং শিক্ষিকা, অভিভাবক, শিক্ষাকমীদের দানের টাকায় ১৯৯৮ সালের ২০শে জুলাই উচ্চমাধ্যমিক ভবন প্রাঙ্গণে মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের একটি মর্ম্মর মূর্তি স্থাপন করা হয়। এই মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি মন্ত্রী শ্রীনরেন দে মহাশয়। এই মূর্তি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ২০ হাজার টাকা। স্থানীয় বাসুদেব সরকার মহাশয় এবং বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী ছায়া দত্ত (বর্তমানে লণ্ডনে চিকিৎসা ব্রতে নিযুক্ত) উভয়েই ১০ টাকা হাজার করে দান করেন বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ তহবিলে। এছাড়াও ছোট বড় অসংখ্য দাতা এই উচ্চ মাধ্যমিক ভবনটির নির্মাণ কাজে—যথাসাধ্য অর্থদান করেছেন। বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারী নির্মাণ কাজে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক ৫ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করেছেন। বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ ল্যাবরেটরী নির্মাণ ও

অন্যান্য কাজে শ্রীগৌতম দত্ত (বাচ্চু) যে ভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তা না পেলে হয়তো এতো দ্রুত বিদ্যালয়টিকে এমন সুন্দরভাবে তৈরি হতো না। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজে সব সময়ই সক্রিয় সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন কোন্নগর পুর সভার প্রাক্তন পুর প্রধান শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায় (চনুদা)। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের সুবিধার জন্য জানুয়ারী ২০০১ এ একটি কম্পিউটার যন্ত্রও ক্রয় করা হয়েছে। বিদ্যালয় পরিচালনার কাজে সব রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন পরিচালন সমিতির সদস্যগণ। বিভিন্ন সময়ে পরিচালন সমিতিতে যাঁর সভাপতি ও সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী, গোবিন্দ চন্দ্র গাঙ্গুলী, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, নগেন মুখোপাধ্যয়, অমিতাভ মুখোপাধ্যায়, দেবকুমার চক্রবর্তী, সুবিমল ভট্টাচার্যের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা প্রত্যেকেই সদাজাগ্রত দৃষ্টি রেখেছেন বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে।

এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বছর বছর কৃতিত্বের সঙ্গে এই বিদ্যালয় ছেড়ে উন্নততর শিক্ষার জন্য বিভিন্ন জায়গায় চলে যায়। কিন্তু শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি সুদৃঢ় মধুর বন্ধন স্থাপনে এই বিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন সঙ্গীত চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তি, নাটক, বিভিন্ন খেলাধূলায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শুধু কোন্নগরে নয় রাজ্যস্তরে এমন কি জাতীয় স্তরেও কৃতিত্বের অধিকারী হয়। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের পারদর্শীতার প্রমাণ রাখে। এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগের ফলাফল ক্রমশ সন্তোষজনক জায়গায় যাচ্ছে। কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি ছাত্রী, শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের মধুর অথচ সুদৃঢ় সম্পর্কে একটি নিখুঁত ত্রিভুজের আকার ধারণ করেছে। লিখতে গর্ববোধ করছি যে একদা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা প্রয়াত সুহাসিনী সেন জাতীয় শিক্ষিকার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। উত্তরপাড়া, শ্রীরামপুর অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র এই বিদ্যালয়েই উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে কলা, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয়।

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব থেকে শুরু করে বহু শিক্ষা সচেতন ব্যক্তি বহু বছর

ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে বিন্দু বিন্দু করে এর সম্প্রসারণ ও উন্নতির জন্য কাজ করে চলেছেন তাই আজ এটি সিন্ধুর আকার ধারণ করেছে। বহু প্রতিকূলতা, উপেক্ষা, ঔদাসিন্য, সমালোচনার মধ্য দিয়ে এই বিদ্যায়তন দীর্ঘ ১৪১ বছর ধরে এগিয়ে চলেছে, ত্যাগ করেনি নিজের আদর্শ ক্ষণকালের আবেগের কাছে করেনি আত্মসমর্পণ। একবিংশ শতাব্দীতে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের ফলে মহিলারা সমাজের ও দেশর উন্নতিকল্পে নানা কাজে যুক্ত হতে পেরেছেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুগে যে প্রতিজ্ঞা সুপ্ত ছিল তা আজ দশভুজার রূপ নিয়ে কল্যাণ মূলক কাজে ব্রতী হয়েছে। এই বিদ্যামন্দিরের আলোক শিখাটি যাঁর কল্যাণ হস্তে প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল তা আজ শত সহস্র ছাত্রীর জীবনকে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত করছে। একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র গ্রাম কোন্নগর আজ শিক্ষা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলেছে এবং কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম স্ত্রী শিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে, একই সংগে প্রণতি জানাচ্ছে মহাত্মা শিবচন্দ দেবকে।

স্মরণে রাখার জন্য এই বিদ্যালয়ের প্রথম কার্যনির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা দেওয়া হল ঃ

> জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। রাজা দিগম্বর মিত্র। শিবচন্দ দেব। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়। মহেন্দ্র নাথ বসু। ক্ষেত্রনাথ বসু। রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। শম্ভুনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামচন্দ্র ঘোষাল। ত্রৈলোক্য নাথ মিত্র। অভয় চরণ মুখোপাধ্যায়। নবীন চন্দ্র মিত্র। রামচন্দ্র পালিত। গিরিশ চন্দ্র দেব (সম্পাদক) মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের ভাইপো। (সূত্র ঃ স্মরণিকা)

এর মধ্যে প্রথমজন জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার জমিদার। বাকি সকলেই তদানীন্তন কোন্নগরের অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং শিবচন্দ্রের সহকর্মী।

<u>পরিচালন সমিতি ১ জানুয়ারী ১৯২২ থেকে</u>

শতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সভাপতি

ডাঃ শরৎ কুমার দেব ঃ সহ

নৃসিংহ দাস বসু	ঃ	সম্পাদক
সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়	ঃ	সহ ”
হরিসত্য ভট্টাচার্য	ঃ	কোষাধ্যক্ষ
ননীগোপাল বসু	ঃ	সহ ”
কিশোরী মোহন ঘোষাল	ঃ	
বিভূতি ভূষণ গুপ্ত	ঃ	(প্রধান শিক্ষক)

লেখিকা—মীনা বসু
অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা
কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়

আশালতা বালিকা বিদ্যালয়

১৯৪০ সালের ১৬ই আগষ্ট তারিখে রাজরাজেশ্বরী তলা ও শম্ভু চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটের কয়েকজন অত্যুৎসাহী যুবকের প্রয়াসে আভাবতী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যুবকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ৺প্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দুর্গাপদ ঘোষাল, ৺অনাথ নাথ মুখোপাধ্যায়, অহীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও ৺শিব প্রসাদ ঘোষ মহাশয়। আভাবতী দেবী ছিলেন কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির প্রতিষ্ঠাতা হাটখোলার জমিদার স্বর্গত হরসুন্দর দাসের দৌহিত্রী কন্যা এবং ৺সুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর স্ত্রী আভাবতী দেবীর নামে বিদ্যালয়টি নামকরণ করতে সম্মত হন এবং কিছু টাকা দেবারও প্রতিশ্রুতি দেন। ইতিমধ্যে ৺দেবপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের কোন্নগরের পৈতৃক নিবাস শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের বাড়ির চারটি ঘর বিনা ভাড়ায় ব্যবহারের অনুমতি পাওয়া যায়।

দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরেই সুধীর মিত্র মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। বিদ্যালয়ের সভ্যগণের চাঁদার টাকায় শিক্ষিকাগণের সামান্য বেতন ও অন্যান্য কাজ চলে যেত। কিছু অর্থ ছাত্রীদের মাধ্যমেও সংগৃহীত হোত। কয়েক বছর পর বিদ্যালয় সম্মুখস্থ একটা জমি কেনার বন্দোবস্ত করা হয় কিন্তু টাকা কম পড়ায় ও সভ্যগণের মধ্যে এক জনের অসহযোগিতায় সে স্বপ্ন তখনকার মতো সফল হোল না। তবুও তাঁর প্রচেষ্টা চালাতে লাগলেন বিদ্যালয়ের একটি নিজস্ব বাড়ির জন্য। হঠাৎ খবর পাওয়া গেল দয়াল শিরোমণী লেনের দুলাল চক্রবর্তীর এই বাড়িটির কথা। তিনি অল্প ভাড়ায় এই বাড়িটি বিদ্যালয়কে ব্যবহারের অনুমতি দিলেন। বিদ্যালয়ের তৎকালীন সম্পাদক ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয় তাঁর পরলোকগতা পত্নী আশালতার স্মৃতিতে এক হাজার টাকা বিদ্যালয়কে দান করতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী আভাবতী বালিকা বিদ্যালয়ের আর্থিক অভাব হেতু ৺ধীরেন বাবুর প্রস্তাবে সভ্যগণ সহজেই সম্মত হন এই নাম পরিবর্তনে।

বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির প্রচেষ্টায় বিশেষ করে ঁপ্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত সরকারী অনুদান লাভ করে। ১৯৬৮ সালে তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টি জুনিয়র হাই স্কুলে উন্নীত হয়। ১৯৭০সালে তিনি পরলোক গমন করেন। ১৯৭১ সালে সরকার প্রাথমিক বিভাগ সম্পূর্ণ অধিগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র জুনিয়ার হাই বিভাগের ক্ষমতা পরিচালন সমিতির হাতে থাকে। ছাত্রী বেতন ও অতিরিক্ত বেতন বাবদ সংগৃহীত অর্থ দ্বারা বিদ্যালয়ের আর্থিক দায়িত্ব কোন রকমে সম্পন্ন হোত। সামান্য বেতনের পরিবর্তে শিক্ষিকারা আন্তরিকতার সংগে পাঠদান করতেন। ছাত্র ছাত্রীরা বেশির ভাগই আসত পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র পরিবার থেকে। ১৯৭২ সালে ঁদুলাল চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ থেকে কমদামেই বিদ্যালয় ভবনটি কেনা হয়। ১৯৭০ সালে বিদ্যালয়ের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন শ্রীবিজন বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সম্পাদক ধীরেন্দ্র নাথ মহাশয়ের মৃত্যুতে পরবর্তী সম্পাদক হন নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। বিদ্যালয় ভবন ক্রয়ের পেছনে শ্রীবিজন বিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতা চিরকাল মনে রাখার মত। নগেন বাবু, বিজন বাবু ও অভিভাবকদের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। সর্বোপরি শিক্ষিকাগণের অক্লান্ত পরিশ্রম এই বিদ্যালয়ের সাফল্যের পরিচায়ক।

ইতিমধ্যে নবম ও দশম শ্রেণী খোলার জন্য শিক্ষা বিভাগের কাছে আবেদন করা হয়, কিন্তু কোন ইতিবাচক সাড়া না পাওয়ায় স্বাধীন ভাবে নবম ও দশম শ্রেণী খোলা হয় ছাত্রীরা প্রাইভেটে ভাল ফল করা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে নবম ও দশম শ্রেণী বন্ধ হয়ে যায়। এরই মধ্যে সম্পাদক ও পরিচালক মণ্ডলীর তিন বৎসর অন্তর পরিবর্তন হয়েছে। প্রত্যেক সম্পাদকই প্রচেষ্টা চালিয়েছেন বিদ্যালয়টিকে মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত করার। এঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শিশির কুমার চক্রবর্তী মহাশয় প্রমুখ। বর্তমান সম্পাদক শ্রীদুর্গাপ্রসাদ বসু মহাশয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও শিক্ষিকাগণের সহযোগিতায় বহুদিনের পরিশ্রম সার্থক হয়। ১৯৯২ সালে আশালতা বালিকা বিদ্যালয় মাধ্যমিক বিদ্যালয় রূপে সরকারের স্বীকৃতি পায়। ১৯৯৪ সালে ছাত্রীরা প্রথম মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার অনুমতি পায়।

আশালতা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও সাফল্যের পেছনে কোন্নগরবাসীর অনেকেরই অবদান রয়েছে। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় সৃষ্টিরলগ্ন থেকেই তাঁর শুভ পরামর্শ ও সাহায্য দিয়ে এসেছেন এই বিদ্যালয়কে। বিদ্যালয়ের বেশির ভাগ ফ্যান ও বেঞ্চ তাঁরই দান। বিদ্যালয়ের উন্নয়নে শিক্ষিকরাও অনেক অর্থ দান করেছেন। ডাক্তার বাবু আমাদেরএকজন অবসরপ্রাপ্ত অভিভাবক দিয়ে.গেছেন তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীনরেন দেব মহাশয়। তিনি নীরবে আমাদের বিদ্যালয়কে বহু শ্রম দান করেছেন এবং আজও বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ আমরা পাই। শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন সভাপতি, কোন্নগর পৌরসভা) তিনিও সকল কাজে আমাদের বিদ্যালয়কে সাহায্য .করে চলেছেন। মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হবার পর সরকারে কাছ থেকে ১ লাখ টাকা এবং সাংসদের স্থানীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিল্ডিং এর জন্য পাওয়া গেছে, তা দিয়ে নোতুন শ্রেণী কক্ষ তৈরি করা হয়েছে। দিনদিন ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আরো ঘরের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে প্রাথমিক বিভাগের কালিদাস চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী স্মৃতিকণা সেনগুপ্তার সহযোগিতাও অনস্বীকার্য। সকল কোন্নগরবাসী যদি আরো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাহলে পরিশেষে বিদ্যালটিকে আরো উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

লেখিকা ঃ শিউলিকা বসু
প্রধান শিক্ষিকা

জর্জটেলিগ্রাফ ইন্‌স্টিটিউট

(১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত)

উপরোক্ত 'ইনস্টিটিউটে'র হুগলী জেলার শাখার উদ্বোধন হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৯৮ সালে, ঠিকানা ঃ ৪৩, জি,টি, রোড, কোন্নগর। এখানে শিক্ষার বিষয় ৯টি।

তথ্য ঃ শ্রী তপন হাজরা লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর ফ্রি আকাদেমি অব্ ফিলসফি

স্থাপিত ঃ ১৯৪৭

কোন্নগর সি,এস, মুখার্জী স্ট্রীটস্থ 'সূর্য কাননে' অধ্যাপক সত্যেন সাহা তাঁর নিজ উদ্যোগে দীর্ঘকাল ধরে একটি বিনা পারিশ্রমিকের আকাদেমি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানে সর্বোচ্চস্তর পর্যন্ত বহু ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষালাভ করে ভবিষ্যত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ পেয়েছে।

অধ্যাপক সাহার এই প্রয়াস শিক্ষক জীবনে এক দৃষ্টান্ত স্বরূপ। তিনি সত্যপথের যাত্রী, বৃক্ষ ও জীবের প্রতি তাঁর ভালবাসা অকৃত্রিম।

প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়

স্থাপিত ঃ ১৯৫০

যে স্থলে আজ রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে সেই স্থল প্রায় ৫৫ বছর পূর্বে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। এই অঞ্চলের জমির মালিক ছিলেন কোন্নগর বকুলতলা লেনের অধিবাসী। হীরালাল মুখার্জী, মতিলাল মুখার্জী ও অমৃতলাল মুখাজী জমিদারগণ। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর নোয়াখালিবাসী রাজেন্দ্র লাল রায় চৌধুরীর ভ্রাতা ড. মাখনলাল রায় চৌধুরী যিনি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, মুখাজী পরিবারের কাছ থেকে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড ক্রয় করে রাজেন্দ্র লাল রায় চৌধুরীর স্মৃতিতে রাজেন্দ্র নগর কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি গঠন করেন।

অঞ্চলে ধীরে ধীরে জনবসতি গড়ে উঠতে লাগল, রাস্তাঘাট হল। এই সময়ে এখানকার শিক্ষিত জনসাধারণ বিদ্যালয় স্থাপনার কথা চিন্তা করতে লাগলেন। এই সময়ে শ্রীরামপুরের রাজ্যধরপুর থেকে জে, কে, স্টীলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মী অমূল্য লাল দাস এখানে আসেন, তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়-এর পরিচয় হয়। ১৯৫০ সালে অমূল্য লাল দাস বঙ্কিমবাবুর কথামত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর বাড়িতে কয়েকটি ছাত্রকে নিয়ে বিদ্যালয় শুরু করেন। এইভাবে বিদ্যালয়ের যে অঙ্কুর রোপিত হল ভবিষ্যতে তা একদিন বৃহৎ বৃক্ষে পরিণত হয়।

ইতিমধ্যে অমূল্যবাবুর সাথে মাখনলাল বাবুর পরিচয় হয়। এই সময় রামচন্দ্র মুখার্জীর বাড়িতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিয়মিত বিদ্যালয় চলছিল।

১৯৫২ সালে মাখন লাল রায়চৌধুরী রাজেন্দ্র নগর সোসাইটির তরফ থেকে ১২ কাঠা জমি উক্ত বিদ্যালয়কে এক টাকা মূল্যে দান করেন। জমিটি বর্তমানে রাম মন্দিরের উত্তরে। এবং এই দান গ্রহণ করেন অধ্যাপক বঙ্কিম

চট্টোপাধ্যায়। নাম হয় রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়। আমগাছের তলায় চালাঘর তৈরি করে ছাত্রদের পড়া শোনা শুরু হল। ১৯৫৪ সালে সরকার অনুমোদিত উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ে উন্নীত হল। নব্বই-এর দশকে বিদ্যালয় ৫০০০০ টাকা সরকারী সহায়তা লাভ করে। ফলে বিদ্যালয়টি বর্তমান আকার ধারণ করে।

এই সময়ে গোপাল চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি আজীবন এই বিদ্যালয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে গেছেন। এই সময়ে বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কল্যাণ পরিষদের পক্ষ থেকে যে ১০ কাঠা জমি বিশেষ সর্তে বিদ্যালয়কে দান করেন সেই স্থলে বর্তমানে ত্রিতল কোন্নগরে রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয় দাঁড়িয়ে আছে।

সবশেষে ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বিদ্যালয় উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত হল, এবং বড় চালাঘর তৈরি হল।

১৯৬০ সালে সরকার ১৬০০০০ টাকা মঞ্জুর করে বিজ্ঞান, কমার্স ও হিউম্যানিটিস গ্রুপ চালু করে।

এই অঞ্চলের জমিদার ঊষা দেবী বিদ্যালয়ের নামে মামলা করেন (Title Suit) ফলে কিছু অর্থ অনাদায়ী থেকে যায়। পরে যেহেতু বিদ্যালয়, সেই হেতু মামলা খারিজ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে ১৯৭৯ সালে বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতিতে গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির প্রার্থীরা জয়যুক্ত হন। সম্পাদক হন সুকুমার ব্যানার্জী। তাঁদের প্রথম কাজ হল অসম্পূর্ণ ও ভগ্নপ্রায় বিদ্যালয় গৃহের সম্পূর্ণতা বিধান। এরজন্য শিক্ষক, অশিক্ষক, কল্যাণ পরিষদের সভ্য, প্রাক্তন ছাত্র ও জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রায় ৪০০০০ টাকা ব্যয় করা হয়। ছাত্রদের পঠন পাঠনের কাজও সুবিধা হয়। এরপর সমিতি ড. মাখন লালের স্ত্রী ও কন্যা অধ্যাপিকা মালবিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তাঁদের মাধ্যমে রাজেন্দ্রলালের ইংলণ্ড প্রবাসী পুত্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়। রাজেন্দ্র লালের পুত্র (দীপক রায় চৌধুরী) বিদ্যালয়ের তহবিলে অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

অবশেষে ১৯৯৯ সালে রাজেন্দ্রলালের পুত্রবধূর কাছ থেকে স্বামীর প্রতিশ্রুতিরার্থ প্রায় এক লক্ষ আটাশ হাজার টাকা পাওয়া যায়। সেই টাকায়

বিদ্যালয়ের বর্তমান সম্পাদক পূর্ণেন্দু গুহ ঠাকুরতার নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে ভবনের ত্রিতলের কক্ষগুলি নির্মিত হয়। এছাড়া জেলা পরিষদের সভাপতির নিকট থেকে ১,৫০০০০ টাকা লাভ হয়।

১৯৫৪ সালে বিদ্যালয়ের প্রথম কার্যনির্বাহী সমিতিতে সভাপতি ও সম্পাদক পদে যথাক্রমে ড. মাখনলাল রায় চৌধুরী ও অধ্যাপক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৭৯ সালে সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ১৯৮২ সাল পুর্ণেন্দু গুহ ঠাকুরতা সম্পাদক হন। বর্তমানে তুলসীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন। এই বিদ্যালয়ের স্থাপনা ও অগ্রগতিতে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন—ড. মাখন লাল রায় চৌধুরী, ড. অমল রায় চৌধুরী, অধ্যাপক বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী, রাজেশ্বর ধর, অমূল্য লাল দাস, বিজয় কুমার নন্দী, উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত (প্রধান শিক্ষক), তেজেন্দ্র লাল বড়ুয়া (প্রধান শিক্ষক), জগন্নাথ ভট্টাচার্য (প্রধান শিক্ষক), দেবকুমার মিত্র (প্রধান শিক্ষক), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), পূর্ণেন্দু গুহঠাকুরতা (সম্পাদক), গোপাল চট্টোপাধ্যায় (শিক্ষক)।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

রামেন্দ্র পাঠভবন

স্থাপিত ঃ ১৯৭২

কোন্নগর পুরসভার চোদ্দ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এটি একটি পশ্চিম বঙ্গ সরকার পোষিত প্রাইমারি ইউনিট গ্রন্থাগার ক্রাইপার রোড ও ডাঃ এস. পি. মুখার্জী ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের নিকটে এর অবস্থান। এর যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ১০৬ সি, ক্রাইপার রোড, কোন্নগর, হুগলি।

কোন্নগরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্রষ্টা শ্রীমতী সাবিত্রী রায় তাঁর প্রয়াত পিতা ৺রামেন্দ্র নাথ রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে ১৯৭২ সালে নিজস্ব বাস ভবন সংলগ্ন জমিতে গ্রন্থাগারটি প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীমতী রায় তাঁর নিজের অর্জিত অর্থে পৌনে তিন কাঠা জমির উপর ১৮০১ বর্গফুটের একটি একতালা পাকা বাড়ি নির্মাণ করে প্রাথমিক ভাবে নারী ও শিশুদের শিক্ষাচর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে গ্রন্থাগারটির কাজ শুরু করেন। পরবর্তী কালে উল্লিখিত জমি-বাড়ি সহ যাবতীয় গ্রন্থাগারের সম্পত্তি তিনি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারকে দান করেন। রাজ্য সরকার ১ এপ্রিল ১৯৮১ থেকে অধিগ্রহণ করার পর এটি সাধারণের গ্রন্থাগার রূপে পরিচিত হয়। গ্রন্থাগার কমিটির পুণনির্মাণ ও দ্বিতলের সিড়ি ও সভাকক্ষ নির্মাণের জন্য মোট ২.৫০ ০০০ টাকা (আনুমানিক) বিভিন্ন সংস্থা থেকে দান হিসাবে পাওয়া গেছে। সংস্থাগুলি হল রাজ্য সরকার, রাজা রামমোহন রায় ফাউণ্ডডেশন, সংসদ সুদর্শন রায় চৌধুরীর এলাকা উন্নয়ন তহবিল। বর্তমানে কোন্নগর ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষ গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করেন। এর পৃথক শিশু বিভাগ ও নিঃশুল্ক পাঠকক্ষ বিভাগ বর্তমান।

৩১মার্চ ২০০০-এর হিসাব অনুযায়ী গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার। এছাড়া পুরাতন পত্র-পত্রিকা যথাসাধ্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা

করা হয় যা গবেষক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠক পাঠিকাদের প্রয়োজন মেটায়। দৈনিক সংবাদপত্র ও সদ্য প্রকাশিত বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা গ্রন্থাগারে নিয়মিত ভাবে রাখা হয়। এগুলি গ্রন্থাগারের সদস্য এবং সদস্যা নন যে কেউ বসে পাঠকক্ষে পড়তে পারেন। বর্তমানে গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ৩৫০ জন। এছাড়া বিভিন্ন প্রয়োজনে বহু প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারটি দ্বিতলে নির্মিত সভাকক্ষে নানা অনুষ্ঠান করে থাকে। সভাকক্ষে প্রায় ২৫০ জন মানুষের বসার ব্যবস্থা আছে।

প্রতিবেদক ঃ শরদিন্দু ভুঁইয়া

গ্রন্থাগারিক

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী
এণ্ড ফ্রি রিডিংরুম

শিক্ষা প্রসারে বিদ্যালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের যে একটি ভূমিকা আছে সে কথা উপলব্ধি করে উনিশ শতকের মধ্যভাগে কোন্নগরবাসীরা গড়ে তুলেছিলেন গ্রন্থাগার। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর শিক্ষা ও আদর্শে অনুপ্রাণিত শিবচন্দ্র দেব স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এ্যাংলো ভার্ণাকুলার লাইব্রেরী। কোন্নগর-যা বর্তমানে কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এন্ড ফ্রি রিডিং রুম নামে পরিচিত। স্থানীয় জন সাধারণের চাঁদায় কোন্নগর ইংরাজী বিদ্যালয় (বর্তমানে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়) এর দ্বিতলে ঘর তৈরী করে গ্রন্থাগারের কাজ শুরু হয়েছিল। সেই দিনটা ছিল ১৮৫৮র ১লা এপ্রিল।

সেই থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এই গ্রন্থাগার সাধারণের মধ্যে পরিষেবা দিয়ে আসছে। ১৯২৬ এব শেষ দিকে গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ ২৬৫২ টাকা ১৪ আনার বিনিময়ে নিজস্ব.একটি জমির মালিকানা প্রাপ্ত হয়, যার পরিমাপ প্রায় ১৭ কাঠা ১১ ছটাক। এই জমির একটা অংশ ১০ কাঠা ১০ ছটাক ৩৬ স্কোয়ার ফুট ১৯২৯এ কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ককে ১৩৪০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। এই জমিতেই কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক অবস্থিত।

গ্রন্থাগারের দ্বিতল ভবন ও শিবচন্দ্র সভাকক্ষ যা আমরা দেখতে পাই তা একবারে তৈরি হয়নি। স্থানীয় জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। ১৯৬২র আগষ্ট মাস থেকে পঃ বঃ সরকার পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগার (শহর গ্রন্থাগার) হিসাবে স্বীকৃতি পায়। সরকার পোষিত গ্রন্থাগার হওয়ার পর গৃহ সংস্কার খাতে কিছু সরকারী অনুদান পাওয়া গিয়েছিল। গ্রন্থাগার ভবনের প্রথম অংশটির দারোদঘাটিত হয়েছিল ১৬ই জুন ১৯২৯।

রাজ্য সরকার পোষিত সাধারণ (শহর) গ্রন্থাগার হওয়ার জন্য চারজন কর্মীর বেতন ও পরিচালন ব্যয় বাবদ অর্থ সরকার দিয়ে থাকেন। বাড়ীতে বই নিয়ে যাওয়ার জন্য সভ্যরা পূর্ববৎ মাসিক চাঁদা দিয়ে থাকেন।

১৮৫৮ থেকে গ্রন্থাগারটি স্থানীয় জন সাধারণের পাঠতৃষ্ণা নিবারণে সহায়তা করে আসছে। ইংরাজী বিদ্যালয়ে অবস্থানকালে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষক মহাশয়রা গ্রন্থাগারের সভ্যপদ গ্রহণ করতে পারতেন। অবশ্য সেই সময় নভেল জাতীয় কোন বই ছাত্রদের দেওয়া হত না।

নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৯৩৫ সালে গ্রন্থাগারে শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগ খোলা হয়। শ্রীরামপুর রোটারি ক্লাবের সহায়তায় ১৯৬৪ তে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য এখানে একটি পাঠ্য পুস্তক শাখা খোলা হয়েছিল। উক্ত শাখা দুটির জন্য সভ্যদের কোন চাঁদা দিতে হয় না, ১৯৮৯ সাল থেকে রোটারি ক্লাব অনুদান বন্ধ করে দেওয়ার ১৯৯১ থেকে পাঠ্য পুস্তক শাখাটি বন্ধ অছে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আরও একটি পাঠ্য পুস্তক শাখা চালু করা হয়। প্রয়াত দন্ত চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জীর স্মৃতি রক্ষার্থে তদীয় ভ্রাতা প্রখ্যাত নট বিপিন বিহারী মুখার্জী উক্ত শাখাটির জন্য এক কালীন পাচ হাজার টাকা দান করেছেন। ১৯৭৪ সাল থেকে এই শাখা পাঠদের পরিষেবা দিয়ে আসছে। এই শাখার বই পাঠকরা বাড়ীতে পড়ার জন্য নিতে পারে না। শাখাটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক। সম্প্রতি শুধু মাত্র ইতিহাস বিষয়ক বই নিয়ে আরও একটি সংগ্রহ গড়ে উঠছে গ্রন্থাগারের প্রাক্তন সভাপতি প্রয়াত ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সহধর্মিনী শ্রীমতী গৌরীদেবী, পুত্র ডাঃ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুত্র বধূ শ্রীমতী মিতা দেবী ১৯৯৯ সাল থেকে এই শাখাটিকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন, তাঁদের আবেদন ক্রমে পাঠ কক্ষে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় স্টাডি কর্নার নামে আসন চিহ্নিত করা আছে।

কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরীর বর্তমান সভ্য সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। সভ্যরা সাধারণ বিভাগের বই বাড়ীতে পড়ার জন্য নিয়ে যেতে পারেন। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র তালিকাভুক্ত সভ্যদেরই পরিষেবা দেয না। অবৈতনিক পাঠ কক্ষটি যে কোন ব্যক্তি পাঠের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। দৈনিক গড়ে প্রায় ৮০ জন ব্যক্তি পাঠ কক্ষটি ব্যবহার করে থাকেন।

গ্রন্থাগারের বর্তমান সংগ্রহ প্রায় ৩০০০০ গ্রন্থ ও বাঁধানো পত্রিকা। বয়সের অনুপাতে গ্রন্থাগারের সংগ্রহ হয়তো কিছু কম মনে হতে পারে। এর কারণ সহজেই অনুমান করা যায়। স্থানীয় জনসাধারণের ব্যক্তিগত দান ও গ্রন্থাগারের

সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় সংগ্রহটি গড়ে উঠেছে। কোন জমিদার বা ভূস্বামীর ব্যক্তিগত সংগ্রহ দান হিসাবে এখানে কোন দিন আসেনি।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহে বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকা আছে যা অন্যন্য গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় না। উৎসাহী বহু গবেষক এজন্য এই গ্রন্থগারে আসেন। অতীতে রায় বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিচেরী শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শিশির কুমার মিত্র (এক সময় পরিচালন সমিতির সদস্যও ছিলেন) হর প্রসাদ মিত্র সাম্প্রতিক কালে ড. নরেশ চন্দ্র জানা, ড. শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়, ড. মৃদুল বসু। অধ্যাপক কৃষ্ণপদ মজুমদার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তথ্য সংগ্রহের জন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এই ধারা অব্যাহত আছে। নিয়মিত বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী গবেষক ও পাঠকগণ এখানে এসে থাকেন। এখানকার সংগৃহীত পত্র পত্রিকার মধ্যে বঙ্গদর্শন, বঙ্গবাণী, প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, মানসী ও মর্মবাণী, নবভারত, সুপ্রভাত, ভারতী, তত্ত্ববোধিনী, নারায়ণ, বামাবোধিনী, কায়স্থ সমাজ, আর্য কায়স্থ, পন্থা, মডার্ণ রিভিউ, এডিন বার্গ রিভিউ, জার্নাল অফ দি ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোয়েশন, ঢাকা রিভিউ, বেঙ্গল ম্যাগাজিন প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য।

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বিভিন্ন সময় এই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করে গেছেন। স্থানাভাবে তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হচ্ছে না। উৎসাহী পাঠক লেখকের, উনিশ শতকের কোন্নগর ও কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী, গ্রন্থটি দেখতে পারেন।

আর্থিক সংগতির অভাবে গ্রন্থাগারের মূল সম্পদ গ্রন্থ রক্ষণাবেক্ষন ব্যবস্থা যথাযথ নয়, এখনই উদ্যোগ নিতে না পারলে অতীতের অনেক কিছুই হারিয়ে যাবে যা আর পূরণ করা সম্ভব হবে না।

প্রতিবেদক ঃ অমর নাথ চট্টোপাধ্যায়
গ্রন্থাগারিক

রাজেন্দ্র নগর লাইব্রেরী

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৬০

ঠিকানা ঃ ৮৬ রামমোহন প্লেস, কোন্নগর

প্রতিষ্ঠাতা ঃ প্রয়াত পরেশ চন্দ্র সেনগুপ্ত

" মাখন লাল গুপ্ত চৌধুরী

" বিশ্বেশ্বর দাশগুপ্ত

শ্রী বিমলেন্দু চন্দ্র

" রাধা গোবিন্দ ভুঁইয়া

মাঝে বেশ কিছু দিন রাজেন্দ্র নগর লাইব্রেরী বন্ধ থাকার পর পুনরায় এই লাইব্রেরী চালু হয়। প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যেও বর্তমানে সপ্তাহে বুধবার ও শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টায় এই লাইব্রেরী খোলা থাকে। পূর্বে এই গ্রন্থাগার কোন্নগর পুরসভা থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করত

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বিনয় কৃষ্ণ পাঠমন্দির

কোন্নগর আরবান ডেভেলপ্‌মেণ্ট এ্যাণ্ড রিলিফ অরগানাইজেশন (KUDRO)-এর প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় সি. এস. মুখার্জী স্ট্রিটে তাঁর পৈত্রিক বাসগৃহে অবস্থিত নিজের চিকিৎসা কক্ষের দ্বিতলে KUDRO-র অর্থে একটি প্রশস্ত কক্ষ নির্মাণ করেন। তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারের প্রায় সমস্ত বই ও পত্র পত্রিকা দান করেন তাঁর পিতৃব্য শিক্ষানুরাগী বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়েব স্মৃতিতে। ওই কক্ষে "বিনয়কৃষ্ণ পাঠ মন্দির" স্থাপন করেন ১৯৯২ সালের ২৪ অক্টোবর। KUDRO-র অছি পরিষদ এই পাঠ মন্দিরের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে। এখানে বসে বই পড়াব ব্যবস্থা আছে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ মাঝে মাঝে এখানে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ধর্মীয় আলোচনার অনুষ্ঠান করে। বর্তমানে পরিচালক মণ্ডলীর সভাপতি শ্রী গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সম্পাদক শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায়।

সূত্র ঃ শ্রীসুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা। লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

হানাফী লাইব্রেরী

প্রয়াত হানীফ মহম্মদ ঊনবিংশ ও শতাব্দীর ক্রান্তিকালে জন্মগ্রহণ করেন করাতি পাড়ায় (বর্তমানে মুসলপাড়া লেন)। সেই সময়ে এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষার আলোক এসে পৌছায়নি। সেই সময়ে কয়েজন যুবক যথা লাল মহম্মদ, মোসলেম আলী, আব্দুল মোমিন প্রভৃতি হানীফ মহম্মদের নেতৃত্বে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের এবং বয়স্কদের অবৈতনিক শিক্ষাদানের জন্য একটি কুঁড়ে ঘরে পাঠশালা প্রতিষ্ঠা করে তাদের পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। কিছু কিছু ধর্মীয় ও নীতি শিক্ষামূলক পুস্তক পাঠ্য হিসাবে সংগ্রহ করা হয়। ৩০ বছর বয়সে হানীফ মহম্মদের অকাল মৃতুর পর তাঁর সতীর্থরা ১৯৩৩ সালে তাঁর স্মৃতিতে পাঠশালায় একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করে, নাম হয় 'হানাফী লাইব্রেরী'।

তারপর বিভিন্ন সময়ে নানা অনুরাগী ব্যক্তির গৃহে পাঠাগার বারবার স্থানান্তরিত হয়। এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সদস্যরা ও বিভিন্ন ব্যক্তির প্রচেষ্টায় পাঠাগারের পুস্তক সংখ্যা বাড়তে থাকে। ষাটের দশকে এই পাঠাগারের পুস্তক প্রায় দেড় হাজারে পৌছয়। ঐ সময়ে পাঠাগারের সংগ্রহে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ করে রুশ সাহিত্যের সংগ্রহ সংখ্যা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়।

অবশেষে পাঠাগারের নিজস্ব গৃহের অভাব খুবই অনুভূত হয়। তখন ১৯৮১ সালের মার্চ মাসে প্রয়াত লাল মহম্মদের পুত্রগণ সফিক উদ্দীন, রফিক উদ্দীন, ও ইয়াকুব আলী এক খণ্ড জমি দান করেন তাঁদের পিতা ও পিতৃব্য লাল মহম্মদ ও মোসলেম আলীর স্মৃতিক্ষার উদ্দেশ্যে এবং ঠিক হয় পাঠাগার গৃহের নাম হবে "লাল-মোসলেম মেমোরিয়াল হল"।

জনহিতকারী ও খেলাধূলার প্রতিষ্ঠান ওয়াই, এম, এর কর্মীগণ এবং কোন্নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন সংগঠনের ঐকান্তিক সহযোগিতা ও

দানে ২৩/৭/১৯৮২ তারিখে পাঠাগার কক্ষের "লাল মোসলেম মেমোরিয়াল হলের" দ্বার উদঘাটন হয়।

উল্লেখ্য যে, একতলায় হানাফী লাইব্রেররী ও দ্বিতলে ভ্রাতৃপ্রতিম সংস্থা Y.M.A (১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) এর কক্ষ। এই দুইটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে অর্থ সংগ্রহ হয়। এছাড়া ১৪.১২.১৯৮৪ সালে এক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে গ্রন্থাগারের তহবিলে অর্থ সংগৃহীত হয়। তাছাড়া প্রয়াত বিপিন মুখোপাধ্যায়, তারক দাস চট্টোপাধ্যায়, টি, এ, বাইতি (কয়ের ফেল্টের) প্রভৃতির আথিক দান উল্লেখযোগ্য। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত হরি-প্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট থেকেও বছরে বছরে অনুদান পাওয়া গেছে। কোন্নগর পুরসভাও বার্ষিক অর্থ সাহায্য করে আসছে দীর্ঘদিন।

ইহা ব্যতীত লাইব্রেরীর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায়, রথিন চক্রবর্তী, অজিত বাগ, বিষ্ণু দত্ত, বাসুদেব ইন্দ্র, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (অমিত), নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বর্তমানে কোন্নগরের মধ্যে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পাঠাগার। পুস্তক সংখ্যা প্রায় ৩৩০০। সভ্যসংখ্যা ২০০। এছাড়া বিভিন্ন সংবাদ পত্র, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকা পাঠককে রাখা হয়।

.

সূত্র ঃ হানাফী লাইব্রেরীর পক্ষে সভাপতি ইয়াকুব আলীর প্রতিবেদন ও ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত সুবর্ণ জয়ন্তীর স্মরণিকা।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

চক্রশ্রী

স্থাপিত ঃ ১৯৬০

১৯৬০ সালে R\R Deptt ৫২৬নং প্লটের উপর প্রায় ৩ কাঠা ১২ ছটাক জমির উপর 'চক্রশ্রী' ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমত খেলাধূলা ও কিছু সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ঐ ভূখণ্ডে অঞ্চলের অধিবাসী-বৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় একটি 'পূজা মণ্ডপ' তৈরি হয়। দ্বারিক জঙ্গল রোডের ঐ পাড়া এখন 'চক্রশ্রী' পাড়া বলে পরিচিত। পরবর্তীকালে মণ্ডপে অঞ্চলের সার্বজনীন শারদোৎসব ও শ্যামাপূজা ক্লাব সদস্যদের সমবেত প্রচেষ্টায় পরিচালিত হোত, আজো তা সমারোহে চলছে। প্রথমে ফুটবল খেলা ও বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হোত অঞ্চলের "খান চ্যাটার্জী" পরিবারের একটি বড় ভূখণ্ডে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে বিভাজনের ফলে আজ আর সেই মাঠ নেই। অতীতে এই ক্লাবের খেলাধূলায় বেশ সুনাম ছিল, তার প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায়, কয়েকবছর আগে কোন্নগর পৌরসভা পরিচালিত প্রয়াত কমিশনার "গোলাম" স্বর্ণকাপে অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে। অতঃপর বিগত দশকের প্রারম্ভে ক্লাবের কর্মকাণ্ডের একটা বিরাট পরিবর্তন লক্ষিত হয়। এই সময়ে সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়, যথা নাটক, আবৃত্তি শিক্ষা, শিশুদের নিয়ে ব্রতচারী নৃত্য শিক্ষা, ব্যাণ্ড বাজনা শিক্ষা, অঙ্কণ শিক্ষা প্রভৃতি। এছাড়া প্রতি বছর রবীন্দ্র, নজরুল জন্মোৎসব এবং জাতীয় দিবসগুলি যথোপযুক্ত ভাবে পালন করা হয়। সর্বোপরি সমাজ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রক্তদান শিবির নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

কোন্নগরের বেশ কয়েকজন গুণী ব্যক্তিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও আজীবন সদস্যপদে ভূষিত করা হয়। সর্বশেষে অঞ্চলের সমস্ত শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধার জন্য ১৯৯৮ সালের ১৫ই আগষ্ট, একটি বিশেষ দিনে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর শ্রেণী পর্যন্ত জয়েন্ট এন্ট্রান্স

পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনে একটি Text Book Study Library নোতুন গৃহের উদ্বোধন হয় অঞ্চলের বিশেষ গুরগ্রাহী শ্রী বীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস মহাশয়ের প্রেরণায়। আরো উল্লেখ্য, এ ব্যাপারে সমগ্র কোন্নগর ও বাইরের কিছু সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্য পাওয়া যায়, তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য শ্রী আর, এন ঘোষ, সভাপতি লায়নস ক্লাব, রিষড়া, সভাপরি লায়নস ক্লাব শ্রীরামপুর, ৫২০নং পুকুর কমিটি, করপোরেশন অফ ক্যালকাটা এবং অন্যান্য।

চক্রশ্রী'র বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০ এবছরে (২০০০ সালে) মহিলা সদস্য পদ চালু হয়েছে।

প্রতি বছর ক্লাবের আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য একটি বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় (যাত্রানুষ্ঠান, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, লটারী ইত্যাদির মাধ্যমে)। এই সব অনুষ্ঠান অতীতে অনুষ্ঠিত জোড়া পুকুর মাঠ, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন মাঠ, চলচ্চিত্রম সিনেমা হল, ও কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বোধন

স্থাপিত ঃ ১৯৮১

প্রতিষ্ঠানের কর্মধারা সাহিত্য-সংস্কৃতি। বিশেষভাবে আবৃত্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠান।

চড়কতলা অঞ্চলের এই সংস্থা আঞ্চলিক জেলা ও রাজ্যস্তরে রাজ্য যুব উৎসব, রবীন্দ্র উৎসব, বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব, বইমেলা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করে সুনাম অর্জন করেছে।

সংস্থার নিবেদন—একক, দ্বৈত ও সম্মেলক আবৃত্তি, নৃত্য মূকাভিনয়, নৃত্যনাট্য, সঙ্গীত, গণ সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক সংগীত, লোক সঙ্গীত, রবীন্দ্র-নজরুল, সুকান্ত ইত্যাদি।

উল্লেখ্য প্রযোজনা—খামরের গপ্পো. নৃত্যনাট্য ঃ জন হেনরী, চণ্ডালিকা প্রভৃতি।

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও অধ্যক্ষ ঃ বিশ্বজিত সিনহা।

সূত্র ঃ বিশ্বজিত সিনহা-র প্রতিবেদন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

প্রগতিশীল যুব সঙ্ঘ (সঙ্গীত নাটক বিভাগ)

পঞ্চাশের দশকে, ১৯৫০-৫১ সালে কোন্নগরে কলকাতার আই, পি, টি, এর অনুসরণে এই সংস্কৃতি বিভাগ স্থাপিত হয় তরুণ বসু, নিতাই গোস্বামী, শ্যামল ভট্টাচার্য, মিনতি রায় চৌধুরী, অমিয় দাস প্রভৃতিকে নিয়ে। তরুণ বসু সম্পাদক হন। ৪৬ লেনিন সরণি ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে গণ সঙ্গীত ইত্যাদি শিক্ষালাভ করে। সংস্থার সভ্যরা নাটক অভিনয়ের শিক্ষার জন্য ভদ্রকালী নাট্যচক্রের ছানু, অনুপকুমার, মৃণাল সেন, বাসুদেব পাল প্রভৃতির সঙ্গে যোগাযোগ করে নাট্যাভিনয় শিক্ষা করে।

এই সংস্থা কোন্নগরে এবং কোন্নগরের বাইরে বিভিন্ন স্থানে 'শেষ কোথায়' নবান্ন, রাহুমুক্ত প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে। এবং গণসঙ্গীত ব্যতীত রবীন্দ্র সংগীত নজরুল গীতি, পরিবেশন করত।

প্রায় ১০/১২ বছর এই প্রতিষ্ঠান সক্রিয় থেকে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

সূত্র ঃ তরুণ বসু, নিতাই গোস্বামী, গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর গণ সংস্কৃতি সংঘ

(স্থাপিত ঃ ১৯৮৪)

গত ১৪.১০.৮৪ তারিখে কোন্নগরে কয়েকজন সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ এক সভায় মিলিত হয়ে ভারতীয় গণ সংস্কৃতি সংঘের কোন্নগর শাখা গঠন করে। মোট ২০ জনকে নিয়ে এক কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়। সভাপতি হন বিষ্ণু দত্ত, সহঃ সভাপতি—অমিতাভ চক্রবর্তী ও ইয়াকুব আলী এবং সম্পাদিকা স্বাগতা বসু। আটজনকে নিয়ে উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয়, যার মধ্যে গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ দাশগুপ্ত, ভূপেন মজুমদার প্রমুখেরা থাকেন।

কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় গণসঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল ও সুকান্তগীতি এবং আবৃত্তি ও নৃত্য শিক্ষা। মূল ভিত্তিভূমি স্থির হোল—যুগ যুগ সঞ্চিত সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যকে রক্ষা, বিকাশ ও জনগণের মধ্যে সুষ্ঠু সংস্কৃতি প্রসারের জন্য আসমুদ্র হিমাচল ভারতেব ঐক্য ও সংহতিকে রক্ষার জন্য পরমাণু অস্ত্রমুক্ত সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার জন্য যে সংস্কৃতি জনগণের জীবনের ও সংগ্রামের সাথী তার প্রতি এই সংঘ দায়বদ্ধ।

সংঘ নিম্নলিখিত কার্যসূচি সাধিত করে—(১) ২২.৪.৮৫ তারিখে Fire service workers' Union এর বাৎসরিক সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন (২) মে দিবসে কোন্নগরে যুব উৎসবের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ, গণ সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ, পুরসভা পরিচালিত যুব উৎসবের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। (৩) ১৯৮৫ সালে কোন্নগর টাউন হলে সঙ্ঘের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এরপর ১৯৮৬ সালে ১৯-২০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় গণ সংস্কৃতি সংঘের রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রথীন্দ্র মঞ্চে। সেখানে কোন্নগর শাখার পক্ষ থেকে সভাপতি সহ ৪ জন অংশ নেয়।

সম্মেলনের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন কবি কাইফী আজম, রুমা গুহ ঠাকুরতা, তৃপ্তি মিত্র প্রমুখ খ্যাতিমানরা।

সংঘের উদ্যোগে কয়েকটি অনুষ্ঠানের কথা— তারাপদ ভট্টাচার্যের গৃহে ঘরোয়া আসর এবং কোন্নগর বিনোদ ভবনের সংস্কৃতি উৎসব। এই উৎসবে হুগলী জেলার শিল্পীগণ এবং প্রথিতযশা শিল্পী দীপা মুখোপাধ্যায় গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরবর্তীকালে আঞ্চলিক শাখার নামকরণ হয় 'প্রত্যয় সংস্কৃতি সংঘ'।

প্রায় দশ বছর সক্রিয় থাকার পর এই প্রতিষ্ঠানের কার্যধারা অবলুপ্ত হয়।

এতদিন পরে এই সংস্কৃতি সঙেঘর ইতিহাস লেখার সময়ে স্বভাবতই মনে আসে আজ সংস্কৃতি কর্মীদের ঐক্যকে গড়ে তুলে ও সৃজনশীল শক্তিতে সমৃদ্ধ হয়ে সংগ্রামী জনতার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরা আমাদের স্বনির্ভর অর্থনীতি ধ্বংস করার বিশ্বায়নের ফেরীওয়ালা এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও ইতিহাস বিকৃতকারী নয়া ফ্যাসীবাদী শাসকগোষ্ঠীকে পরাভূত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকতে হবে এবং আমাদের প্রাচীন বহুত্ববাদী যুগ যুগ ধাবিত সংস্কৃতিকে রক্ষা ও প্রবর্তন করতে হবে।

সূত্র ঃ পুরাতন কাগজপত্র লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

শক্তি সঙ্ঘ (কোন্নগর)

১৯৩৪ সাল নাগাদ প্রয়াত নির্মল চন্দ্র মিত্রের বাড়ির বাইরের ঘরে সরল মিত্র, অনিল মিত্র, ফণীন্দ্র মিত্র প্রমুখেরা ব্যায়াম এবং সামনের মাঠে লাঠিখেলা, ছোরা খেলা প্রভৃতি শুরু করে এবং সংগঠনের নাম হয় শক্তি সঙ্ঘ। এর কিছু দিন পরে বিমল বসু ও কমল বসুর বাড়ির বাইরের ঘরে 'বয়েস লাইব্রেরী, নাম দিয়ে একটা পাঠাগারের সূচনা হয়। একটা পুরাতন কাঠের আলমারি ও কিছু শিশুপাঠ্য বই দিয়ে পাঠাগার শুরু হয়। এরপরে কিছু নোতুন বই কেনা হয় এবং কমল বসু কিছু মূল্যবান পুরাতন বাংলা ও ইংরাজী বই জোগাড় করে দেন। গ্রন্থাগারিক হন পঞ্চানন ব্যানার্জি (বকুলতলা লেন)। শিবপদ চ্যাটার্জী, তারক দাস চ্যাটার্জী, পঞ্চানন বসু মল্লিক, কমল চ্যাটার্জী, বিষ্ণু দত্ত, প্রবোধ দত্ত, বলরাম পালিত প্রমুখ তরুণগণ এসে যোগ দেন। এই ভাবে শক্তি সঙ্ঘের দুই শাখা খেলাধুলা ও ব্যায়াম এবং পাঠাগারের মধ্য দিয়ে বিদ্যাচর্চা শুরু হয়।

কিছুদিন পরে সঙ্গের উদ্যোগে এক আবৃত্তি, ছোট গল্প ও প্রবন্ধ রচনা এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আশপাশের অঞ্চলের প্রতিযোগীরা এতে অংশ গ্রহণ করে। এর পর বাৎসরিক অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, সঙ্গীত ও রবীন্দ্র নাথ রচিত শারোদৎসব নাট্যাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সেতারবাদিকা রেণুকা সাহা সেতার বাদন করেন।

অর্থ সংগ্রহের জন্য এর পর চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এবং তিনখানি ছায়াছবি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হয়। আট শত টাকার মতো টিকিট বিক্রি হয় ও চার শত টাকার বেশি লাভ। অনুষ্ঠানে এই সাফল্যে সংঘের খুবই সুনাম হয় এবং কোন্নগরের বিভিন্ন এলাকার যুবকরা এসে সভ্য হয়।

এরপর সঙ্ঘের ভলিবল খেলা শুরু হয়, এবং এই বিভাগে সঙ্ঘ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। একাধিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করে সঙ্ঘ জয়ী হোয়ে

পুরস্কার লাভ করে। সঙ্ঘ বেঙ্গল ভলিবল এসোসিয়েশনের সভ্য হয় ও এসোসিয়েশন পরিচালিত লীগে শক্তি সঙ্ঘ বি ডিভিসনে প্রথম বর্ষে জয়ী হয়। সঙ্ঘ নিজেও একটি ট্রফি চালু করে। এই প্রসঙ্গে বলা চলে—কোন্নগরে ভলিবল খেলা প্রচলনে শক্তি সঙ্ঘ পথ প্রদর্শক।

শক্তি সঙ্ঘ নিশিভূষণ মুখার্জীর অব্যবহৃত ভবনে প্রশস্থ জায়গায় স্থানান্তরিত হয় ও এখানেই দীর্ঘদিন সঙ্ঘের কার্যকলাপ চলে। এখানের প্রাঙ্গণে সঙ্ঘের অনেক নাটক হয়—তার মধ্যে 'সীতা' উল্লেখের দাবি রাখে। এই নাটকে প্রখ্যাত অভিনেতা নৃপেন গাঙ্গুলী (চন্দননগর), বলাই ঘটক, সুবোধ মুখার্জী প্রমুখেরা অংশ গ্রহণ করেন।

একবার জমি লিজ নিয়ে সঙ্ঘগৃহ নির্মাণের অসফল প্রচেষ্টা হয়।

সঙ্ঘ অনেক স্থানে ঘুরে অবশেষে স্থিত হয়। প্রয়াত ননীগোপাল বসুর প্রচেষ্টায় ও মধ্যস্থতায় নিশিভূষণ মুখার্জীর একখণ্ড জমি ক্রয় করা হয়, এখানেই শক্তি সঙ্ঘের বর্তমান গৃহ, পরে দ্বিতল তৈরি হয়। এই তৈরির ব্যাপারে হাওড়া সমাজের 'লোহার জাল', 'দেবীলাল' ও 'নদের নিমাই' যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করে অর্থ সংগৃহীত হয়। অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে সঙ্ঘের সভ্যদের সঙ্গে প্রয়াত অতুল বসু ও রবীন্দ্র নাথ মুখার্জী বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। সেটা ১৯৫৪/৫৫ সালের কথা।

দীর্ঘদিন সঙ্ঘ একখানি হাতে লেখা পত্রিকা 'শক্তি' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিল। বর্তমানে গ্রন্থাগার বিভাগটি নিয়মিত চালু আছে। দীর্ঘদিন ধরে পুরসভা থেকে বার্ষিক অর্থ সাহায্য পেয়ে আসছে। একবার বিশেষ উপলক্ষে সরকার থেকে বেশ কিছু টাকা লাভ করে।

এখানে সংস্কৃতি চর্চার কথা উল্লেখ করা যায়। স্বাধীনতা লাভের কিছু দিন পূর্বে কংগ্রেসে সাহিত্য সঙ্ঘ 'অভ্যুদয়' নামে একখানি গীতি আলেখ্য প্রকাশ করে। এই আলেখ্যে স্বাধীনতার সশস্ত্র আন্দোলনের বিশেষ করে বিপ্লবী আন্দোলনের কথা যোগ করে গান, আবৃত্তি পাঠ সহযোগে এক সংশোধিত গীতি আলেখ্য তৈরি হয় এবং নানা স্থানে পরিবেশিত হয়। অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন সুবোধ মুখার্জী, তারকদাস চ্যাটার্জী, ফণীন্দ্র মিত্র, অমর নাথ দাস, মদন চ্যাটার্জী, বিষ্ণু দত্ত, বলরাম পালিত সেবা মিত্র, ও সুষমা মিত্র। এইভাবে দীর্ঘ ৬৫ বছর ধরে নানা ঘটনা বহুল ইতিহাস সৃষ্টি করছে শক্তি সঙ্ঘ।

শক্তি সঙ্ঘের নেতৃবৃন্দ চল্লিশের দশকের শুরুতে 'খেলাঘর' নামে এক নাট্য সংস্থার স্থাপনা করে। এই সংস্থা একটি পুরোনো মঞ্চের দ্রব্যাদিও ক্রয় করে নাট্যানুষ্ঠান শুরু করে। রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, লাল পাঞ্জা, সংগ্রামও শান্তি, তটিনীর বিচার, চরিত্রহীন, দশের দাবী, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। এছাড়া শ্রীমণীন্দ্র মিত্র কৃত কিছু শিশুপাঠ্য গল্পের নাট্যরূপও মঞ্চস্থ হয়। নাটকে অংশগ্রহণ শিল্পীরা ছিলেন বলরাম পালিত, অতুল কৃষ্ণ বসু, অমর নাথ দাস, ফণীন্দ্র মিত্র, শান্তি গাঙ্গুলী, শক্তি ব্যানার্জী, মদন চ্যাটার্জী, মনোজ বসু, সুখেন রাহা, সোমনাথ মিত্র, রবীন্দ্র নাথ মিত্র (ব্যাং), প্রভাত রায় মিত্র, সুধাকর দে প্রভৃতি। নাটকগুলি মঞ্চস্থ হোত মুখার্জীদের দুর্গা মণ্ডপে, বারোয়ারীতলা ও অন্যত্র।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

তথ্য সূত্র ঃ প্রয়াত অতুল বসু, শ্রীঅমর নাথ দাস
শ্রীবলরাম পালিত ও শ্রীঅনিল মিত্র

অদ্বয়

(স্থাপিত ঃ ১৯৮৪)

অদ্বয় একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা, মূলত আবৃত্তি শিক্ষণ কেন্দ্র। ১৯৮৪ সালে 'অদ্বয়' প্রতিষ্ঠিত হয় শঙ্কর গাঙ্গুলীর পরিচালনায় এবং উদ্যোগে। তাঁর যোগ্য সহযোগী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এঁদের সম্মিলিত প্রয়াসে প্রায় ত্রিশ জন ছাত্রছাত্রীসহ আবৃত্তি বিষয়ে আজও নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে চলেছে। অদ্বয় আয়োজিত কোন্নগরের বুকে দশ বৎসর ব্যাপী আবৃত্তি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ অনুষ্ঠান বিশেষ কৃতিত্বের দাবি রাখে।

লেখক ঃ শঙ্কর গাঙ্গুলী।

মাষ্টারপাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ

১৯৭২ সাল। সারা পশ্চিমবঙ্গে এক রাজনৈতিক অস্থিরতায় এলাকার যুবককুল বিভ্রান্ত। কারও ভূমিকা অত্যাচারিতের কারো বা অত্যাচারীর। এই রকম এক সময়ে মাষ্টার পাড়া এলাকার কিছু শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমাজসেবীর উদ্যোগে পূর্বের 'অগ্রগামী সঙ্ঘের' নাম পরিবর্তন করে স্থাপিত হলো ''মাষ্টার পাড়া উন্নয়ন পরিষদ''। সম্পাদক হন প্রাক্তন পৌর সদস্য প্রয়াত নৃপেন্দ্র কিশোর দাস মহাশয়। উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন ডাঃ অমল চৌধুরী, ডাঃ পরেশ সেনগুপ্ত, গোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। পরবর্তীকালে নানা ঘাত প্রতিঘাতে ও রাজনৈতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে জন্ম নিলো আজকের 'মাষ্টারপাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ'। ঠিকানা সেই অগ্রগামী সংঘের ঘরটি।

এই সংস্থার কার্যসূচীতে থাকলো বিভিন্ন সেবামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। যার প্রথম পদক্ষেপ 'লীলাবতী দেবী ও অরূপ স্মৃতি' আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, যা পরবর্তীকালে সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় রূপ নেয়। অতঃপর এই প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের ম ধ্যে অনুষ্ঠিত হয়,—বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে সংস্থার সভ্যদের দ্বারা অভিনীত 'আমরা কবরে যাবো না' নাটক এবং কলকাতা মাস থিয়েটার কর্তৃক 'নীলদর্পণ' নাটক। এছাড়া রবীন্দ্র-নজরুল জন্মদিন পালন, 'সুকান্তর ভাবনা চিন্তা ও যুবসমাজ' শীর্ষক আলোচনা সভা, বিশিষ্ট নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের স্মরণসভা উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া সংস্থার সভ্যদের দ্বারা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় নাটক, যার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে ''হারানের নাতজামাই' নাটকখানি।

এই অঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক ও সমাজ চেতনার উন্নয়নকল্পে অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠান যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামকৃষ্ণ মিশন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য দপ্তরের সহায়তায় 16mm Film Show, বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে যে অনুষ্ঠানটি তাহলো পরিষদের খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত ফুটবল প্রশিক্ষণ শিবির, এবং প্রতিবছর অনুষ্ঠিত ১৬ বছরের অনূর্ধ বয়স্কদের সারাদিন ব্যাপী ফুটবল প্রতিযোগিতা

যেখানে উপস্থিত থাকেন বহু খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় ও ক্রীড়াজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

এই অঞ্চলের জনগণের ইচ্ছায় ও পৌরসভার সক্রিয় সহযোগিতায় একটি পাঠাগারও স্থাপিত হয়েছিল, বর্তমানে পাঠকের অভাবে সাময়িক ভাবে সেই পাঠাগার বন্ধ আছে।

১৯৯২ সাল থেকে প্রতি বছর পরিচালনা করা হচ্ছে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, থ্যালাসেমিয়া রোগাক্রান্তদের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের উৎসাহ ও উদ্যমে। ১৯৯৯ সালে রক্তদাতার সংখ্যা ছিল ৮৫ জন।

এরপর বাংলার ১৪০১ সালের ১লা বৈশাখ সমগ্র কোন্নগর বাসীর জন্য স্থাপিত হলো একটি 'হেলথ ক্লিনিক'। যেখানে স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসকের সহযোগিতায় আজ পর্যন্ত প্রায় ২৫০০ জন রোগী চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছেন। পরে ১৯৯৯ সালে ড. বাসন্তী চৌধুরী ও তাঁর ভগ্নী তাদের পিতৃদেবের স্মৃতিতে দান করেন একটি E.C.G. মেশিন যার সুবিধা লাভ করেন গত বছরে প্রায় ৮০ জন রোগী মাত্র জনপ্রতি ৩০ টাকা ব্যয়ে। এখানে ৩টি অক্সিজেন সিলিণ্ডার থাকায় শতাধিক রোগী উপকৃত হয়েছেন।

আজ এই সংস্থার স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আছে ২৯ কাঠা জমির উপর খেলার মাঠ, চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত। পরিষদের দ্বিতল গৃহের সম্মুখে ১৬ কাঠা জমির উপর নরেন্দ্র স্মৃতি পূজামণ্ডপ ও নাট্যমঞ্চ এবং মনসার বেদী আছে। সমস্ত ভবন ও জমি প্রাচীর বেষ্টিত।

উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের জন্য কৃতিত্বের দাবী রাখেন যেমন স্থানীয় জনগণ তেমনি ধন্যবার্দাহ পূর্ববর্ত্তী পৌরসভার পুর প্রধান ও ১৯৯৫ সালের পূর্ববর্তী কিছু সংখ্যক প্রাক্তন কাউন্সিলারদের সহযোগিতা।

লেখক ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোন্নগর স্কুল অব রেসিটেশন

(স্থাপিত ঃ ১৯৮১)

এই আবৃত্তি শিক্ষার বিদ্যালয়টি বহুদিন ধরে কোন্নগরে আবৃত্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সুনামের অধিকারী হয়েছে। এখানে শিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা আবৃত্তিতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এই সংস্থা কলকাতা এবং অন্যত্র নানা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। ২৫/৩০ জন ছাত্রছাত্রী এখানে নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া অন্যান্য কবিদের কবিতারও আবৃত্তি করার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ শ্রী মহিম ঘোষ এবং বর্তমান ঠিকানা শ্রী অরবিন্দ রোড, কোন্নগর।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

নৈবেদ্য

'নৈবেদ্য' হ'ল সাহিত্য চর্চায় সমাজ মানসিকতার ক্রম সংস্কৃতায়নে প্রত্যয়ী এক সাহিত্যগোষ্ঠী। শ্রীমতী উমা পাত্র, শ্রীমতী প্রতিমা সিংহ, দেবযানী সিংহ, শুভ চৌধুরী ও শ্রী যুক্ত স্বপন পাঁজার সহযোগিতায় ড. অসিত পাত্র এই গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন। গোষ্ঠীর বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক হলেন অধ্যাপক রবি চক্রবর্তী ও ড. অসিত পাত্র।

'নৈবেদ্য' প্রতি মাসের শেষ রবিবার নির্দিষ্ট বিষয় ভিত্তিক সাহিত্য আসরের আয়োজন করে থাকে। গোষ্ঠীর প্রথম মাসিক সাহিত্য আসর বসেছিল ১৪০৬ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। এই আসরে পৌরহিত্য করেছিলেন স্বর্গত কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দ দাসের জন্ম শতবর্ষ স্মরণে বিশেষ আসরের ব্যবস্থা করেছিল। আগষ্ট, ২০০১ পর্যন্ত আয়োজিত ২৭টি আসরে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক রবি চক্রবর্তী, অধ্যাপক নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক সত্যেন সাহা, অধ্যাপক অধীর মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা অপর্ণা রায়, অধ্যাপক শাশ্বত ভট্টাচার্য্য, নাট্য গবেষক সঞ্জীব সেন, গল্পকার মতি মুখোপাধ্যায়, ছোট গল্পকার তুষার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাবন্ধিক শিশির দে, সমাজসেবী গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, কবি স্বপন পাঁজা, নট ও কবি বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নট ও আবৃত্তি শিল্পী মহিম ঘোষ, সংগীত শিল্পী দেবযানী সিংহ, আবৃত্তিকার চঞ্চল রায়, সুচিকিৎসক জ্যোতির্ময় বসু ও সুচিকিৎসক অসিত দত্ত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। গোষ্ঠীর প্রধান কার্যালয়-৩, ক্রাইপার রোড, কোন্নগর। দূরভাষ ঃ ৬৭৪-০৮১৮।

লেখক ঃ ড. অসিত পাত্র।

স্যাটারডে ক্লাব

স্থাপিত ঃ ডিসেম্বর ১৯৪২

নানা স্থানে প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয় স্থাপনা হয়—যথা শ্যামাচরণ কুটির, শৈল কমল সরকারের বাড়ি, অবশেষে শৈলেন পালের বাড়ি (বিজয় কৃষ্ণ পাল)। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে নাম করতে হয় গোপাল হালদার, শৈলেন পাল, শিবদাস পাল, বৈদ্যনাথ পাল প্রভৃতি। নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতি হন। অধীর মুখোপাধ্যায়, মুরারি মিত্র, শক্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এঁদের সঙ্গে যুক্ত হন।

যে নাটক দিয়ে সংস্থার প্রথম উদ্বোধন হয় সেটি হোল—'বেকার নাশক কোম্পানী', একাঙ্ক নাটক। নাট্যকার—শক্তি মুখোপাধ্যায়। এর পর যে সমস্ত নাটক মঞ্চস্থ হয় সেগুলি সানি ভিলা, দ্বতং পিবেং, সাজাহান, ষোড়শী, চন্দ্রগুপ্ত। নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। নাট্য নির্দেশনায়—বিপিন মুখোপাধ্যায়। এছাড়া প্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায় সহায়তা করেন।

এর পর সংস্থা যে উদ্যোগ গ্রহণ করে সেটি হচ্ছে, নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত প্রতিযোগিতা। ১৯৪৪ সালে প্রথম অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গিরিজা শঙ্কর চক্রবর্তী বিচারক হন। প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আধুনিক, রবীন্দ্র সংগীত ও ভজন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দবীর খাঁ, পঙ্কজ মল্লিক প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতার স্থান ছিল কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। প্রথম সম্পাদক ছিলেন শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সংগঠন কাজে সহযোগিতা করতেন ফণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র বিজয় চট্টোপাধ্যায় প্রথম দিকে প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বিনোদ চট্টোপাধ্যায়। (নালু) কোন্নগরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

এই প্রতিযোগিতার ব্যাপকতা ও সুষ্ঠু পরিচালনা কোন্নগরের সঙ্গীত জগতে

সাড়া এনে দিয়েছিল, ফলে সঙ্গীত চর্চা খুবই প্রসার লাভ করেছিল কোন্নগরে।কোন্নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা জোগাতেন এবং আর্থিক সাহায্যও করতেন।

প্রতিযোগিতা চলেছিল ১৯৪৪-১৯৬২ সাল পর্যন্ত।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

তথ্য সূত্র ঃ গোপাল হালদার, অজয় মুখোপাধ্যায়
ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

বন্দনা সাহিত্য আসর

(ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা)

১৯৭০ সালে সম্পাদক শ্রী অমরনাথ পাশী-র নিজ উদ্যোগ ১৭, জি. টি. রোড, কোন্নগরে এই সংস্থা গড়ে ওঠে। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ভ্রাম্যমান মুক্তমেলা ও সাহিত্য সভার আয়োজন হয়ে থাকে। অনেক প্রবীণ নবীন, নামী ও অনামী লেখক লেখিকাদের লেখায় সমৃদ্ধ হোয়ে বন্দনা সাহিত্য আসর পত্রিকা প্রকাশিত হোত। বর্তমানে পত্রিকা-প্রকাশ কিছুটা অনিয়মিত হলেও মাঝে মাঝে পত্রিকার গুণগত মান ও ঐতিহ্য বজায় রেখে পত্রিকা প্রকাশ হয় পত্রিকার উদ্যোগে বাংলা আকাদেমিতে এক কবিতা পাঠের আসর কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রয়াত ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় এই সংস্থার সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতি ও শ্রী অমরনাথ পাশী সম্পাদক।

লেখক ঃ অমরনাথ পাশী।

শ্বেত করবী

স্থাপিত ঃ ১৯৯৫

যোগাযোগ ঃ ৬ বৈদ্য বাগান লেন। কোন্নগর। দূরাভাষ ৬৭৪-৬৩২৩

অধ্যক্ষ ঃ শ্রী কমল পাল

শ্বেত করবী সুস্থ সংস্কৃতি চর্চা, কবিতা পঠন-পাঠন
ব্যাকরণগত ও প্রকৃত অর্থে আবৃত্তি শিক্ষা কেন্দ্র।
বর্তমানে ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা ২০ জন।
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হোয়ে শ্বেত করবী সুনামের
সঙ্গে আবৃত্তি পরিবেশন করে থাকে।

তথ্য ঃ অধ্যক্ষ কমল পাল   লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্নগর হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন

কোন্নগর হরিদাস মিউজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন আজ একটি বিস্মৃত প্রায় প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংস্থা। যতদূর জানা যায় সম্ভবতঃ ১৯২০-২১ সালের মধ্যে প্রথমে ডায়মণ্ড ক্লাব নামে এর জন্ম। সেই সময় এর কর্ণধারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন হরিদাস মিত্র। ১৯২৮-৩০ সালের মধ্যে হরিদাস মিত্র-র মৃত্যুর পর ডায়মণ্ড ক্লাবের নাম পরিবর্তিত হোয়ে হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন নামকরণ হলো। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন রজনীকান্ত দাস (ফটিকদা), রতীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস মিত্র, ললিত ঘোষ (ব্যাঙা মাষ্টার), নিমাই চাঁদ বসু, সুশীল মজুমদার (বাঙালদা), সুবোধ মিত্র (পটল, পরে সাধু হয়ে যান), ক্ষেত্রমোহন জানা, পাঁচুগোপাল বসু, সুবোধ শী, শীতলা প্রসাদ সেন, পান্না সেন (চাঁপী), জাহ্নবী চট্টোপাধ্যায়, মানিক মুখোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (চেকো), প্রফুল্ল কুমার পাল, ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, তারক চন্দ্র দাস (ফেলা কাকা), পরবর্তীকালে মদন চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যোগদান করেন। উপরোক্ত প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সবাই প্রয়াত হয়েছেন।

১৯২০-২১ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানের জীবনকাল হলেও মাঝে এই সংস্থার সাংগঠনিক দুর্বলতার কথা শোনা যায়, ঠিক সেই সময়েই মদন চট্টোপাধ্যায়-এর বলিষ্ঠ হস্তক্ষেপে সংস্থা পুনরুজ্জীবন লাভ করে। মদন চট্টোপাধ্যায় তাঁর সহযোগীরূপে পেয়েছিলেন ফণীন্দ্র মিত্র, প্রভাত কুমার রায় মিত্র, জীবন কুমার ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে। শোনা যায় ১৯৫০ সাল নাগাদ এই সংস্থার অবলুপ্তি।

হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন-এ যে সব বিশিষ্ট যন্ত্রী শিল্পী ছিলেন তারা হলেন—ললিত ঘোষ (ক্লারিওনেট), তারক দাস (বেহালা), মদন চট্টোপাধ্যায় (বেহালা), গৌর সরকার, সুবোধ শী, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (ক্ল্যারিওনেট)। কোন্নগরের এন, সি, মুখার্জী লেনের বিখ্যাত বৃন্দাবন দাস ও বিপিন বিহারী দাস-এর (বি, বি, ডি খ্যাত) বাড়িতে উপরোক্ত শিল্পীরা ছাড়া

আরো অনেকে মিলিত হতেন এবং সমস্ত রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঐকতানের মহলা হতো। এই দল খুবই সংগঠিত ছিল। শুধু তাই নয় এঁদের প্রত্যেকেই ছিলেন অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ ও নিপুণ শিল্পী। এঁরা সবাই শুধু যে কোন্নগরের মধ্যে যাত্রার আসরে বা নাটক অভিনয়ের পূর্বে বৃন্দবাদন করতেন তাই নয়, কলকাতার আশেপাশে হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে বাজাতে যেতেন বিনা পারিশ্রমিকে।

কোন্নগরের দাস বাড়িতে হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশনের বাৎসরিক উৎসব হতো খুব আড়ম্বরের সঙ্গে। এঁদের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হতো বিখ্যাত সব নাটক যেমন—মন্ত্রশক্তি, আলিবাবা, মা ইত্যাদি। শোনা যায়, এঁদের এই অভিনয় আসরে নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ প্রখ্যাত নটেরা উপস্থিত থাকতেন।

কালের বিস্মৃতির গর্ভে আজ কোন্নগর হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন বিলীন হলেও আজকের এবং আগামী প্রজন্মের কাছে সেই উজ্জ্বলময় ঐহিত্যকে জাগরূক রাখতে এই প্রয়াস।

সূত্র ঃ সমন্বয়ে পত্রিকা   লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গ মঞ্চ অঞ্চলে
সাধারণ নাটক মহ্‌লা কক্ষের দ্বারোদঘাটন।।

তারিখ ঃ ১৪. ৪. ১৯৮১ (বাংলা ১লা বৈশাখ ১৩৮৮)

অনুষ্ঠান সভাপতি ঃ নটশ্রী বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়

দ্বারোদঘাটন করেন ঃ নট ও নাট্যকার দেবব্রত সুর চৌধুরী

অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ঃ পুর প্রধান বিষ্ণু দত্ত

সংকলক ঃ বিষ্ণু দত্ত

হলিডে ক্লাব

১৯২১-২২ সালে কোন্নগরে নোতুন করে নাটক, খেলাধুলা ও সঙ্গীত চর্চার একটা ঢেউ ওঠে। এই সময়ে কোন্নগরের দক্ষিণ প্রান্তে হরিদাস মিউজিক্যাল এসোসিয়েশন নামে এক অরর্কেস্ট্রা দল গড়ে উঠে। এই ভাবে কোন্নগরের মধ্যাঞ্চলে অর্থাৎ দেব পাড়ায় মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের বাড়ি ও বাগানের তখনকার মালিক ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। এই বাগান ও পুষ্করিণীর পশ্চিমে রাস্তার উল্টোদিকে যে বিস্তীর্ণ বাগান ছিল যা বর্তমানে প্রখ্যাত চিত্র শিল্পী ঈশা মহাম্মদের বাড়ির পূর্বে অবস্থিত সেই অঞ্চলে হলিডে ক্লাব গড়ে উঠে। এই ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন—শরৎ চন্দ্র বসু, পূর্ণ চন্দ্র মিত্র (এস. সি. দেব লেন), সুশীল কুমার মজুমদার (বাঙালদা), আশুতোষ ঘোষ (গুলুদা), গৌর সরকার (চড়কতলা), শান্তি বসু (ক্রাইপার রোড), অমূল্য দেব প্রভৃতি। এই ভাবে নানা বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত অরর্কেস্ট্রা পার্টি গড়ে ওঠে।

এই ক্লাবে টেনিস খেলারও বিশেষ চর্চা হত। খেলোয়াড়দের নাম—গৌর সরকার, বাদল ঘোষ (চড়কতলা), নীরজ বসু (মাণিবাটীর গোপাল চন্দ্র বসুর পুত্র), ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ (ঘোষপাড়া), অচ্যুত মুখার্জী, সত্যহরি রায় মিত্র, আর এক তেলেগু যুবক, নাম বোম্বাইয়া গারা। ইনি টেনিস খেলায় পারদর্শী ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে ডাঃ বসু তাঁর আত্মীয় ঋষি বঙ্কিম স্ট্রীটের বিখ্যাত ঘোষ পরিবারে ফণীন্দ্র নাথ ঘোষের পুত্র রথীন ঘোষের (বাচ্চু) কথার উল্লেখ করেন। ইনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের কাছে দীর্ঘকাল বেহালা বাদন শিক্ষা করেন। এঁর পুত্র রঞ্জন ঘোষ শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্য ঘরানার বেহালা বাদ্যে বিশেষ গুণী।

কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত শিক্ষক রজনী কান্ত সেনগুপ্তের পুত্রগণ যথা, ভবানী সেন (বিশিষ্ট আইনজীবী), সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ শীতলা প্রসাদ সেন, পান্নালাল সেন প্রধান শিক্ষক, ও প্রভাস সেন, এ্যাডভোকেট, এঁরা সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে যশস্বী ছিলেন।

ডাঃ বসু আরো উল্লেখ করেন যে শ্রীমতী ক্ষেত্রমণি ঘোষ যিনি ১৮৭০ সালে উত্তর পাড়ার হিতকামী সভা পরিচালিত পরীক্ষায় স্বর্ণ পদক লাভ করেন এবং ১৯২৩ সালে জ্যোর্তিময়ী সেনগুপ্ত (চিন্তাদি), রজনী কান্ত সেনগুপ্তের কন্যা, পুরস্কৃত হন। ইনি পরবর্তী কালে বড়জোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। সেই সময়কার দুই মহিলার কৃতিত্বের কথা অবশ্যই উল্লেখনীয়।

এই গৌর ধামে শরৎ চন্দ্র বসুর বাড়িতে আর যাঁরা যাতায়াত করতেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখ করতে হয় যাঁদের নাম তাঁরা হলেন—উপেন্দ্রনাথ মিত্র (পানিহাটী) ইনি কোন্নগর বিদ্যালয়ের ড্রয়িং মাষ্টার ছিলেন। ইনি ধ্রুপদ সঙ্গীতে পারদর্শী ছিলেন ধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় (অন্ধ)—সেতারী ও গায়ক। আর যতীন্দ্র ব্যানার্জী—ইনি মৃদঙ্গ বাজাতেন।

এই বাড়িতে এক আড্ডা ছিল—এই আড্ডায় যাঁরা যোগ দিতেন তাঁরা হলেন—সুরথ বসু, রাজকৃষ্ণ চ্যাটার্জী (চড়কতলা), যোগেন্দ্র নাথ ঘোষ (ঘোষ পাড়া), বিনয় মুখার্জী (ঘোষপাড়া) হীরালাল মুখার্জী (বকুতলা), মহেন্দ্র নাথ মিত্র (মণি পাড়া)।

আর একটা উল্লেখ্য বিষয়—ডাঃ বসুর উদ্যোগে দু'বার গ্রন্থাগার ভবনের দোতলায় ডাঃ শরৎ কুমার দেব স্মৃতি বক্তৃতা হয়—বিষয় ছিল হার্ট ও নিউরলজি ও মনোব্যাধি—এতে বক্তৃতা দেন ডাঃ অঞ্জলি সেনগুপ্ত (পান্নালাল সেনগুপ্তের কন্যা)।

প্রসঙ্গক্রমে আরো যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গ উঠে তাঁদের কয়েক জনের কথা কোন্নগরের ইতিবৃত্তে স্থান পাবার যোগ্য। এঁরা হলেন—নির্মল দেব—ইনি দু'খানি উপন্যাস লিখেছিলেন, সরকারের কৃষি বিভাগের কাজ করতেন, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, নন্দলাল ব্যানার্জী, ওমর আলী এঁরা নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড়, সত্যেন ঘোষাল (সঙ্গীত শিল্পী) এবং কানাই পত্র (সঙ্গীতকার)।

সূত্র ঃ ডাঃ জ্যোতির্ময় বসুর সাথে সাক্ষাতকার। **লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত**

ভারত সোভিয়েৎ সংস্কৃতি সমিতি (ISCUS)

পশ্চিমবঙ্গে ভারত সোভিয়েৎ সমিতির কার্যকলাপ ১৯৬০ সালে শুরু হয়। দ্বাদশ রাজ্য সম্মেলন হয় ৮ থেকে ১০ জুলাই, ১৯৭২ সালে।

ভূমিকা।। ১৯৪১ সালে ফ্যাসিবাদের হাত থেকে সোভিয়েৎকে রক্ষার জন্য ১৯৪১-র জুন মাসে সোভিয়েৎ সুহৃদ সঙ্ঘ (F.S.O) গঠিত হয় পশ্চিম বঙ্গে, এবং এই সংস্থা এক গৌরবজনক ভূমিকা গ্রহণ করে। তারপর ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময়ে ভারতের সাথে সোভিয়েতের বহুমুখী সম্পর্ক গড়ে উঠে—দুই দেশ ও বিশ্বশান্তির পক্ষে যা মঙ্গলজনক। সেই সম্পর্ক আরো প্রসারিত করার জন্য ১৯৬০ সালে ISCUS প্রতিষ্ঠিত হয় পশ্চিম বঙ্গে। এই হোল সৃষ্টির ইতিহাস।

আমাদের কোন্নগরে ১৯৮০ সালে ISCUS-এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি হন বিষ্ণু দত্ত ও সম্পাদক গোবিন্দ চ্যাটার্জী। তারপর ধীরে ধীরে কোন্নগরের মানুষের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বৃদ্ধি হয়।

১৯৮২ সালের আগষ্ট মাসের ১০ তারিখে যে কমিটি তৈরি হয় তাতে সভাপতি হন পুর প্রধান বাসুদেব ইন্দ্র আর সম্পাদক হন তিনজন—মনোরঞ্জন মিত্র, দীপক চক্রবর্তী ও বিষ্ণু দত্ত। আর পরবর্তী কালে ১২. ১০. ৮৭ তারিখে অধীর মুখার্জী ও সঞ্জীব সেন যথাক্রমে সভাপতি ও কার্যকারী সভাপতি হন এবং যুগ্ম সম্পাদক হন অজয় মুখার্জী ও বিষ্ণু দত্ত।

সমিতির কয়েকটি জনসভা ও সম্মেলনের বিবরণ নিচে প্রদত্ত হল ঃ

- **৩০. ৬. ৮১ তারিখে মার্কসের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয় গ্রন্থাগারের শিবচন্দ্র সভা কক্ষে।**
- **১৪. ৮. ৮২ তারিখে নৃসিংহ দাস বসু মেমোরিয়াল হলে সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।**
- **২৪. ৪. ৮৩ তারিখে তারিখে শিবচন্দ্র সভাকক্ষে মার্কসের মৃত্যুর জন্মশতবর্ষ সম্পন্ন হয়।**

- ৩০. ৬. ৮৭ তারিখে শিবচন্দ্র সভাকক্ষে সমিতির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন— ভানুদেব দত্ত। সভা থেকে ৪ জনের কার্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়।
- ৫. ১১. ৮৭ তারিখে ভারতের স্বাধীনতার ৪০ বছর ও রুশ বিপ্লবের ৭০ বছর উদযাপন হয়। স্থান—শিবচন্দ্র সভাকক্ষ। বক্তা—গৌতম চট্টোপাধ্যায়।
- ২৩. ১১. ১৯৮৮ নভেম্বর বিপ্লবের ৭১ বছর ও ISCUS-এর বার্ষিক সম্মেলন হয়। স্থান—নৃসিংহ দাস বসু হল। বক্তা—অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী।
- ১৩. ৪. ১৯৯০ শিবচন্দ্র সভা কক্ষে যৌথভাবে গ্রন্থাগার ও ISCUS-এর উদ্যোগে সম্মেলন ও জওহর লাল নেহেরুর জন্ম শতবর্ষ পালিত হয়। বক্তা—ভানুদেব দত্ত। উক্ত সম্মেলনগুলিতে দলনির্বিশেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, সাধারণ মানুষ ও ISCUS-এর সভ্যগণ যোগদান করেছেন।

এই সময়ের মধ্যে দুটি রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়—একটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শত বর্ষ হলে সেখানে ১২ জন প্রতিনিধি যোগ দেন, অন্যটি স্টুডেন্টস হলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৩ সালের অক্টোবরে সমিতির নাম পরিবর্তন হয়। নূতন নাম হয় ISCUS অর্থাৎ Indian Society for Cultural Co-operation. কারণ ১৯৯২ সালে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিলুপ্তি ঘটে।

কোন্নগরে ISCUS-এর জীবনকাল ১৯৮১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত।

সূত্র ঃ পুরাতন কাগজপত্র ও দলিল সমূহ। লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ
কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটি

প্রায় ত্রিশটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। ধারাপাত অনুযায়ী বয়স। ত্রিশের দশকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ, চল্লিশের দশকে ফ্যাসি বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘ, তারই উত্তরসূরী হিসেবে প্রায় ২৯ বছর আগে ভারতীয় সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিগ্রেড নিয়ে জন্ম মূল সংগঠন। এরই কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটির বয়স প্রায় পঁচিশ বছর ।

গত ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০০১ রাজ্য সম্মেলন হয়ে গেল চন্দননগর রবীন্দ্র ভবনে। এটা নব পর্যায়ের পঞ্চম সম্মেলন। তার আগে কোন্নগর আঞ্চলিক সম্মেলন (পঞ্চম সম্মেলন, নব পর্যায়ে) অনুষ্ঠিত হয়েছে নবগ্রাম হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়ে ১৯ নভেম্বর ২০০০ তারিখে।

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনের হাত ধরে কোন্নগর বিংশ শতাব্দীর সমাজ আন্দোলনে সামিল হলো। বঙ্গভঙ্গেব মতো আলোড়নকারী ঘটনা এই অঞ্চলেও প্রভাব বিস্তার করল। উত্তরপাড়ার অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সতীশ মুখোপাধ্যায়, 'ডন সোসাইটির' সভ্য হয়ে উত্তরপাড়ায় শিল্প কমিটি গঠন করেন। তাদের মধ্যে লাঠি ছোরা খেলার চর্চা হয়, অনাথ ভাণ্ডার, অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র, দুর্গতদের সাহায্য পৌছে দেবার সংগঠন হলো।

বিয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ সালের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তাধারায় প্রবেশের এই অধ্যায়। সাতচল্লিশের স্বাধীনতা ও উনপঞ্চাশের শ্রীদুর্গা মিলের সংগ্রাম এখানে গড়ে তোলে শ্রমিক সংগঠন, ছাত্র ফেডারেশন, এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন। প্রয়াত সমর মিত্রের (ভূষি) বাড়িতে কার্যালয় স্থাপিত হয় সমন্বয় গড়ার জন্য। ছাত্র ফেডারেশন, শান্তি কমিটি, পিপলস রিলিফ কমিটি, গণনাট্য সংঘ, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টি থেকে কর্মীরা আসতেন যুব সংঘে কাজ করতে। রেল স্টেশনের পশ্চিমে নবগ্রাম গড়ে উঠল—পূর্ববঙ্গ

থেকে আগত মধ্যবিত্ত মানুষদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি ও সংগ্রামী সাহস ছিল। বর্ধিষ্ণু জনপদ তৈরি হোল। কোন্নগর ও নবগ্রাম অঞ্চলের মানুষদের বিনিময় সুদৃঢ় হয়। শিক্ষার প্রসার ঘটে, প্রগতি ধারার নাট্যচর্চা, পাঠচক্র প্রভৃতির দ্বারা সংস্কৃতি আন্দোলনের গতি প্রবাহিত হয়।

সত্তর থেকে গণতন্ত্রের উপর আঘাত নেমে আসে। ১৯৭২ সালে আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস কণ্ঠরুদ্ধ করতে চাইল বাংলা কৃষ্টি ও সভ্যতার। এই অবস্থার মধ্যে জন্ম হয় 'গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী'। এই সংগঠনের কাঠামোর মধ্যে গণতন্ত্রের উপর আঘাতের প্রতিবাদে লেখক শিল্পীরা রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে সংঘবদ্ধ হতে থাকেন।

কোন্নগরেও প্রস্তুতি চলতে থাকে। সচেতন সংস্কৃতির যুব কর্মীরা ১৯৭৭ সালে অরবিন্দ রোডের উপর একটি কনভেনশন করেন। রাজ্য সংগঠনের সঙ্গেও যোগাযোগ ছিল। কোন্নগরে সংগঠনের একটি প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়।

রাজ্য সংগঠনের বয়স যদি প্রায় ত্রিশ হয়, কোন্নগরে সংগঠনের বয়স পঁচিশ বছর। ১৯৮১ সালে গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী থেকে নতুন নাম হয় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ। সে বছরই কোন্নগর রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ে একটি কনভেনশনের মধ্য দিয়ে তৈরি হয় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, হুগলী জেলা কমিটি। সেবারই রাজ্য কনভেশন থেকে আঞ্চলিক কমিটির যবনিকা ঘটিয়ে জেলা কমিটি পর্যন্ত নিম্নস্তর ঠিক হয়। কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটির বিলোপ ঘটে। তখন একটি অঞ্চলে একজন করে জেলা পটিটির সদস্য আহ্বায়ক বা দায়িত্বে ছিলেন। কোন্নগরে দায়িত্বে ছিলেন সঞ্জীব সেন। আহ্বায়ক ছিলেন সুশীল চক্রবর্তী। সম্মিলনী থেকে সংঘ পর্যন্ত প্রচুর কার্যসূচী নেওয়া হয়। ১৯৮৫ সালের ৬ আগষ্ট কোন্নগর অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে নব পর্যায়ে প্রথম সম্মেলন হয়। ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাসে দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কোন্নগর টাউন হলে। সম্পাদক নির্বাচিত হলেন দেবু গোস্বামী। ১৯৯২ সালের ২৭ ডিসেম্বর তৃতীয় সম্মেলন হয় কোন্নগর অরবিন্দ বিদ্যাপীঠে, এবং চতুর্থ সম্মেলন হয় ২৯ ডিসেম্বর ১৯৯৬ সালে অমিয় নিকেতনে।

কোন্নগর অঞ্চল কমিটির ধারাবাহিক কার্যধারা ছাড়া সাপ্তাহিক সাহিত্য

আসর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথম পাঁচ বছর সদস্যদের উদ্যোগে 'মনন' ও 'কৃষ্টিদীপ' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হলেও বন্ধ হোয়ে যায়, যদিও নিযমিত পত্রিকার চাহিদা ছিলই। বলা বাহুল্য 'অভিমুখ' নামে একখানি পাক্ষিক সংবাদ পত্রিকা অধুনা অনেক মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। সংগঠনের কিছু সদস্য এই পত্রিকার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত আছেন। শিল্প সাহিত্যের উপর আলোচনা, মনীষীদের জীবন চর্চ, ভাষা দিবস পালন করা, পথ নাটক দিবস পালন করা প্রভৃতি সংগঠনের নিয়মিত কাজ। হোচিমিন জন্ম শতবর্ষে একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে।

লেখক ঃ দেবু গোস্বামী

সমন্বয়ে সাহিত্য গোষ্ঠী

স্থাপিত ঃ ১৯৮৬

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮৬

কার্যায় ঃ ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সরণি

ডাক।। কোন্নগর ।। জেলা হুগলি। পিন-৭১২২৩৫

দূরভাষ ঃ ৬৭৪-৬৭৬৮

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কার্যাবলী ঃ সাধারণতঃ প্রতি ইংরাজী মাসের প্রথম রবিবারে 'গোষ্ঠী'র উপরোক্ত কার্যালয় ছাড়া সভ্যদের আমন্ত্রণে বিভিন্ন স্থানে সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি সভাতে বিভিন্ন জেলার এবং কলকাতার প্রায় ৫০-৬০ জন সাহিত্যসেবী উপস্থিত থেকে আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, রম্য রচনা পাঠ করেন। গোষ্ঠীর সভ্যেরা সংগীত, শ্রুতি নাটক ও যাদু প্রদর্শন করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিমাসের সাহিত্য সভার শুরুতে আলোচক তাঁর মনোনীত বিষয় নিয়ে কমপক্ষে ৩০ মিনিট আলোচনা করে থাকেন।

পত্রিকা ঃ সমন্বয়ে সাহিত্য গোষ্ঠীর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'সমন্বয়ে' বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় নবীন, প্রবীণ ও প্রতিষ্ঠিত লেখক লেখিকাদের রচনায় সমৃদ্ধ হয় নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। মার্চ ২০০১ পর্যন্ত মোট ৫১ খানি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশেষ নিবেদন ঃ সমন্বয়ে সাহিত্য গোষ্ঠীর বিশেষ নিবেদন শ্রুতিনাটক ও সংগীতালেখ্য। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ও পরিচালিত ৩০ খানি শ্রুতি নাটক ও সংগীতালেখ্য সাহিত্য সভায় ও অন্যান্য স্থানে পরিবেশিত হয়েছে।

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

নিউপার্ক এসোসিয়েশন

কোন্নগর

নিউপার্ক এসোসিয়েশন স্থাপিত হয় ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর।

সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্য সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ ও সাংস্কৃতিক চেতনাকে সমৃদ্ধ করতে নানা অনুষ্ঠান সূচির আয়োজন। এই প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক বিদ্যালয়, পাঠাগার পরিচালনা ও সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ এবং ক্রীড়া অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। পরিবেশ সুরক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ক্যুইজ্ ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা এই সংস্থার উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি। বর্তমানে এই সংস্থার সভ্য সংখ্যা ১৬০ জন। এবং সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীইন্দ্রদেব নাথ ও শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তী। সরকার প্রদত্ত জমিতে সংস্থার নির্মিত ঘরখানি প্রশস্ত এবং সুন্দর।

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরে সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র সমূহের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

সুর মল্লার স্কুল অব মিউজিক (স্থাপিত—১৯৭৮)

রায় পাড়া লেন

এখানে সঙ্গীত, নৃত্য, তবলা, অঙ্কন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্যালয়টি চণ্ডগড় (বিশারদ), বঙ্গীয় (বিভাকর) কর্তৃক অনুমোদিত পরীক্ষা কেন্দ্র।

বিদ্যালয়ে ১৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে। সপ্তাহে ৪ দিন শিক্ষা দান করা হয়।

পরিচালনায় ঃ শ্রীসুবীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সূত্র—বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত রিপোর্ট

হবি মিউজিক ইউনিট (স্থাপিত—১৯৬১)

শ্রীঅরবিন্দ রোড

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ রবীন্দ্র সংগীত ও অন্যান্য সংগীত, তবলা ও গীটার প্রভৃতি। সপ্তাহে দু'দিন শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয়টি চণ্ডীগড় ও রবীন্দ্র ভারতী কর্তৃক অনুমোদিত। বর্তমানে ৬০ জন ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে। শিক্ষাদান করেন অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক মণ্ডলী।

ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই কৃতী ছাত্র/ছাত্রী হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন।

পরিচালক ঃ শ্রীকানন মিত্র। শ্রী কানন মিত্র, বটুক নন্দী ও রজত নন্দীর যোগ্য ছাত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত।

বসন্ত বাহার (স্থাপিত—১৯৮৩)

শ্রীঅরবিন্দ রোড

প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব ভবন আছে।

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ কণ্ঠ সঙ্গীত (রবীন্দ্র সংগীত ও আধুনিক), গীটার, তবলা, রবীন্দ্র, কত্থক ও সৃজনশীল নৃত্য ও অঙ্কন।

প্রাচীন কলাকেন্দ্র, চণ্ডীগড় ও বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত ও এখান থেকে সকল পরীক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

বতমানে ২২৫ জনের বেশি ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে। প্রতিদিন বিকেলে এবং রবিবার বিশেষভাবে যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বার শিক্ষা দেয়া হয়।

প্রতিষ্ঠানটি আমন্ত্রিত হয়ে ভারতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান করে।

প্রতিষ্ঠানটির সংগঠক—শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সুর পঞ্চম (স্থাপিত—১৯৬৪)

এন. সি. মুখার্জী লেন

শিক্ষণীয় বিভাগ ঃ সঙ্গীত—খেয়াল, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আধুনিক, লোকগীতি, গীত, ভজন, যন্ত্রসংগীত—গীটার

এছাড়া অঙ্কন ও আবৃত্তি

'সুর পঞ্চম' ''সুরের মায়া সঙ্গীত সমাজের'' সাথে যুক্ত। ১৫০ জন ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষা গ্রহণ করে।

দুর্গোৎসবের সময়ে ভারতের বিভিন্ন শহরে আমন্ত্রিত হয়ে সংঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে।

সংগঠক ঃ শ্রী সলিল দাস ও শ্রী শ্যামল দাস।

ইমন সঙ্গীত শিক্ষায়তন (স্থাপিত ঃ ১৯৯৫)

হারান ব্যানার্জী লেন

শিক্ষায়তনের নিজস্ব ভবন আছে।

রবীন্দ্র সঙ্গীত সহ সব রকমের সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়।

বঙ্গীয় সঙ্গীত পবিষদ কর্তৃক অনুমোদিত।

ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ঃ ১৫ এবং ১২

সংগঠক ঃ কাবেরী দেব

সুরবাণী সঙ্গীত বীথি (স্থাপিত—১৯৬৭)

শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রিট

শিক্ষণীয় বিষয় ঃ রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, লঘুসঙ্গীত ও লোকগীতি, কত্থকনৃত্য, তবলা।

প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি, এলাহাবাদ ও প্রাচীন কলা কেন্দ্র, চণ্ডীগড় কর্তৃক অনুমোদিত।

শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এখানে শিক্ষা নেয। এখানকার কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী সংগীত জগতে কৃতিত্বেব অধিকারী হয়েছে। তার মধ্যে শর্মিষ্ঠা ঘোষ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উচ্চ স্থান লাভ কবেছে।

সংগঠক ঃ শ্রীসুখেন্দু বিকাশ ঘোষ

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি (কোন্নগর মহিলা সমিতির শুরু) ১৯৭০ সালে, মহিলা সমিতির কাজ কোন্নগরে ধারাবাহিকভাবে চলতো না। ২/৪ জন মহিলা উদ্যোগ নিয়ে সমাজ সেবামূলক কাজ ও গরীব মানুষের পাশে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেন। এই ভাবে কিছুদিন চলে। এর পরের ইতিহাস জেলার নেতৃত্বে ১৯৭১-৭২র মধ্যে কানাইপুর এবং কোন্নগরের কয়েকটি ওয়ার্ডকে নিয়ে প্রস্তুতি কমিটি গঠন করে কাজ শুরু হয়। কমিটি পাড়ায় পাড়ায় সদস্য সংগ্রহ করে পশ্চিম বঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির নীতি আদর্শের কথা, যেমন গণনারী মুক্তি ও সমান অধিকার এই ভিত্তিতে পূর্ণাঙ্গ কাজ চালিয়ে যায়। এর পর ১৯৮০ সালে কোন্নগর কালীতলা, ৬নং ওয়ার্ডের ঘোষাল বাগান, ধর্মডাঙা, এবং কানাইপুর এপার ওপারের এই চারটি অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি গঠিত হয়। প্রথম সভানেত্রী রেবা গোস্বামী এবং সম্পাদিকা শীলা পাল ছাড়া আরো ১৩ জন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যা ছিলেন।

এর পরে কয়েক বছর কানাইপুর বাঁশাই নবগ্রাম এবং কোন্নগরে ৪ টি শাখা, ঘোষাল বাগান, কালীতলা, ধর্মডাঙা, ১৩নং, ১৪নং ও ১৬নং ওয়ার্ড নিয়ে বিশাল মহিলা সমিতি গঠিত হয় এবং এরই মাধ্যমে বিভিন্ন আন্দোলন, নারী নির্যাতন ও আরো সেবামূলক কাজ চালিয়ে যাওয়া হয়।

বর্তমানে সংগঠন বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং কাজের সুবিধার জন্য ১৯৯৯ সালে ২২মে সম্মেলনের মাধ্যমে কোন্নগর ও কানাইপুর ২টি আঞ্চলিক কমিটি গঠন হয়। কানাইপুর নবগ্রাম, বাঁশাই ওপারের আঞ্চলিক কমিটি এবং কোন্নগরে ৬টি শাখা নিয়ে নিয়ে আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। কোন্নগরের আঞ্চলিক কাজে ধারাবাহিকতা রয়েছে। শীলা পাল ২টি সম্মেলনে থাকার পর থেকে রেবা গোস্বামী সম্পাদিকার দায়িত্বে রয়েছেন এবং সভানেত্রী মীনা রায় চৌধুরী।

লেখিকা ঃ রেবা গোস্বামী

সম্পাদিকা

কোন্নগর আঞ্চলিক কমিটি

পঃ বঃ গঃ মঃ সঃ

কোন্নগর উদয়াচল সংঘ

স্থাপিত ঃ ১৯৪৬

কোন্নগর উদয়াচল সংঘ-এর জন্ম অতি আকস্মিক ভাবেই পরাধীন ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালে (বাংলার ১৩৫৩ সালে) সরস্বতী পূজার কয়েকদিন আগে প্রয়াত সাতকড়ি দাস-এর বিশেষ উৎসাহে এবং স্থানীয় শ্রী অমিয়ভূষণ দাস-এর বাড়িতে। সংঘের নামকরণ করেছিলেন সাতকড়ি দাস ও ফণীন্দ্র নাথ দাস। উদয়াচল সংঘ-এর প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে প্রয়াত সাতকড়ি দাস ও শ্রী গৌর মোহন দাস।

সংঘের শুরু হয়েছিল খেলাধূলা ও পূজা, সাংস্কৃতিক ও নাট্য বিভাগ নিয়ে। খেলাধূলা বিভাগ বর্তমানে বন্ধ, প্রবীণ সভ্যদের উৎসাহে রক্ষাকালী পূজা হয়ে থাকে, সাংস্কৃতিক বিভাগের পরিচালনায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, উচ্চাঙ্গ ও দেশাত্মবোধক সংগীতানুষ্ঠান, মনীষীদের জন্মতিথি পালন, শিশু শিল্পীদের নিয়ে রুচিশীল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিশিষ্ট সংগীত সাধক ও নাট্যব্যক্তিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

উদয়াচল সংঘ মূলতঃ নাট্যসংস্থা। ১৯৫২-১৯৮২ সাল, এই দীর্ঘ ত্রিশ বছরে ৩৪ খানি নাটক ৫৪ রজনীতে অভিনীত হয়েছে, বেশ কয়েখানি নাটক বিশেষ সাফল্য লাভ করেছে। ১৯৯৮-এর ৬ জুন সংঘের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর জন্মশত বর্ষে 'গণ-দেবতা' নাটক মঞ্চস্থ হয়।

সংঘের বর্তমান সভাপতি শ্রী বীরেন মিত্র। সাধারণ সম্পাদক বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্য সম্পাদক সুব্রত বসু এবং নাট্য পরিচালক মণীন্দ্র মিত্র। এবং ঠিকানা ডাঃ টি এন মিত্র লেন, কোন্‌নগর।

প্রতিবেদক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জেহাদ

(স্থাপিত ঃ ১৯৭৯)

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই কয়েকজন তরুণ-যাঁদের বয়স ছিল ১৭ থেকে ২০ বছরের মধ্যে বুঝতে পারলেন, তাঁরা নাটকের বক্তব্য দর্শকদের মধ্যে কমিউনিকেট করেতে পারেন। কালীতলা কলোনীর বিজয়া সম্মিলনীতে তাঁরা মঞ্চস্থ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গ নাটক 'হারানের নাত জামাই'। তাঁদের মধ্যেই একজনের উপর দায়িত্ব ছিল নির্দেশনার। একজন করলেন আলোক সম্পাত, একজন শব্দ-প্রক্ষেপন। নিজেরাই মঞ্চ সজ্জা করলেন। নাটকের শেষে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে তাঁরা আনন্দিত হলেন এটা বুঝে নাটক যা বলতে চেয়েছে তাঁরা তো বলতে সক্ষম হয়েছেন। সেই উদ্যম ও উৎসাহে কালীতলা কলোনীতে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জন্ম নিলো নাট্যদল 'জেহাদ'

সংগঠনের শুরুতেই বা সূচনাতেই ভাবনা ছিল শিল্পের জন্য শুধু শিল্প নয়। মানুষের জন্য শিল্প, গণচেতনার অন্যতম এক মাধ্যম নাটক। সেই ভাবনায় আজও এঁরা অবিচল বলে দাবি করেন।

'হারানের নাত জামাই' নাটক দিয়ে শুরু করে 'অক্টোপাস', 'নরক গুলজার' ইত্যাদি আট খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক, 'নৈবচ', 'আসামী-হাজীর' প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাদের আঠারখানি একাংক, 'আদাব' এসো মুক্ত করো ইত্যাদি নামের চারখানি পথ নাটক এবং দু'খানি ছোটদের নাটক এ পর্যন্ত এঁরা প্রযোজনা/মঞ্চস্থ করেছেন। কয়েকখানি শ্রুতি নাটকেরও অনুষ্ঠান এঁরা করেছেন।

সংগঠনের জন্মলগ্ন থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এরা কালীতলা কলোনীর একখানি পরিত্যক্ত ঘরে নাটকের মহলা এবং সংগঠনের কাজকর্ম চালাবার জন্য ব্যবহার করতেন। '৯৭এর পরে এঁদের ওই ঘর ছেড়ে দিতে হয়, এখনো পর্যন্ত এঁদের কোন স্থায়ী মহলা কক্ষ নেই, কিন্তু এঁরা হতাশ না হয়ে নাট্যচর্চার তাগিদে, নোতুন কিছু বলার তাগিদে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে চলেছেন।

দীর্ঘ বৎসরের নাট্যচর্চার মধ্য দিয়ে এঁরা নিজেরাই তৈরি করেছেন নিজেদের

নাট্যকার, নির্দেশক প্রভৃতি মঞ্চের নেপথ্য শিল্পী এবং সর্বোপরি তৈরি হয়েছে একটি দর্শক সমাজ। জেহাদ-এর জনপ্রিয়তার তৈরি হয়েছে কালীতলা নাট্যমঞ্চ।

১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা "জোনাকী" নামে ছোটদের একখানি পূজাবার্ষিকী প্রথম প্রকাশ করেন।

—আলোচ্য নাট্যসংস্থা প্রেরিত প্রতিবেদন থেকে শ্রীনৈমিষারণ্য মুখোটী কর্তৃক সংক্ষেপিত।

সঞ্চারী (কোন্নগর)

(প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০)

১৯৮০ সালে কয়েকজন যুবকের প্রচেষ্টায় 'সঞ্চরী' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা কোন্নগরের বুকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সাংস্কৃতিক চর্চাই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য। এই আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং রুচিশীল নাট্রাভিনয় ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ ২০ বছর 'সঞ্চরী' নিয়মিত ভাবে করে আসছে। কোন্নগরে নাট্যচর্চার এইরূপ ধারাবাহিকতা এক বিরল দৃষ্টান্ত বলা চলে।

প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে আজো যাঁরা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে চলেছেন তাঁরা হলেন, সর্বশ্রী ভাস্কর বসু, হিরণ গাঙ্গুলী, সুজিত মিত্র, প্রসূনজ্যোতি রায়মিত্র, মঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় আচার্য শঙ্কর দাস, বৈদ্যনাথ দাস, সুবীর দাস, অরুণ ঘোষ, তপন চট্টোপাধ্যায়, শ্যামল কুণ্ডু, প্রিয়দর্শী ঘোষাল, পরবর্তীকালের সক্রিয় সদস্যরা হলেন, মৃত্যুঞ্জয় ঠাকুর, অসীম বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিত বড়াল, দেবব্রত ঘোষ, অরুণাভ মুখোপাধ্যায়, প্রদীপ্ত গাঙ্গুলী, প্রদীপ ভট্টাচার্য, রাজা সরকার, এবং অশোক বিশ্বাস। আর এঁদের সকলকে নিয়ে সঞ্চালকের আসনটি যিনি দৃঢ়ভাবে আগলে রেখেছেন, সেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শ্রী শঙ্কর গাঙ্গুঁলীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য।

'সঞ্চারী' ২৯/১/২০০০ এ কোন্নগর বঙ্কিম মঞ্চে উৎপল দত্তের রাইফেল এবং পরবর্তী বছরে 'ঝিন্দের বন্দী' বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে প্রযোজনা করে।

লেখক ঃ শঙ্কর গাঙ্গুলী

শিল্পতুলি

(প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৮০)

শিল্পতুলি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও- এর অতীত ইতিহাস অন্যকথা বলে। ১৯৭০-৭১ সালে আমরা কয়েকজন একত্রিত হয়ে 'রং তুলি' নামে এক সংস্থার প্রতিষ্ঠা করে। এই রংতুলির ছত্র ছায়ায় শ্রী পুলেকেন্দু দাসগুপ্ত রচিত 'ফুলি-একটি মেয়ের নাম', 'পচা মন্ত্রী হবে' 'পরগাছা', 'অর্থ হেলেন কথা', 'রাধা', 'আসবে দিন' বেশ কয়েকবার মঞ্চস্থ হয় এবং গুনীজন কর্তৃক প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হয়। এরপর ১৯৮০ সালে আত্ম প্রকাশ ঘটে 'শিল্পতুলি' সংস্থার। শিল্পতুলি পরিবেশিত প্রথম নাটক রতন ঘোষ রচিত "সমুদ্র সন্ধানে"। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পর পর নাটক মঞ্চস্থ করে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করে চলেছে। নাটক গুলি হলো, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ছোট গল্প অবলম্বনে পুলকেন্দু দাসগুপ্ত নাট্য রূপায়িত 'ছোট বকুল পুরের যাত্রী', মনোজ মিত্র রচিত 'শিবের অসাধ্যি', শ্যামাকান্ত দাসের 'আর এক ঝিন্দের বন্দী', বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের-এর 'অকটি অবাস্তব গল্প', মনোজ মিত্র রচিত 'পরবাস'। 'পরবাস' প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে 'পরবাস' একখানি পূর্ণাঙ্গ নাটক। নাটকখানির ক্ষুদ্র সংস্করণ করে প্রতিযোগিতার আসরে মঞ্চস্থ করা হয় ও পুরস্কৃত হয়। শ্যামলতনু দাশগুপ্তর "ভোরাই খেয়া" নাটকখানি কয়েকবার মঞ্চস্থ হয়। 'আসবে দিন' নাটকখানি ধানবাদে প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার লাভ করতে সক্ষম হয়। শিল্পতুলির আর একখানি মঞ্চসফল নাটক 'তারাপদ এণ্ড কোং'। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জেহাদ স্বরূপ পুলকেন্দু দাশগুপ্তর 'ঈশ্বর আল্লা যীশু' বহুবার অভিনীত ও পুরস্কৃত নাটক। শিল্পতুলির পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক শিক্ষার্থী শিল্পী, নাটক অভিনয় করার সুযোগ লাভ করে শিল্পী জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, শিল্পতুলির আর এক পর্বে ১৯৮৫-৮৬ সাল থেকে শিশুদের নাটক নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। নাটকগুলি রাধা রমন ঘোষ রচিত "একধামা আলু 'ও' চিচিঙ্গে এণ্ড কোং"। পুলকেন্দু দাশগুপ্ত রচিত 'রাজার রাজা', অমল রায়-এর "উৎসবের ফুল", মনোজ মিত্র রচিত 'রাজার পেটে প্রজার পিঠে', এবং আরে বেশ কয়েকখানি শিশু নাটক শিল্পতুলির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় ও গুণীজন কর্তৃক প্রশংসিত হয়। উপরোক্ত নাটকগুলির পরিচালক ছিলেন শ্রী পুলকেন্দু দাশগুপ্ত।

শিল্পতুলি শুধু নাট্য সংস্থাই নয়, প্রতি বছর আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

লেখক ঃ পুলকেন্দু দাশগুপ্ত

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন

(প্রতিষ্ঠা ঃ ১৮৯৪)

১০৬ বছরের প্রাচীন নাট্যসংস্থা হুগলি জেলায় কেন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা সন্দেহ। এমনই এক নাট্য সংস্থা ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৪এ। তখন এই নাট্য সংস্থার ঠিকানা ছিল অতুল চন্দ্র মিত্র লেন। বর্তমান ঠিকানা ক্রাইপার রোড, কোন্নগর। এবং সংস্থার মহলা কক্ষটি পৌরসভা কর্তৃক নার্স কোয়াটার রূপে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন সংলগ্ন একখানি কক্ষ মহলা কক্ষরূপে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নকে ব্যবহার করতে দিতে কোন্নগর পৌরসভা বাধ্য হয়েছে। আরো জানা গেল, পৌরসভা যথাশীঘ্র এই সংস্থার জন্য পৃথক মহলা কক্ষ নির্মাণ করে দেবেন।

ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠার ইতিহাস বর্ণিত হলো। ১৮৯৪, সেই সময়ের কোন্নগরের কয়েক জন নব্য শিক্ষিত যুবক শ্রদ্ধেয় মন্মথ নাথ মিত্র, হরিসত্য মিত্র, বঙ্কিম চন্দ্র চন্দ্র, ভূধর মিত্র, জ্ঞান দে, জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, সতীশ চন্দ্র মিত্র শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র, পূর্ণ মিত্র, আশু ঘোষ প্রমুখেরা এক সংগে খেলাধূলা করতে করতে তাঁদের ইচ্ছে হলো থিয়েটার করবেন। এই ইচ্ছে থেকেই জন্ম হলো ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের দেব পাড়ায় আশু ঘোষ মহাশয়ের বাড়িতে। নাট্য সংস্থা গঠিত হলেও অর্থাভাবে তাঁদের পক্ষে নাটক মঞ্চায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এই খবর পৌছল হরিসত্য বাবুর দাদা অতুল বাবুর কাছে। অতুল বাবুর খুবই স্নেহভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন হরিসত্যবাবু, তাই অতুলবাবু দেবপাড়া থেকে এই নাট্য সংস্থাকে তুলে এনে তাঁর বাড়ির বৈঠক খানায় বসালেন, এবং নিজের সখের যাত্রা দল বন্ধ করে দিয়ে মঞ্চ ব্যবস্থা, দৃশ্যাদি, পোষাক তৈরি এছাড়া থিয়েটার করার জন্য যা যা দরকার নিজের খরচায় তার সব কিছু ব্যবস্থা করে দিলেন। বলা যেতে পারে তিনি এই নাট্য সংস্থার কর্ণধার হয়ে গেলেন। নাচ, গান, বাজনা ও পরিচালনার জন্য তিনজন মাষ্টার ঠিক করে দিলেন। নাচগান শেখানোর জন্য নিজের খরচায় কলকাতা থেকে নিয়ে এসেছিলেন অতুল কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়কে। এছাড়া

নাট্যশিক্ষক, উপদেষ্টা ও পরিচালনার জন্য কলকাতার সাধারণ রঙ্গ মঞ্চের সংঙ্গে জড়িত প্রতিথযশা শিল্পী যেমন দানীবাবু, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফী, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রমুখদেরও এই সংস্থার সংঙ্গে জড়িত করেছিলেন। প্রকাশ চন্দ্র মুস্তাফী ছিলেন এই নাট্য সংস্থার নিয়মিত পরিচালক।

সেই সময় যখন থিয়েটার কলকাতা পাবলিক থিয়েটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ তখনই ১৮৯৮ সালে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন শুধু কোন্নগরেই নয় সারা পশ্চিম বাংলার শৌখিন নাট্যসংস্থার অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

স্থানীয় চণ্ডীতলার মাঠে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় 'কপালিনী' এরপর বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয় পদ্মিনী, সংসার, বলিদান, বিল্বমঙ্গল, কপাল কুণ্ডলা, আলিবাবা, কুব্জ দর্জী, কৃপণের ধন, দুর্গাদাস, পুরুরাজ, ধর্ম্মবিপ্লব, নবাবী আমল, পুনর্জন্ম, ভীষ্ম, পাণ্ডব গৌরব, আদর্শ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি নাটক। দর্শক বৃন্দের চাহিদার জন্য কোন কোন নাটক একাধিক রজনী অভিনীত হয়েছে। নাটকগুলি অভিনীত হয় শ্রীরামপুরে তারাপদ লাহিড়ী মহাশয়ের বাড়িতে, চুঁচুড়ায় সাধারণ মঞ্চে, কলকাতার রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে, কলাছড়ায় এবং অন্যান্য জায়গায়। নাটকের অভিনয় ক্ষেত্রে চরম সাফল্যের কারণ কোন একখানি নাটক কমপক্ষে ছ'মাস মহলা দেওয়া হোত। ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন-এর নাটক মঞ্চায়নের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হবে না। একবার রাজা দিগম্বর মিত্রের পুত্র কুমার মন্মথ রায় এই সংস্থাকে তাঁদের কলকাতার বাড়িতে দুর্গাদাস ও আলিবাবা নাটক দু'খানি অভিনয় করার জন্য আমন্ত্রণ জানান, সেই সংঙ্গে তখনকার দিনের কলকাতা সাধারণ মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা গিরীশ ঘোষ, দানিবাবু, অর্ধেন্দু শেখর, তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রমুখদের নাটক দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেই সময় কলকাতার পাবলিক স্টেজে দুর্গাদাস নাটকের অভিনয় হচ্ছিল এবং দুর্গাদাসের ভূমিকার অভিনেতা দানিবাবু। নাটকদেখার নিমন্ত্রণ পেয়ে গিরীশ বাবু মন্তব্য করেন, "তোমাদের দেশের নাটক আর কি দেখব"। তবু তিনি নাটক দেখতে আসেন এবং দুর্গাদাস-এর ভূমিকায় হরিসত্য মিত্রের অভিনয় দেখে তাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, "তুমিতো আমাকেও হারমানিয়ে দিয়েছ", আর গিরীশবাবু বলেন, এ্যামেচার ক্লাব যে পাবলিক স্টেজের মত ভাল নাটক করতে পারে তা আমার ধারণা ছিল না।

১৯২৭ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও সাধারণ পাঠাগারের সাহায্যার্থে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন 'পুরুরাজ' ও 'পুনর্জন্ম' নাটক দু'খানি মঞ্চস্থ করে। ১৯৩০ সালে 'ভীষ্ম', ১৯৩৪ সালে 'আদর্শ ব্রাহ্মণ', ১৯৫২ সালে গৈরিক পতাকা ও 'চরিত্রহীন এবং ১৯৭৭ সালে কেদার রায় অভিনীত হয়। এরপর দীর্ঘদিন 'ইউনিয়ন'-এর গতিপথ শ্লথ হয়।

ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নকে পুনরুজ্জীবিত করতে কয়েকজন নাট্যপ্রেমীর প্রয়াসে ও প্রচেষ্টায় ৯/৮/৯৭ তারিখে ধ্রুবনাম মিত্র স্মরণে ১০৪ তম বর্ষপূর্তি উৎসব উপলক্ষে সাজাহান নাটক, ১৪/১১/৯৮ এ রবিন মিত্র স্মরণে ১০৫ তম বর্ষপর্তি উৎসবে 'জীবন রঙ্গ' এবং '৯৮ সালে আরো একখানি নাটক 'ঝিনুকে মুক্তো' মঞ্চস্থ হয়। এরপর রবীন্দ্র ভবনের সংস্কারে কাজ চলার জন্য কোন নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৬৫ সালে ট্রাষ্টি সত্যহরি মিত্র, বিশ্বনাথ মিত্র ও প্রভাত রায় মিত্রের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও মন্মথ নাথ মিত্রের ইচ্ছানুসারে ফ্রেন্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি যার আনুমানিক মূল্য দেড়লক্ষটাকার মতো কোন্নগর রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন তৈরির উদ্দেশ্য কোন্নগর পুরসভাকে সর্তসাপেক্ষে দান করে।

ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের বর্তমান অছি পরিষদের সদস্যবৃন্দ সর্বশ্রী প্রভাত কুমার রায় মিত্র, ইন্দ্রনাথ মিত্র ও মণীন্দ্র নাথ মিত্র। এবং কর্মপরিষদের সভাপতি শ্রী বিষ্ণু দত্ত ও যুগ্ম সম্পাদক শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী স্বপন ঘোষ।

প্রতিবেদক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্নগরে নাট্য চর্চা

বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে কোন্নগরে নাট্য চর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। কোন্নগরে প্রায় ২৪/২৫টি নাট্যসংস্থার নাম পাওয়া যাচ্ছে যার মধ্যে বর্তমানে আটটির অস্তিত্ব রয়েছে। এছাড়া কয়েকটি যাত্রার সংগঠনও ছিল।

এখানে অধুনালুপ্ত কয়েকটি নাট্য সংস্থার ইতিহাস বর্ণিত হলো—

দীপালি সমিতি ঃ ১৯৩৪ সাল নাগাদ উত্তর কোন্নগরে কয়েকজন যুবক যথা—অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামরেণু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি 'বালক সমিতি' নামে এক নাট্য সংস্থা গঠন করে শম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাইরের ঘরে। এদের কার্যালয় ছিল এস. সি. মুখার্জী স্ট্রীটের অক্ষয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির উল্টোদিকেঅবস্থিত ঘরে। এই সংস্থার নিবেদিত নাটক—শ্রীদুর্গা, অসবর্ণা, শিবশক্তি প্রভৃতি। ১৯৩৪-৩৬-র মধ্যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। সেই সময়ে বিজলী আলো ছিল না, তাই ডেলাইটের আলো জ্বেলে অভিনয় হতো।

এর পরে এই সংস্থায় নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায় যোগদান করেন ১৯৩৭ সালে, নোতুন নাম হোল 'দীপালি সমিতি'। কার্যালয় হোল কৃষ্ণ চন্দ্র মান্নার দোকান ঘর। নাটক মঞ্চায়নের স্থান—মান্নাদের পুকুর বোজান মাঠ, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, রাজরাজেশ্বরীতলার মাঠ, শিরীষতলার মাঠ প্রভৃতি।

অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন—রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিপিন মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্র বিজয় চট্টোপাধ্যায়, গৌরীকান্ত গাঙ্গুলী, ঠাকুর গোপাল গাঙ্গুলী, দুলাল মুখার্জী প্রভৃতি। মঞ্চস্থ নাটকগুলি হল—ষোড়শী, (১৯৪১), শিরীষতলা, মাটির ঘর, দুই পুরুষ, সিরাজদ্দৌল্লা, রামের সুমতি, বিন্দুর ছেলে, মেজদিদি, কর্ণার্জুন, বিরাজবৌ, চন্দগুপ্ত, আবুহোসেন, সাবিত্রী, ঘূর্ণী, পি. ডব্লিউ ডি, পথের দাবী, পরিচালনা শ্রী অনিল মুখোপাধ্যায় (শ্রীরামপুর)। এদের আর একখানি মঞ্চসফল নাটক বৈকুণ্ঠের খাতা। বিপিন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনা ও সমীর গাঙ্গুলীর

প্রযোজনা। অভিনয়ে অংশ নেন সমীর গাঙ্গুলী, বিপিন মুখোপাধ্যায়, গৌরীকান্ত গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ১৯৭৮ সালে শেষ অভিনয় মনোজ মিত্রের কেনারাম বেচারাম।

এখানে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়, ১৯৪৭ সালে রাজ্যপাল কাটজুর সময়ে রাজভবনে ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় যোড়শী নাটকখানি মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনায় ছিলেন নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে ড. কাটজু হাজার টাকা পুরস্কার দেন।

কোন্নগর ক্লাব ঃ প্রাথমিক নাম করণ হয়েছিল আন ম্যারড ইউথ ড্রামাটিক এসোসিয়েশন, পরে নামকরণ হয়—কোন্নগর ক্লাব। সংগঠকগণ—অজিত ঘোষ, সজিত ঘোয, কুমুদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বোঁচা), নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়, সুধামাধব চট্টোপাধ্যায়, রাধাকান্ত চট্টোপাধ্যায় (চেনু), গৌরীকান্ত গাঙ্গুলী। নাটক—বিন্দুর ছেলে, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি।

প্রথমে এই সংস্থার কার্যালয় ছিল অজিত ঘোষের বাড়ি, পরে নিজস্ব ভবন তৈরি হয় প্রসাদময়ী দেবী লেনে। ১৯৬৩-৬৪ সালে নিয়মিত কার্যকলাপ চলেছিল, পরে কিছুদিন ছেদ পড়ে, পুনরায় আবার নাটকাভিনয় শুরু হয়, নাটকগুলি পথের দাবী, কেনারাম বেচারাম, সীতাহরণ প্রভৃতি। কার্যকলাপে সম্পূর্ণরূপে ছেদ পড়ে ১৯৭৪-৭৫ সালে।

সয়রী ক্লাব ঃ হাতীরকুল ঃ কার্যকাল—১৯৪৩-১৯৭০ সাল। বিভাগ খেলাধূলা—ভলিবল ও টেবিল টেনিস এবং অর্কেষ্ট্রা। নাট্যচর্চা—বিভিন্ন সময়ে এবং স্থানে যে নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়—নামনেই; বাঙালী, দুইমহল, দেবলাদেবী, রাইফেল, সানিভিলা, ক্ষুধা প্রভৃতি।

সংগঠকগণ— ঃ নিমাই গাঙ্গুলী, অমিতাভ মুখার্জী, কানাই গাঙ্গুলী, প্রয়াত সুশীল গাঙ্গুলী, গৌর ভট্টাচার্য, অহীন সেন, মনু মুখার্জী, প্রভৃতি।

ভিলেজ রিক্রিয়েশন ক্লাব ঃ এ. এল. ব্যানার্জী স্ট্রিট ঃ কার্যাকাল—১৯২০-৩২। প্রতিষ্ঠাতাগণ ঃ ভবানী সেনগুপ্ত, প্রভাত চ্যাটার্জী (বাদল), অরুণ চ্যাটার্জী (আদল), শিব প্রসাদ ঘোস, সুবোধ চ্যাটার্জী (বর্তমানে এঁরা সকলেই প্রয়াত)।

রজনীকান্ত সেনগুপ্তর বাড়িতে নাটকের মহলা হোত।

মঞ্চায়িত নাটক ঃ পোষ্যপুত্র, কুব্জদর্জি, মেবার পতন, প্রতাপাদিত্য জনা প্রভৃতি।

জগদীশ ক্লাব ঃ কার্যকাল ১৯৩০-১৯৪২

মহলা কক্ষ ঃ সুরথ ব্যানার্জী লেনে বটু জানার বাড়ি

চরিত্র রূপায়নে ঃ বিজয় ভট্টাচায, সুধীর দত্ত, উপেন ঘোষ, বেচু বাগ, জয়দেব ভট্টাচার্য, সুবোধ মুখার্জী, সুবোধ চ্যাটার্জী।

মঞ্চায়িত নাটক ঃ মাটির ঘর, পোষ্যপুত্র, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি।

মেরী ক্লাব ঃ কার্যকাল ১৯২৪-১৯৪০

নাট্যচর্চার স্থান ঃ রায়পাড়া লেন

নাট্যামঞ্চায়নের স্থান ঃ শ্রীঅরবিন্দ রোডে পলিন বসুর বাড়ির পশ্চিমের খোলা মাঠে।

অংশগ্রহণকারী ঃ গজেন্দ্রনাথ মিত্র, সুবোধ কুমার মিত্র, কানাই মিত্র, জয়কৃষ্ণ মিত্র, শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, ললিত ঘোষ, রবীন্দ্র নাথ মিত্র, সুধাংশু কুমার দে, (মটুক দা), প্রভাস ঘোষ (কালোদা), অনাথ বন্ধু ঘোষ (বুলবুল), সত্যচরণ দাস, রাস বিহারী ব্যানাজী, বিজয় ভট্টাচার্য, তারক দাস (এঁরা সকলেই প্রয়াত)

মঞ্চায়িত নাটক ঃ স্বামী স্ত্রী, জনা, কুব্জ দর্জি, চন্দ্রগুপ্ত, কর্ণার্জুন, মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মিশরকুমারী, কেদার রায় প্রভৃতি।

বীণাপানি ক্লাব ঃ কার্যকাল—১৯২৪-১৯৪০

নাটচর্চার স্থান ঃ থিয়েটার লেনে (প্রসাদময়ী দেবী লেন) অবস্থিত ছিল। প্রয়াত অমর তরফদারের বাড়িতে এই সংস্থার সূচনা হয়। পরে ঐ রাস্তায় অধর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে সংস্থার কাজ চলতে থাকে।

প্রতিষ্ঠাতাগণ ঃ সুধীর চট্টোপাধ্যায় (প্রিংদা), পূর্ণচন্দ্র মিত্র, জ্যোতির্ময় মুখোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়। নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ইনি অর্থ, সময় ও শ্রমদান করে প্রতিষ্ঠানকে গতিশীল করে তোলেন।

মঞ্চস্থ নাটক ঃ বলিদান, সীতা, কর্ণার্জুন, কুব্জদর্জি নাটক। শেষ অভিনয় হয়েছিল শিয়ালদহের নেতাজী মঞ্চে।

একের পল্লী মঞ্চঃ কার্যকাল ১৯৬০-১৯৮০

চরিত্র রূপায়ণে ঃ সন্দীপ ভট্টাচার্য, শান্তনু গাঙ্গুলী, সুকুমার রায়, অয়ন ভট্টাচার্য, সৌরভ ব্যানার্জী, সমর নস্কর, রবি সরকার, বেচু তরফদার, রাজকুমার ব্যানার্জী, চঞ্চল মুখার্জী প্রভৃতি।

মঞ্চস্থ নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথের গল্প অবলম্বনে 'ভিটেমাটি'। নির্দেশনা দুলাল বিশ্বাস। রবীন্দনাথের গল্প অবলম্বনে 'অপরিচিতা'। নাট্যরূপ—চঞ্চল রায়। নির্দেশনা—দুলাল বিশ্বাস। অভিনয়ে—সুনীল ভট্টাচার্য, অয়ন ভট্টাচার্য, সৌরভ ব্যানার্জী, সুকুমার রায়, শান্তনু চ্যাটার্জী, বেচু তরফদার, বিদিশা বসু, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, রাজকুমার ব্যানার্জী, চঞ্চল মুখার্জী প্রভৃতি। 'তারাপদ এণ্ড কোং—নির্দেশনা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে—ভূপেন ব্যানার্জী, তপন চ্যাটার্জী, দুলাল বিশ্বাস, শান্তনু গাঙ্গুলী, চঞ্চল মুখ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ ভট্টাচার্য, অয়ন ভট্টাচার্য, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। 'একটি অবাস্তব গল্প'—নির্দেশনা—অশোক চট্টোপাধ্যায়। অভিনয়ে—সুকুমার রায়, শুভায়ু তরফদার, মৌমিতা ব্যানার্জী, অনুপম ব্যানার্জী ও আরো অনেকে।

উলুগুনান ঃ কার্যকাল ১৯৮০-১৯৯৬

কার্যালয় ঃ এস. সি. মুখার্জী স্ট্রিট ; সরোজ চৌধুরীর বাড়ির কাছে।

মঞ্চস্থ নাটক ঃ তক্ষক, আব্দুল সামাদ, স্বাধীনতার স্বাদ, বরাহ অবতার, লাঠি, তোতাকাহিনী, তড়কা (একাংক), বিসর্জন, সাজানো বাগান,।

অংশগ্রহণে ঃ বিমান ভট্টাচার্য, তারক, বাবলু, তপী, খনা, রাজীব, চন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুদীপ তরফদার, অনুপ ব্যানার্জী, অসিত সাধুখাঁ, পুলক বসু, অংশুমান রায়, পরগ বসু, বিদিশা সরকার, সুতপা রায়, শুভঙ্কর, শঙ্কর, সমীর চ্যাচার্জী।

প্রয়োগে—বিমান ভট্টাচার্য, সমীর চ্যাটার্জী, চন্দ্রনাথ মুখার্জী, সুব্রত কাঞ্জিলাল। সংচালিকা—মোনালিসা চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীরঙ্গ রূপম ঃ কার্যকাল—১৯৬০-১৯৮৬

নাট্যচর্চার স্থান ঃ বলরাম মান্নার টালির ঘর

প্রয়োগে ঃ প্রয়াত দেবী প্রসাদ চ্যাটার্জী, মানস কুমার মুখার্জী, অশোক চ্যাটার্জী।

একাংক নাটকের নাট্যকার ঃ লোকনাথ চ্যাটার্জী।

চরিত্র রূপায়নে ঃ প্রয়াত প্যারীমোহন মুখার্জী, প্রয়াত বলরাম আদক,

প্রয়াত মদন মোহন ধোলে, গৌরমোহন ব্যানার্জী, গোবিন্দ আদক, মানস কুমার মুখার্জী, অশোক চ্যাটার্জী, দুলাল বসু, নবকুমার ভট্টাচার্য, নবকুমার চ্যাটার্জী, গোবিন্দ ওঝা, মুরারি রায়, মহাদেব ভট্টাচার্য, চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

চতুর্মুখ

সংস্থার শেষ নাটক ঃ চন্দ্রগুপ্ত (১৯৮৬)

অভিনয়ে—বোঁচাদা, কালীনাথ গাঙ্গুলী, ভোলানাথ ব্যানার্জী।

তথ্য সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

তথ্য সংগ্রহে সহায়তা করেন—সর্বশ্রীগৌরী কান্ত গাঙ্গুলী, মণীন্দ্রনাথ মিত্র, দুলাল বিশ্বাস অনিল চ্যাটার্জী, অমিতাভ মুখার্জী

সঞ্জীবনী

(স্থাপিত ঃ ১৯৯৭)

একটি নাট্য প্রতিষ্ঠান। যদিও এই প্রতিষ্ঠান বিগত দুটি বছরে 'সোনাই দীঘি', 'নটী বিনোদিনী' পালা দু'খানি আসরস্থ করেছে এবং বর্তমান বছরে (২০০১) মা-মাটি মানুষ আসরস্থ করার প্রস্তুতি চলছে। যাত্রাভিনয় করলেও এই সংস্থা থিয়েটার ও শ্রুতিনাটকের অনুষ্ঠান করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। সঞ্জীবনী শুধু যাত্রাভিনয়ে ব্যস্ত থাকে না এরা স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। ২০০১ সালের ১৫ই জুলাই এই সংস্থা এক চক্ষু পরীক্ষা ও ছানি অপারেশন শিবিরের আয়োজন করে। প্রায় ২৫০ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয় এবং ৩২ জন ছানি অপারেশনের সুযোগ পায়।

সংস্থার বর্তমান সভাপতি শ্রী বিলাস চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক শ্রী রমেশ গোস্বামী এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক ঃ বিষ্ণু দে।

কোন্নগর মধ্যাঞ্চলের অতীতের নাট্য চর্চার ইতিহাস ঃ

কোন্নগর চড়কতলা ও বারোয়ারীতলা বেষ্টিত ক্ষুদ্র এলাকায় ৩০-৬০ দশকের মধ্যে অনেকগুলি নাট্য সংস্থা গড়ে উঠেছিল। এই অঞ্চলের নাট্য ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন—দুর্গা প্রসাদ বসু, হরিদাস কর, পূর্ণ মিত্র, বলাই সরকার, রমা প্রসাদ মুখার্জী, দুলাল ব্যানার্জী, ফকির মুখার্জী, সোমনাথ মিত্র, রবীন্দ্র নাথ মিত্র (ব্যাঙ), কালিদাস ব্যানার্জী, ধ্রুব মিত্র, শৈলেন্দ্র নাথ পাত্র, দুলাল চক্রবর্তী, জগন্নাথ বসু, কিশোরী মোহন চ্যাটার্জী. ধীরেন্দ্র নাথ ঘোষ, উপেন্দ্র ঘোষ, সুধীর মিত্র, সুশীল মিত্র, কানাই ঘোষ, গোষ্ঠ বিহারী ঘোষ, সত্য দেব মিত্র প্রভৃতি।

নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলির নাম ঃ ভারত সঙ্ঘ, শিল্পায়ন, নবনাট্য পরিষদ, ইয়ংআর্ট ক্লাব।

নাট্য মঞ্চায়নের স্থান ঃ চড়কতলা. কদম পুকুর, বারোয়ারীতলা, কালী দালান, জ্যোতিষ মিত্রের মাঠ প্রভৃতি।

তথ্যসূত্র ঃ চন্দ্রনাথ মিত্র ও দুর্গাপ্রসাদ বসুর
সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে

অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব

এই সময়ে কোন্নগরের কারখানাগুলিতে যথা—বেঙ্গল ডিস্টিলারিস, বেঙ্গার ল্যাবরেটারিস, ডি ওয়ালডি প্রভৃতির রিক্রিয়েশন ক্লাবগুলিতে ৫০-৭০ দশকের মধ্যে বাংলা, হিন্দী ও ওড়িয়া নাটক মঞ্চস্থ হোত।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

পরিশিষ্ট ঃ

কোন্নগরে প্রায় ২৩টি নাট্যক্লাবের নাম পাওয়া যায়, নাট্যক্লাব হলেও এর মধ্যে কয়েকটির অন্যান্য বিভাগও আছে। ২৩টি নাট্যাসংস্থার মধ্যে বর্তমানে ছটির অস্তিত্ব আছে। অন্যগুলি এক সময়ে গৌরবময় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ছ'টির বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এই অধ্যায়ে ১০টি অধুনালুপ্ত নাট্য সংস্থার বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হল। অবশিষ্ট সংস্থাগুলির ইতিহাস সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি নানা কারণে। তবে এগুলি চড়কতলা ও তিন বাতির কাছাকাছি ছিল এই পর্যন্ত জানা যায়। এগুলির অস্তিত্ব খুব কম সময়ের জন্য বজায় ছিল।

বর্তমানে কোন্নগরে নাট্য চর্চার গতি বহুলাংশে শ্লথ হয়ে গেছে, বিশেষ করে কোন্নগরের মধ্যাঞ্চলে, এর কারণ কি তা সংস্কৃতি প্রেমী ও সমাজ সচেতন মানুষের অনুসন্ধান ও গবেষণার বিষয়।

কোন্নগরে যাত্রাপালারও এক গৌরবময় ও পুরাতন ইতিহাস আছে, কিন্তু পুরাতন কাগজপত্র ও তথ্যের অভাবে তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হল না। এই পালাগুলি আসরস্থ হোত কোন্নগর বাজারের কাছে চণ্ডীতলার মাঠে। উত্তর কোন্নগরের টোল বাড়ির মাঠে, রাজ রাজেশ্বরীতলা ও শ্রীদুর্গাকটন মিলের প্রাঙ্গনে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সংগ্রামী সংঘ

সংগ্রামী সংঘ, নামেই তার পরিচিতি, কোন্নগরের এক অজ্ঞাত, অখ্যাত পল্লীর একটি গলি, নাম, রামচন্দ্র ঘোষাল লেন। ঐ গলিরই কয়েকজন ছেলে তাদের ছেলে মানুষীর খেয়ালে ও নোতুন কিছু একটা করার প্রেরণায় হঠাৎই ১৯৪৭ সালের কোন একদিনে বহু পুরোনো পোড়েল পরিবারের একটি ফাঁকা জায়গায় খুঁড়ে ফেলল একটি কুস্তির আখড়া।

শুরু হলো শরীর চর্চা। তখন পরাধীন ভারতের দিকে দিকে দেশকে স্বাধীন করার জন্য আন্দোলন চলছে দুর্বার গতিতে, নিজেদের শরীরকে শক্তপোক্ত করার জন্য তখন চলেছে অনলস অনুশীলনের প্রয়াস। এই অঞ্চলের ছেলেরা সেই সময় চালু করেছিল এই কুস্তির আখড়া ও সেই সঙ্গে আরম্ভ হলো আরো অনেক কিছুই।

প্রথম দিকে এই পাড়ার কেষ্ট মণ্ডল ও মান্না বাড়ীর (বিশ্বম্ভর ব্যানাজী লেন) কানাই মান্নার যুগপত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে আস্তে আস্তে গড়ে উঠল 'সংগ্রামী সংঘ'। আরো অনেক নবীন কিশোর যুব সম্প্রদায় এগিয়ে এলো গড়ার কাজে। এরপরে এই পাড়ারই নন্দ দুলাল ব্যানাজীর টালির ঘরে (ভানুর) ওই ক্লাবের আসর জাঁকিয়ে বসল। খেলা ধূলার সাথে সাথে পাড়ার দুঃস্থ ছাত্রদের পঠন পাঠনের সুবিধার জন্য একটি পাঠকেন্দ্রের চালু করা হয় এবং একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়। সংগ্রামী সংঘের সভ্যেরা নিয়মিত ফুটবল খেলার অনুশীলন করত এবং এরাই কোন্নগরের মধ্যে ও তার বাইরে অনেক ফুটবল খেলায় আসরে যোগদান করে অনেক ট্রফিও তারা জিতে এসেছিল। এই ভাবে সব কিছুই ঠিক মতন এগুতে চলার সময় সংঘের একটি নিজস্ব ঘরের অভাব বিশেষভারে অনুভূত হওয়ায় অনেক সভ্য এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠল, এরই ফলে বর্তমান বিরাট পাকা ঘর ও সেই সঙ্গে দোতলার ঘর করারও প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। এই ঘরে এখন ক্যারাম খেলা, তাস খেলা ও সংঘের সভা অনুষ্ঠিত হয়, শুধু ঘরের বা বাইরের (Indoor and Out door) খেলাই নয়, এখানে একটি নাট্য গোষ্ঠীও বিশেষ ভাবে সক্রিয়। তাই বছরে একবার অন্তত

সভ্যরা অভিনয়ের মঞ্চে তাদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখাবার ব্যবস্থা করে এবং স্থানীয়ভাবে অনেক দর্শক শ্রোতার সমাবেশ লক্ষ্যণীয়। এখনকার দিনে একটি নাটক মঞ্চস্থ করতে যে রসদের বিশেষ প্রয়োজন সফলভাবে তা পূরণ করা যে কতো কষ্টসাধ্য তা সংগঠনের কর্তা ব্যক্তিরাই জানেন। এই নাটকের কথা লিখতে গিয়ে বিশেষভাবে মনে পড়ে আমাদের সভ্য শ্রী প্রণব সেনের কথা। তিনি শুধু অভিনয়ের ক্ষেত্রে নয়, সামগ্রিক ভাবে অনেক সাহায্য করেছেন। এভাবে 'সংগ্রামী সংঘ' এখনো তার অস্তিত্ব সগৌরবে টিকিয়ে রেখেছে।

আর একটি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। 'সংগ্রামী সংঘ' তাদের নিজস্ব মাঠে (যা বিশ্বম্ভর ব্যানার্জী লেনের দক্ষিণ পার্শ্বে মান্না পরিবারের বাড়ীগুলির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত) বহু বছর ধরে একাদিক্রমে ফুটবল, ভলি, সংঘের বাৎসরিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান ও সভ্যদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, নাট্যানুষ্ঠান সহ ইত্যাদি যাবতীয় প্রমোদানুষ্ঠান সগৌরবে পরিচালনা করে আসছে এমনকি সংগ্রামী সংঘ তাদের এই মাঠ সন্নিহিত অঞ্চলের অন্য ক্লাব গুলিকেও তাদের নিজস্ব ক্রীড়ানুষ্ঠান পরিচালনা করবার অনুমতি দিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

উপসংহারে জানাই যে সংগ্রামী সংঘের বর্তমান যুগ্ম সম্পাদক হলেন সর্বশ্রী বিপ্লব ভৌমিক ও জয়ন্ত সামন্ত (জয়) এর সভাপতি হলেন শ্রী শিশির চক্রবর্তী মহাশয়

এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের সাহায্যে ও সহযোগিতায় সংগ্রামী সংঘ আরো উন্নত হোক এই আমাদের কাম্য।

লেখক - বিপ্লব ভৌমিক ও জয়ন্ত সামন্ত
যুগ্ম সম্পাদক ঃ সংগ্রামী সংঘ

কোন্নগর প্লেয়ার্স কর্ণার (স্থাপিত ১৯৭৯)

শ্রী অরবিন্দ রোড, কোন্নগর

সংস্থার দুই শাখা (১) খেলাধূলা

(২) গ্রন্থাগার ঃ বিশ্বজিৎ স্মৃতি পাঠাগার (স্থাপিত—১৯৮৬) প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ভবন আছে। পুরসভা বার্ষিক অনুদান দিয়ে থাকে। খেলাধূলা বিভাগে টেবিল টেনিস নিয়মিত শিক্ষা দেওয়া হয় এক অভিজ্ঞ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। বর্তমানে ১০/১২ জন সভ্য টেবিল টেনিস খেলায় নিয়মিত চর্চা করে থাকে। বিভিন্ন টুর্ণামেণ্টে সভ্যেরা অংশ গ্রহণ করে। যেমন ১৭ বছরের কম বয়সের প্রতিযোগিতা ন্যাশনাল স্কুল চ্যাম্পিয়ানসিপ্, আন্তঃ জেলা স্কুল চ্যাম্পিয়ানসিপ্ প্রভৃতি। এদের মধ্যে দু'জন খেলার জন্য চাকরী লাভ করেছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

চণ্ডীতলা স্পোর্টিং ক্লাব (ক্রাইপার রোড)

চণ্ডীতলা পূজা প্রাঙ্গণে অনেকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। তার মধ্যে প্রধান হলো রাম শঙ্কর বসু প্রতিষ্ঠিত 'চণ্ডী মন্দির'। ১১৭০ বঙ্গাব্দে (সম্ভবতঃ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে বিড়লা কল্যাণ ট্রাষ্ট কর্তৃক এই মন্দিরের পূর্ণাঙ্গ সংস্কার হয়। আরো দু'একটি মঠ মন্দির আছে। ১৯৯০ সাল নাগাদ পুরসভা একটি গভীর নলকূপ ও পাম্প হাউস নির্মাণ করেছে।

শোনা যায় চণ্ডীতলা পূজা প্রাঙ্গণে অনেক আগে থেকে যাত্রা ও নাট্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতো। যদিও তার ইতিহাস লিপিবদ্ধ নেই।

আধুনিক কালে চণ্ডীতলা ক্লাব পুর্ণগঠিত হয়, তখন কেবল মাত্র যাত্রার অনুষ্ঠান হতো। অফিস ঘর ছিল শৈলেন্দ্র নাথ পাত্রের বাড়িতে। এই যাত্রানুষ্ঠানের শিল্পীরা ছিলেন, ফণীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, বিমল চট্টোপাধ্যায়, রেবতী ভূষণ বাড়ু ই (সুঁটো), কার্তিক দাস, হৃষি দাস, তারক প্রভৃতি।

১৯৬২ সাল নাগাদ ফুটবল লিগ খেলা শুরু হয়। এরা নানা জায়গায় নানা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে জয়ী হতো। এই সময়ে কার্তিক দাস সভাপতি, হৃষিকেশ দাস ও নৃসিংহ দাস, সহসভাপতি, শান্তিরাম দাস, সম্পাদক এবং সহাস মজুমদার ফুটবল অধিনায়ক ছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে, একটা চূড়ান্ত খেলাধূলা প্রতিযোগিতায় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্র নাথ মুখার্জী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন।

এক সময়ে এখানে ভলিবল খেলা হত। বছরে একবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। মৃত্যুঞ্জয় মজুমদার, সোনালাল বসু, হিমাংশু দাস, কার্তিক দাস, শান্তিরাম দাস প্রমুখেরা অর্থ সাহায্য করতেন। বর্তমানে সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রী প্রভাত মুখার্জী ও শ্রী বৈদ্যনাথ গাঙ্গুলী।

সূত্র ঃ সুহাস মজুমদার   লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর মনসাতলা ব্যায়াম মন্দির

আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে মেঠোপুকুরের পশ্চিম পাড়ে "উদয় সঙ্ঘ ব্যায়ামাগার" নামে যে প্রতিষ্টানটির জন্ম হয় সেটি প্রথমে মেঠোপুকুর, পরে শ্রীমতী খাঁদুবালা দাসী প্রদত্ত একখণ্ড জমী (বর্তমানে State Bank of India র পেছনে) এবং শেষে মনসাতলা বারোয়ারী ; এই ভাবে বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তরিত হতে হতে ১৯৫৬ সালে "মনসাতলা বারোয়ারী"-র সংগে মিলিত হলো এবং মনসাতলা বারোয়ারী রূপান্তিরত হলো "কোন্নগর মনসাতলা ব্যায়াম মন্দিরে।"

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটির স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা এর মধ্যে শুধু মাত্র ৩০ হাজার টাকা সরকারী অনুদান বাদ দিলে বাকি অর্থের সংস্থান সহজে করা যায় নি। তার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের উৎসাহী সদস্যবৃন্দের বহু কৃচ্ছসাধন করতে হয়েছে। যার মধ্যে— চ্যারিটি শো, কোন্নগর-নবগ্রামবাসীর দান সংগ্রহ এমনকি কায়িক শ্রমের বিনিময়েও অর্থ উপার্জন করতে হয়েছে। শুধু মাত্র "সৌখীন মজদুরী" নয় রীতিমত শ্রমের বিনিময়ে কষ্টসাধ্য উপার্জিত অর্থের তিলতিল সংগ্রহে গড়ে উঠেছে আজকের এই প্রতিষ্ঠানটি।

কিন্তু শুধুমাত্র মাথার উপর ছাদ, কুস্তীর জন্যে আখড়া বা জিমনাস্টিকের জন্যে আলাদা জমি এইটুকু পরিকাঠামো থাকলেই চলে না কোন আধুনিক ব্যায়ামাগারের, প্রয়োজন হয় ব্যায়ামের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির এবং জিমনাস্টিকের জন্য নানা ধরনের অ্যাপারেটাস। কালক্রমে এ সবই সংগৃহীত হয় উল্লিখিত একই উপায়ে। প্রতিষ্ঠানটি দফায় দফায় চারিদিকের সংলগ্ন জমি কিনেছে যাতে প্রয়োজন মিটিয়েছে কুস্তীর আখড়া, ছাদসহ জিমনাস্টিকের জায়গা, যোগব্যায়ামের হল ঘর, অফিস ঘর ইত্যাদির।

এর পরের পর্য্যায় শুধু সার্থকতার। দিন দিন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি হতে লাগলো। কুস্তী ও ব্যায়াম প্রতিযোগিতায় তারা সাফল্য লাভ করতে লাগলো।

কুস্তীতে রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতা একানকার সভ্য প্রথম স্থান অধিকার করলো। আন্তঃ কোন্নগর এবং আন্তঃ জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় তো সাফল্য অর্জন করলোই, এখানকার সদস্যরা, এমনকি জাতীয় ও বিশ্ব প্রতিযোগিতাতেও সাফল্য লাভ করে এবং এই সুবাদে বিভিন্ন সরকারী সংস্থাতে চাকরী লাভ করে।

আজ কোন্নগর মনসাতলা ব্যায়াম মন্দির পশ্চিমবঙ্গের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে একটি অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান।

তথ্য ঃ শ্রী কেশব চন্দ্র কর
সংঘের জন্ম কালের সভ্য

লেখক ঃ শ্রী পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়

মিলন বন্দি ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৫০

স্বাধীনতা উত্তর-পর্বে পশ্চিমবঙ্গে যে সব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে তার অধিকাংশই হয়েছে তৎকালীন পূর্বপাকিস্থান তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে আগত আশ্রয় প্রার্থীদের আগ্রহে। কোন্নগর 'মিলন বন্দি ক্লাব' সম্বন্ধেও এই উক্তি প্রযোজ্য।

কিছু উদ্বাস্তু শিক্ষিত পরিবার আশ্রয় নিয়েছিলেন মার্কিন সৈন্যদের যুদ্ধ শেষে ছেড়ে যাওয়া কোন্নগর কালীতলার গুদাম সদৃশ ছাউনীর গোল গোল ঘর গুলোতে। সম্পূর্ণ অজানা নতুন পরিবেশে। আরম্ভ হয় পরিবারগুলির বেঁচে থাকার লড়াই। মাথা গোঁজবার ঠাঁই ও ক্ষুন্নিবৃত্তির সাথে সাথে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য, স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামাজিক ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ছিন্ন মূল এই সব পরিবারের কিছু উদ্যোগী উৎসাহী তরুণ ৭১নং এস, সি, চ্যাটার্জী স্ট্রীটের উপর ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'মিলন বন্দি' নামে এক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। দরমার বেড়া, টালীর চালা দিয়ে তৈরি কুঁড়ে ঘরটি ছিল এক বিশাল বটগাছের তলায়। শরীর চর্চার জন্য ছিল কিছু সরঞ্জাম। পেছনেই কবরখানার পাশে ছোট্ট খেলার মাঠ। তারে ফুটবল, ক্রিকেট ও ভলিবল চর্চা হতো। শক্তি ও বিদ্যাচর্চার জন্য পবন নন্দন মহাবীর ও সরস্বতী পূজার আয়োজন থাকতো। এছাড়া ছিল বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠান। সভ্যদের চাঁদা ও কলোনী-কমিটি প্রদত্ত একটা পুকুরে মাছ চাষ ও বিক্রি ছিল আয়ের উৎস। আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই ক্লাব 'কালীতলা বিদ্যানিকেতন' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং সরকারী স্বীকৃতি পায়। এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়।

১৯৫৯ সালের এক দুপুরে হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে বিশাল বটগাছটি উপড়ে যায়, ক্লাবঘর ভস্মীভূত হয়। এই দুর্ঘটনা শাপে বর হয়ে ওঠে। অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক

ও সভ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দ্বিতল পাকা ক্লাবঘর ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে।

সমাজ সচেতনতার স্বাক্ষর হিসাবে মিলন বন্দি ক্লাব ১৯৭১ এ একটি Co-operative Credit Society-র প্রতিষ্ঠা করেছিল। ন্যূনতম সুদে সোসাটির সদস্যদের আর্থিক সাহায্য দানই উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু নানা কারণে সেটি বন্ধ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে এঁরা ১৯৭৫ সালে যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে ক্লাবের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন করেন। পরের বৎসর একটি কৃষি ও শিল্পমেলার আয়োজন করেন। এই মেলায় মৌমাছি পালন বিষয়ক স্টল এবং তিনটি থোক-সহ একটি আঙুরলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহকুমার চাষীদের থেমে সংগৃহীত কৃষিজাত সামগ্রীর মধ্যে বারোটি ফসল পুরস্কার-যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এই উপলক্ষে বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্র 'পথের পাঁচালী' প্রদর্শিত হয়।

মিলন বন্দি ক্লাব, তরুণ সঙ্ঘ ও কালীতলা কলোনীর যুবক বৃন্দের সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে কালীতলা কলোনী বর্তমান মাঠ যা বহু গণ্যমান্য এবং ক্রীড়ামোদীদের পদার্পণ-ধন্য। তৎকালীন পুর কর্তৃপক্ষ মাঠ তৈরিতে প্রভূত সহায়তা করেন এবং মাঠ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে বর্তমান পুর কর্তৃপক্ষের সাহায্য উল্লেখযোগ্য।

ক্লাবে বর্হিবিভাগ ও অর্ন্তবিভাগে নিয়মিত বিভিন্ন ক্রীড়া চর্চা হয়ে থাকে। ক্লাবে কেবল টি.ভির ব্যবস্থা থাকায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক খেলাধুলা দেখানোর ব্যবস্থা রয়েছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত এই ক্লাবে বিভিন্ন ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্তা হতো। ১৯৯০ সালে বার্ষিক মিলনোৎসবের সঙ্গে শুরু হয় সীমিত ওবার নক-আউট ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। '৯১ সালের ৩০শে জানুয়ারী শ্রীজগমোহন ডালমিয়া, বি,সি,সি, আই-এর পক্ষে কে শুভেচ্ছা পত্রে ক্লাবের এই প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। ১৯৯৯ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি একটি উল্লেখযোগ্য দিন। দশম সীমিত ওভার নক আউট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা কোনো মফঃস্বল শহরে এই প্রথম নৈশালোকে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন গুণীজনের আগমনে এই আসর

ধন্য হয়ে উঠেছিল। এই ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় প্রতি বৎসর শিশুদের নিয়ে 'বসে আঁকো' ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা করা হয় এবং সকল শিশুদের পুরস্কার দিয়ে উৎসাহিত করা হয়।

১৯৯৬ সালে এই ক্লাব লায়নস ক্লাব (শ্রীরামপুর শাখা)-র তত্ত্বাবধানে এবং কোন্নগর উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতির সহযোগিতায় প্রথম পুষ্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে। সেই থেকে প্রতিবছর শীতকালে এই প্রদর্শনী হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে কোন্নগরের অন্যান্য ক্লাবেও পুষ্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

মিলন বন্দি ক্লাবের অঙ্গীকার হচ্ছে, নতুন প্রতিভার অনুসন্ধান ও বিকাশের সুযোগ করে দেওয়া। আগামী প্রজন্মের কাছে এটাই সমাজ সচেতন সংগঠনের দায়বদ্ধতা।

সূত্র ঃ ক্লাব সভাপতি শ্রী চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন

লেখক ঃ শ্রী পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়

মিলন সঙ্ঘ

(স্থাপিত : ১৩৬২, ইং ১৯৫৯)

৬০-র দশক নাগাদ মনসাতলা এলাকার কিছু যুবকের প্রেরণায় এই প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে। পরে বাৎসরিক সাংস্কৃতিক উৎসবের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থে জমি ক্রয় করে এবং আরো পরে সংস্থার নিজস্ব ভবন তৈরি হয়, প্রথমে একতলা, পরে দোতলা। এদের প্রেরণা দাতা ছিলেন সংস্থার সভাপতি প্রয়াত হরিদাস চট্টোপাধ্যায়। তিনি আর্থিক সাহায্যও করেছেন।

সঙ্ঘের বিভাগ সমূহ : (১) টেবিল টেনিস। টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতাও হয়।

(২) গ্রন্থাগার : রামমোহন ফাউণ্ডেশানের অর্থসাহায্যে গ্রন্থাগারের সম্প্রসারণ হয়। পুর সভার আর্থিক সাহায্য পেয়ে আসছে দীর্ঘদীন যাবৎ। উপরে যে সভা কক্ষ আছে সেখানে নানা অনুষ্ঠান সভা সমিতি অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) বর্তমানে মহিলাদের জন্য যোগব্যায়াম কেন্দ্র চলছে।

(৪) ইনডোর ও আউটডোর খেলাধূলা হয়।

(৫) অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(৬) দরিদ্র ছাত্রদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দান করা হয়।

(৭) দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য পূজার সময় জামা ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

সংস্থার বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রী অমর নাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রী বিষ্ণু দাস চট্টোপাধ্যায়।

সংগ্রাহক : বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর ওলিম্পিক ইন্‌স্টিটিউট

স্থাপিত ঃ ১৮৯৪

যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে শতবর্ষের গণ্ডী অতিক্রম করা নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেই দিক থেকে বিচার করলে কোন্নগর ওলিম্পিক ইন্‌স্টিটিউট বাংলার ক্রীড়া জগতে এক অনন্য ঘটনা।

১৮৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট সংক্ষেপে K.O.I নামে পরিচিত। আজো ক্রীড়া জগতে ফুটবল, ক্রিকেট ও হকি বিভাগগুলিতে তার অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রেখেছে।

বর্তমান যেখানে অলিম্পিক ইনস্টিটিউটের মাঠ, আগে ওই জায়গাটির নাম ছিল 'পাত্র বাগান'। ওখানে তখন কিছু বালক ফুটবল খেলতো, তাদের ক্লাবের নাম ছিল 'পাত্র বাগান স্পোর্টিং ক্লাব'। মাঠের ভূস্বামী ছিলেন ডাঃ হরিমোহন চৌধুরী। এখন যেখানে 'বেঙ্গল ফাইন মিল' অবস্থিত ওখানেও খোলা জমিতে কিছু খেলোয়াড় খেলা করত। পরে উভয় দল একত্রে এই পাত্র বাগানে খেলার শুরুর সময়ে নাম করণ হয় কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট। এই নোতুন নামকরণের সভা হয় ক্রাইপার রোডের তিন আলোর কাছে 'মহেন্দ্র মন্দির' নামক বাড়িতে প্রয়াত মন্মথ নাথ মিত্রের (ক্ষুদিবাবুর) সভাপতিত্বে। অতএব এই বাড়িটিকে ইন্‌স্টিটিউটের নামের জন্মস্থান বলা যেতে পারে।

জন্মের পরে যেমন শিশুকে ঠিক মত লালন পালন করা প্রয়োজন ঠিক সেইভাবে সেই ব্রত নিয়ে এগিয়ে এলেন প্রয়াত ধনকৃষ্ণ মুখার্জী ও ভ্রাতৃগণ, বীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, জ্যোতিষ চন্দ্র মিত্র, রমেশ চন্দ্র বসু, ভূপেশ চক্রবর্তী প্রভৃতির চেষ্টায় দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল ইনস্টিটিউট। কিন্তু তখনই অনুভূত হল ক্লাবঘরের একান্ত প্রয়োজন। এগিয়ে এলেন তরুণ প্রজন্ম—তাঁদের নেতা হলেন সুশীল কুমার দেব, বিজলীনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ। তাঁরা W.R. CRIPER এর উত্তরাধিকারী ই, হেওয়ার্ড এর সাথে যোগাযোগ করলেন।

তাঁদের প্রচেষ্টা সফল হল। সেই সময়ে সুপরামর্শ দিয়ে সাহায্য করলেন নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, সুধীর চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ নাথ দত্ত। নির্মিত হল ক্লাব ঘর, নামকরণ 'ক্রাইপার মেমোরিয়াল হল'। ১৯৫৩ সালের ১৫ই আগষ্ট ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা হয় এবং উদ্বোধন হয় ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগষ্ট।

১৯২৫ সালের গোড়ার দিকে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও কোন্নগর ওলিম্পিক ইনস্টিটিউটের যৌথ উদ্যোগে এবং যথাক্রমে নৃসিংহ দাস বসু ও হরিসত্য মিত্র (গোঁড়াদা)-র যৌথ প্রচেষ্টায় গঠিত হল কোন্নগর গেমস্ কাউন্সিল। উক্ত কাউন্সিল কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের তিনজন প্রতিনিধি নৃসিংহ দাস বসু, রামগোপাল চট্টোপাধ্যায় প্রধান শিক্ষক ও ননীগোপাল বসু ও ওলিম্পিকের পক্ষ থেকে তিনজন যথা হরিসত্য মিত্র, বিপিন চন্দ্র চন্দ্র ও শরৎ কুমার বসুকে নিয়ে গঠিত হয়। সভাপতি নির্বাচিত হন, W.L. Waston। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত উভয়েই যুগ্মভাবে এই মাঠ ব্যবহার করত। ঐ সময়ে কাউন্সিল মাঠের আকার আরো বড় করার জন্য ক্রাইপার রোডস্থ রমেশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের কাছ থেকে মাসিক ৫ টাকা খাজনায় ৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, ফলে মাঠটির পরিমান দাঁড়ায় মোট ৫ বিঘা ১৪ ছটাক। ১৯২৫-১৯৩৮ সালের মধ্যে পাশ্ববর্তী আরো কিছু জমি খণ্ড খণ্ড ভাবে বিভিন্ন মালিকের কাছ থেকে কেনা হয়। প্রয়োজনীয় অর্থের একটা বড় অংশ সংগৃহীত হয় স্বর্গীয় রায় সাহেব ডি. কে মুখার্জী পরিচালিত ও প্রযোজিত কোন্নগর মহিলা শিল্প প্রদর্শনী' সংগৃহীত অর্থে। যাহা উত্তরকালে আমাদের এই ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে, শুধু তাই নয় অর্থাগমের দিক ছাড়া এই শিল্প প্রদর্শনীর মধ্যে দিয়ে মহিলাদের মধ্যে শিল্পের প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। এছাড়া সংগীত নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কোন্নগরের অনেক প্রতিষ্ঠানের যোগদানে কোন্নগরে বড়দিনের সময় এক উৎসবের আবহাওয়ার সৃষ্টি হত। তখন জমির পরিমাণ কমবেশী এগার বিঘা দাঁড়ায়।

১৯৭৭-৭৮ সালে সমিতির তৎকালীন সভাপতি নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায় এককালীন ২০,০০০ টাকা ও সাত কাঠা জমি দান করেন। তাঁর ইচ্ছানুযায়ী ও সাধারণ সভার অনুমোদন ক্রমে মাঠটির নামকরণ হয় "ডাঃ বঙ্কিম ময়দান"।

বর্তমানে ক্লাব ঘরের সামনের পার্টি ভদ্রকালী নিবাসী নগেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নামে উৎসর্গীকৃত। মাঠের দক্ষিণ-পূর্বে রঞ্জিত ঘোষ-এর স্মরণে রঞ্জিত শিশুউদ্যান অবস্থিত।

১৮৯৪ সালে একমাত্র ফুটবল ক্লাব হিসাবে আত্মপ্রকাশের পর পরবর্তীকালে এই ক্লাব নানা শাখা-প্রশাখা মেলতে শুরু করে। ১৯৪৫-৪৬ সালে বিশ্বনাথ বসু, অজিত বসু, নীলমাধব চট্টোপাধ্যায়, নবীন মাধব চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ঐকান্তিক চেষ্টায় হকি বিভাগের পত্তন হয়। ১৯৪৯ সালে প্রধানত পরেশ নাথ দত্ত-র চেষ্টায় এথেলেটিক বিভাগ ও ১৯৫০ সালে ক্রিকেট বিভাগ খোলা হয়।

ষাটের দশকে কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি ওলিম্পিক ইনস্টিটিউটের মাঠে সারা বাংলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু করে কয়েক বছর ধরে।

১৯৭২-৭৩ সাল থেকে এই সংস্থা আইনানুগ ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রেজিষ্ট্রেশন এ্যাক্ট মোতাবেক রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। ১৯৮৯ সালের আগষ্ট মাসে প্রতিষ্ঠানের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অছি পরিষদ গঠিত হয়।

উত্তর-পশ্চিম দিকে আট ফুট উঁচু পাঁচিল বেষ্টিত এবং মূল প্রবেশদ্বারে সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তোরণ শোভিত এই মাঠ আজ আমাদের গর্ব।

১৯৬৯ ও ১৯৮৪ সালে যথাক্রমে প্লাটিনাম জুবিলী ও শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে।

সম্প্রতি সাংসদ আকবর আলী খন্দকারের অঞ্চল উন্নয়নের বাবদপ্রাপ্ত ৫০,০০০ টাকার মাটি ফেলে মাঠের উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে।

বর্তমানে ক্লাবের সভাপতি শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায়, সহ-সভাপতি শ্রী জয়ন্ত দত্ত, সম্পাদক শ্রী পল্লব ব্যানার্জী, সহ-সম্পাদক শ্রী দিলীপ গাঙ্গুলী, ও কোষাধ্যক্ষ শ্রী কল্যাণ গাঙ্গুলী।

সূত্র ঃ শ্রী অনিল চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন এবং প্লাটিনামও শতবর্ষ উৎসবের স্মরণিকা।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

নবীন সঙ্ঘ

(স্থাপিত ঃ১৯৫৪)

(এস. পি. মুখার্জী স্ট্রীট)

সঙ্ঘের নিজস্ব গৃহ আছে।

৪৭ বছর ধরে নিজস্ব কার্যসূচি নিয়ে সঙ্ঘ সক্রিয় আছে

বিভাগ ঃখেলাধূলা (ইনডোর সহ) এবং সংস্কৃতি চর্চা, শ্রীরামপুর সাব ডিভিশন ফুটবল এসোসিয়েশনের 'এ' ডিভিশনে অন্যতম ফুটবল ক্লাব।

সঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীসুপ্রভাত সেনগুপ্ত ও শ্রীবেণী মাধব সেগুপ্ত

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সূত্র ঃ সম্পাদকের সাথে আলোচনা।

কোন্নগরে ব্যাডমিন্টন খেলার চর্চা ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

কোন্নগরে ব্যাডমিন্টন খেলার একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। ত্রিশের দশকে এখানকার নামী খেলায়াড় ছিলেন প্রভাত কুসুম বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এঁদের বাড়ি রাজরাজেশ্বরী তলার কাছাকাছি এবং এঁরা নানা স্থানে খেলতেন।

পরবর্তী কালে ১৯৩৩/৩৪ সালে শ্রীঅরবিন্দ রোডে শিব প্রসাদ ঘোযের বাড়ির উঠোনে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা হোত, এর উদ্যোক্তা ছিলেন অমূল্য কুমার দেব প্রভৃতি। এই প্রতিযোগিতায় স্থানীয় ও কলকাতার অনেক খেলোযাড অংশ নিতেন।

আবার ১৯৪৭ সাল নাগাদ সৌরেন্দ্র বসু, বিমান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন তরুণ অন্যত্র বয়স্কদের ব্যাডমিন্টন খেলা দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এবং ঐ খেলার কথা ভাবতে শুরু করেন। তাঁরা ক্রাইপার রোডে খেলা দেখে অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং ঐ খেলার কথা ভাবতে শুরু করে। তাঁরা ক্রাইপার রোড ও এস. সি. দেব স্ট্রীটের সংযোগস্থলে প্রয়াত শৈলেন্দ্র নাথ বসুর বাড়ির দক্ষিণে মাঠের খেলার অনুমতি পেলেন এবং বিজলী আলোর ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে ঘোয পাড়ার মিথিলা নাথ ঘোয এঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন, এলেন বারীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমর নাথ দাস প্রভৃতি। চাঁদা ধার্য হোল কমপক্ষে এক টাকা এবং সাথে সাথে সংগঠন তৈরি হোল। সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হলেন যথাক্রমে প্রমোদ চক্রবর্তী, বারীন্দ্র মুখার্জী, অমল বসু প্রভৃতি। প্রমোদ চক্রবর্তী এককালীন অর্থ দান করলেন সংগঠন তহবিলে। এরপর উত্তরপাড়ার অমর নাথ মুখার্জী, বালীর ভবানী মুখার্জী, বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় পি. শেঠ এঁরা এসে যোগ দিলেন, ক্লাবের নাম হোল 'নো ম্যানস্ ক্লাব', এবং সঙ্গে সঙ্গে টুর্ণামেণ্টের খেলা শুরু হোল। প্রমোদ চক্রবর্তী তাঁর মাতার নামে চ্যালেঞ্জ কাপ প্রদান করলেন। আনন্দ বাজর পত্রিকার ব্রজবাবু টুর্ণামেণ্টের সভাপতি হলেন।

মনোজ গুহ, সুনীল বসু, হে মাণ্ডি প্রমুখ ভারতের বিখ্যাত খেলোয়াড়রা প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। ধার্য সামান্য দর্শনী দিয়ে প্রচুর দর্শক খেলা দেখতে আসতেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, তরুণ খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেবার জন্য অল বেঙ্গল জুনিয়ার ব্যাডমিণ্টন কম্‌পিটিশন-এ যোগ দেবার জন্য উৎসাহ দেয়া হল। তরুণ খেলোয়াড় অনুজ বসু (ফটিক) ৪৯ সালে রানার্স মেডেল ও ৫০/৫১ সালে চ্যালেঞ্জ শিল্ড জয় করে।

আরো সমর্থকদের উদ্যোগে এ্যালকেলি কারখানার বিদেশী খেলোয়াড় এবং ডি. ওয়ালডিস-র পাওয়েল প্রভৃতি উৎসাহ দিতে এখানে প্রাকটিস করতেন ও অর্থ সাহায্য করতেন।

ক্লাবের সর্বশেষ কমিটির সভাপতি—নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী, সম্পাদক—অভয় চক্রবর্তী ও কোষাধ্যক্ষ অবনী চক্রবর্তী। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ক্লাব চালু ছিল।

সূত্র ঃ শ্রীবিমান মুখার্জী, শ্রীঅবনী চক্রবর্তী ও শ্রীঅনুজ বসুর সঙ্গে আলোচনা।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর সুইমিং ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৬৮

হাতিরকুলের শ্রীরবি ব্যানার্জীর একটি পুষ্করিণী যা এস. সি. চ্যাটার্জী স্ট্রিটে অবস্থিত সেই পুষ্করিণীতে কোন্নগর সুইমিং ক্লাব ১৯৬৮ সাল থেকে সাঁতার কেটে আসছিল। নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায়-এর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে ঐ ক্লাবের সভ্যদের অনুরোধ ক্রমে এই পুষ্করিণী কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক কেনার জন্য এর ধার্যমূল্য ৪০০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন বিপিন মুখোপাধ্যায় এই সর্তে যে, পুষ্করিণীটি কোন্নগর পুরসভার সম্পত্তি হবে এবং পুষ্করিণীর নামকরণ হবে 'চূনী-প্রভা দেবী সরোবর'।

পুষ্করিণী যথারীতি হস্তান্তরের জন্য পুরসভার কাছে আবেদন করা হয়, কিন্তু হস্তান্তরের আবেদন প্রাপ্তির পূর্বেই ১৮.৭.১৯৮৮ তারিখে ৮৩ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন।

ইতিমধ্যে অনুমতি প্রাপ্তিরপর কোন্নগর পুরসভার তৎকালীন পুর প্রধান শ্রী সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০০০০ টাকায় ঐ পুষ্করিণী ক্রয় করেন মালিক শ্রী রবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। এরপর প্রয়াত বিপিন মুখোপাধ্যায়ের দুই ভগিনী ব্রজবালা দেবী ও রাণু বালা দেবী দু'জনে ৩২০০০ টাকা ও ভাই কানন বিহারী মুখোপাধ্যায় ৮০০০ টাকা মোট ৪০০০০ টাকা বিপিন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পুর তহবিলে প্রদত্ত হয়।

পুষ্করিণীতে মাছ চাষের জন্য ক্লাব নামমাত্র বার্ষিক খাজনা দিয়ে থাকে।

বর্তমানে আশপাশের অনেক বালক বালিকা এই সুইমিং ক্লাবে সাঁতার শিখতে আসে। সুইমিং ক্লাবে প্রতি বছর সাঁতার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। সম্প্রতি এই ক্লাবের জমিতে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক মণীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্রী স্বরাজ মুখোপাধ্যায়। তিনি ক্লাব তহবিলে একলক্ষ টাকা দান করেন। সুইমিং ক্লাবের নিজস্ব ক্লাবঘর আছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটিউট

১৯২৭-১৯৩২/৩৩

ওরিয়েন্টাল ইন্‌স্টিটিউটের কার্যালয় ক্ষেত্র মোহন ব্যানার্জীর বাড়ির পিছনে (জি. টি. রোড)।

কার্যধারা ঃ ব্যায়াম ও খেলাধূলা। ট্রাপিজ, লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, কুস্তি, বল্লম, তীর ধনুক, ওয়েট লিফটিং, বার প্রভৃতি।

সভ্য ও অংশগ্রহণকারীরা ঃ চণ্ডী ভট্টাচার্য, সমর গাঙ্গুলী, গোপাল ব্যানার্জী, প্রফুল্ল বসু, বিমল বসু, কমল বসু, নীরেন মিত্র, মুক্তারাম ধাড়া, বিষ্ণু মুখার্জী, সত্য সাধন পাল, ললিত হোড়, বিভূতি ব্যানার্জী। এঁরা ভদ্রকালী-রিষড়া অঞ্চলের যুবকগণ এবং সকলেই কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র।

ক্ষেত্র মোহন ব্যানার্জী একজন বড সংগঠক ছিলেন। পুলিন দাসের সাথে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তিনি প্রফেসার মর্তাজার (তুর্কী) কাছে তরবারি চালনা শিক্ষা করেন এবং সংস্থার সভ্যদের তরবারি চালনা শিক্ষা দিতেন।

প্রতিষ্ঠান উঠে গেলে এখানকার সভ্যেরা বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলেন, যেমন কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান, শক্তি কুটিব প্রভৃতি।

তখনকার দিনে এই রকম প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের উপর পুলিশের নজর থাকত এই সংস্থার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল।

যে সব যুবক এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা শরীর চর্চার দ্বারা দৈহিক শক্তি অর্জন করার সাথে সাথে দেশপ্রেম ও জন কল্যাণের আদর্শকে বরণ করে নিয়েছিলেন। সেই দিক থেকে ওরিয়েন্টাল ইনস্টিটিউটের এক অনন্য ভূমিকা ছিল।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর ব্যায়াম সমিতি (ভাঙাবাড়ি) ও স্বাস্থ্য কুটির

চড়কতলার উত্তরে একটি বড় বাড়ি ছিল। বাড়িটির উত্তরে ছিল পূজার দালান এবং দক্ষিণ দিকে অনেক জমি। বাড়িটি পরিত্যক্ত হেতু কেউ বাস করত না। বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে এইপূজার দালানে স্থানীয় যুবকগণ কুস্তির আখড়া তৈরি করেন ও ট্রাপিজের সরঞ্জাম স্থাপন করেন। কুস্তির অভ্যাস শুরু করার সাথে সাথে ট্রাপিজের নানা রকম ক্রীড়া কৌশলের চর্চা করতে থাকেন। আর দক্ষিণের জমিতে সমান্তরালবার ও বক্সিং-এর অনুশীলন চলে। অংশগ্রহণকারীরা হলেন—সুহাস মিত্র, সুধাংশু চন্দ্র, সোনালাল বসু, জয়কৃষ্ণ ঘোষ, কালিদাস দেব, সৌরেন বসু, শম্ভু মল্লিক, বিজয় ঘোষ, চন্দ্রনাথ মিত্র, বিষ্ণু দত্ত, ভোলা রায় প্রভৃতি। সভ্যদের যাওয়া এবং আসার মধ্য দিয়ে ১৯৩৫-৩৬ পর্যন্ত এই সমিতি চলে।

এরপর কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে কলকাতার বিখ্যাত ব্যায়াম প্রদর্শকরা যথা রমেশ ও পঞ্চু, এঁদের নেতৃত্বে টিকিট করে ব্যায়াম প্রদর্শন হয়। শোনা য়ায় এই প্রদর্শনী থেকে সংগৃহীত অর্থ কি ভাবে খরচ হবে এই নিয়ে সভ্যদের মধ্যে মত পার্থক্য হয় এবং বেশির ভাগ সভ্য সমিতি ত্যাগ করে কালীদালানের মাঠের দক্ষিণে নিবারণ মিত্রের জমিতে স্বাস্থ্য কুটির নামে নোতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। স্বাস্থ্য কুটিরের সংগঠকরা হলেন, কেশব চ্যাটার্জী, ভোলানাথ রায়, পশুপতি চ্যাটার্জী, অসিত মিত্র, সমর মিত্র, ব্যোমকেশ দাস, চন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ। গ্রাউণ্ড প্লে, ছোরা ও লাঠি খেলা, ট্রাপিজের খেলা প্রভৃতি ছিল এদের চর্চার বিষয়। এই ভাবে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে আশির দশক পর্যন্ত এই সংস্থা চালু থাকে, তারপর অবলুপ্তি ঘটে।

ইতিমধ্যে ব্যায়াম সমিতি কুস্তি প্রভৃতি নিয়ে দুর্বল সংগঠন রূপে চলতে থাকে। কানাই পুরের হারাধন ঘোষ এবং ডি. এস. লেন ও তিন বাতির এলাকার কিছু যুবক এখানে ব্যায়াম চর্চা করতে থাকেন। ৭০র দশকে ব্যায়াম চর্চা বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্যায়ামের স্থানটি প্রাচীর বেষ্টিত হয়।

সূত্র ঃ চন্দ্রনাথ মিত্রের সাথে আলোচনা লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বারোমন্দির স্পোর্টিং ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৬৫

১৯৬৫ সালে সর্বশ্রী শীতল বেরা, সমীর বেরা, পাঁচু গোপাল মণ্ডল, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈল মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যুবকগণ খেলাধুলার এই ক্লাবটি প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে ক্লাবে ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল খেলা প্রভৃতি বিভাগ আছে। ১৫ আগষ্ট আন্তঃ ক্লাব ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, দৌড় প্রতিযোগিতা এবং বছরে একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

এঁদের অনেক সমাজ সেবামূলক কার্যকলাপ আছে, যথা---বিনা মূল্যে অষুধ প্রদান, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা ও পীড়িত দরিদ্র মহিলাদের নানা ভাবে অর্থ সাহায্য করে থাকেন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িতদের জন্য সাহায্য সংগ্রহে ব্রতী হয়।এছাড়া প্রতি বছর হেপাটাইটিস বি টীকা প্রদান কর্মসূচী পালন করেন। এদের ব্যাণ্ড পার্টি আছে।

যে ক্লাবঘরটি এঁরা নির্মাণ করেছেন তার মাল মশলা ক্লাব হিতৈষী ও পৃষ্ঠপোষকেরা দান করেছেন।

সরকারী ব্লাডব্যাঙ্কের সহযোগিতায় বর্তমান বছর থেকে এঁরা রক্তদান শিবিরের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

বর্তমানে এই ক্লাবের সভাপতি শ্রী কমলেন্দু বাগচী ও সম্পাদক শ্রী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তথ্য সূত্র ঃ সভ্য অসিত ভাণ্ডারী ও রঘুনাথ কর

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

শক্তি কুটির

দক্ষিণ পাড়া

স্থাপিত ঃ ১৯২২

১৯২২ সাল নাগাদ শ্যা্মা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পঙ্কজ বসু প্রমুখেরা শক্তি কুটির প্রতিষ্ঠা করেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে বয়েস লাইব্রেরী নামে এক গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে অনেক বই সহ একটি কাঠের আলমারী শক্তিসঙ্ঘ পাঠাগারে স্থানান্তরিত হয়।

এঁদের ব্যায়াম বিভাগ ছিল প্রয়াত উমেশ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে, পরে জি. টি. রোডস্থ কচি মিত্র ও ক্ষেত্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়।

এঁরা তরোয়াল খেলা করতেন। এঁদের কয়েকজন সভ্য ওরিয়েণ্টাল ইন্‌স্টিটিউট থেকে ব্যায়াম শিক্ষা ও তরোয়াল খেলা শেখেন।

'বাণী' হাতে লেখা পত্রিকা প্রকাশ করতেন শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সতীর্থ ও সমবয়সী যুবকগণ।

১৯৩৪ সাল পর্যন্ত শক্তি কুটির সক্রিয় ছিল।

সূত্র ঃ প্রয়াত অতুল কৃষ্ণ ও চণ্ডী ভট্টাচার্য

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর অরবিন্দ ব্যায়াম সমিতি

স্থাপিত ঃ ১৯৫৮

পুরাতন বাঁধা ঘাট লেন (সিংহীর ঘাট) ভগ্নদশা প্রাপ্ত ও অব্যবহৃত গঙ্গাবাসীর ঘরে ক্রীড়া প্রেমী কয়েকজন যথা, বলরাম পালিত, বিমল মিত্র (মানিক মিত্র), নিতাই আদগিরি, শঙ্কর সামন্ত ও মানিক আদ্‌গিরি প্রভৃতির উদ্যোগে এই ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয় ১৯৫৮ সালে। প্রতিষ্ঠার সময় এই গঙ্গাবাসী ঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সত্যহরি রায় মিত্র (গোঁড়াদা)-র সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। এই ঘরের পূর্ণ সংস্কার করা ও উপরের ছাদকে কংক্রিটের ঢালাই দ্বারা ব্যবহার যোগ্য করা হয়। এই নির্মাণ কার্যে সভ্যেরা ও ক্রীড়াপ্রেমী অধিবাসীরা প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেন। আরো কিছু সংস্কার কাজ করার পরিকল্পনা সমিতির কার্য নির্বাহক সমিতি গ্রহণ করেছে।

বিভাগ সমূহ (১) ব্যায়াম (২) ইনডোর খেলাধূলা (৩) রক্তদান শিবিরের ব্যবস্থা করা (৪) কিশোর ও বালকদের জন্য অংকন, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা। প্রায় একশত জন প্রতিযোগী নিকটস্থ মাধবানন্দ আশ্রমের হলে এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

যুবকদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চার জন্য সমিতি নাট্য বিভাগ চালু করার কথা চিন্তা করছে।

অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতিবৎসর প্রখ্যাত নাট্যদল দ্বারা সমিতি নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

অরবিন্দ ব্যায়াম সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে বিপুল সরকার ও অভিজিৎ নন্দী।

তথ্য সূত্র ঃ অভিজিৎ নন্দী　　　　লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর শ্রীসঙ্ঘ

এন. ডি. বসু লেন

স্থাপিত ঃ ১৯৪০

সঙ্ঘটি প্রতিষ্ঠার সময় প্রয়াত মিহির লাল ঘোষ সহায়তা করেন।

সঙ্ঘের নিজস্ব গৃহ আছে।

সঙ্ঘের বিভাগগুলি ঃ যোগাসন (প্রতিযোগিতার সংগঠন সহ), ব্যায়াম, টেনিস, ক্যারাম, ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা সংগঠিত করা হয়।

সভ্য সংখ্যা—১৪০

একদিনের ফুটবল প্রতিযোগিতাও সংগঠিত করা হয়

সঙ্ঘের বর্তমান কর্মপরিষদ ঃ

সভাপতি	ঃ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য
সম্পাদক	ঃ শ্রীকিশোর ঘোষ
সহ সম্পাদক	ঃ শ্রী প্রবীর জানা, শ্রীজ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, শ্রীসমীর ভট্টাচার্য
কোষাধ্যক্ষ	ঃ শ্রীসমীর পাত্র শ্রীঅরুণ পরিডা

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

স্কাউটিং চর্চায় কোন্নগর

স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক, আন্তর্জাতিক সেচ্ছাসেবী সংস্থা। প্রাত্যহিক জীবনে চলতে গেলে এমন কোন বিষয় নেই যা স্কাউটিং-এ আলোচনা বা শেখানো হয় না। একটি বালককে তার নিজের পছন্দমতো বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান স্কাউটিং-এর মাধ্যমে সহজেই দেওয়া সম্ভব। হাতে কলমে সুষ্ঠু পরিবেশে খেলার ছলে বিষয়টির পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনার পর আধুনিক যুগেব সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্কাউটিং-এর পাঠ্য সূচি তৈরি করা হয়।

কোন্নগর বাসীর সমাজজীবনে পঞ্চাশ বছর ধরে ওতোপ্রতভাবে মিশে আছে কোন্নগর স্কাউটিং। এখানকার স্কাউট দলে সদস্যের সংখ্যা প্রাক্তন ও বর্তমান নিয়ে কম নয়। তবে স্কাউট অনুরাগীর সংখ্যা অনেক বেশি। জীবনে কেউ যদি স্কাউটিং-এর নিয়ম মেনে চলে, সে কোনদিনই স্কাউট থেকে দূরে সরে যেতে পারবে না।

কোন্নগরে স্কাউটিং-এর প্রচলন হয় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ১৯৫২ সালে। তখন স্কাউট মাস্টার ছিলেন শিক্ষক প্রয়াত অজিত কুমার সেন। তাঁর পরে পরপর স্কাউট মাস্টার হন যথাক্রমে শ্রীবারীন্দ্র কুমার সেন, প্রয়াত শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রয়াত সরোজ কুমার মিত্র এবং শ্রীঅজিত কুমার দাস। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনেক কৃতী ছাত্র স্কাউট দলের সদস্য ছিলেন। এই স্কাউট দলের নাম "কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট ট্রুপ"। সেই সময়ে জেলা স্কাউট সংস্থার দপ্তর কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছিল। জেলার সকল স্কাউট প্রশিক্ষকগণ প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে এখানে মিলিত হতেন।

স্কাউট দলের সদস্যর বয়স দশ থেকে সতেরো বছরের মধ্যে হতে হয়। সতেরো বছরের বেশি হলে রোভার স্কাউট দলে ভর্তি হতে হয়। কোন্নগরে অনেক দিন রোভার স্কাউট দলের অভাব ছিল, ১৯৭০ সালে "শিবচন্দ্র রোভার ক্রু" গঠনের মাধ্যমে এই অভাব পূরণ হয়। এই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

ও দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন পূর্বোক্ত শিক্ষকদের অন্যতম প্রয়াত শিবরাম বন্দ্যোপাধ্যায়। "শিবচন্দ্র রোভার স্ক্রু"-র প্রথম অভিযান ১৯৭১ সালে কোন্নগব-দিল্লী-কোন্নগর হীচ হাইক। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন শ্রী চপল কুমার রক্ষিত। অংশ গ্রহণ করেছিলেন পাঁচজন। যাতায়াতে সময় লেগেছিল ২৭ দিন, এবং জন প্রতি খরচা পড়েছিল মাত্র তিরিশ টাকা।

এই রোভার ক্রু পৌরসভার পরিচ্ছন্ন অভিযান, বন্যার্তদের ত্রান বিতরণ, মাতৃসদনের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্ন বিতরণ, উৎসবের সময়ে দর্শনার্থীদের সহায়তা ও প্রাথমিক চিকিৎসা দান প্রভৃতি সেবামূলক কর্মসূচি পালন করে থাকে। এই সব কর্মসূচির ফলে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের রোভার ক্রু বিদ্যালয়ের বাইরে এসে পড়ে ,এরং এর নাম হয় "শিবচন্দ্র স্কাউট গ্রুপ (ওপেন)"।

স্কাউট দলের সদস্যদের চারিত্রিক, মানসিক, দৈহিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য বিশেষ ধরণের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই দল আন্তর্জাতিক অভিযান ইত্যাদি নানা ধরণের কর্মসূচির ব্যবস্থা করে।

স্কাউটিং-এর সঙ্গে যুক্ত যাঁরা তাঁরা প্রতি বছর অক্টোবর মাসের তৃতীয় শনি ও রবিবার পৃথিবীর সব দেশের স্কাউটদের সঙ্গে নিজের বাড়িতে বসে ৪৮ ঘণ্টা ধরে JOTA (JAMBOREE ON THE AIR) ও JOTI (JOMBOREE ON THE INTERNET) মারফত যোগাযোগ করতে পারে।

লেখক ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

সূত্র ঃ শ্রীচঞ্চল কুমার রক্ষিতের প্রতিবেদন থেকে
সংক্ষেপিত

বামাক্ষ্যাপা

স্থাপিত ঃ ১৯৬৭

এ, এল, ব্যানার্জী স্ট্রীট

বিভাগ ঃ খেলাধূলা, ভলিবল, ইনডোর খেলায় ক্যারাম আছে। বছরে একবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এক সময়ে এই সংস্থার কার্যকলাপ খুবই ব্যাপক ছিল।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বালকবৃন্দ সমিতি

স্থাপিত ঃ ১৯৭৩

এ, এল, ব্যানার্জী স্ট্রীট, দক্ষিণ পাড়া

বিভাগ সমূহ ঃ খেলা ধূলা, সংস্কৃতি ও নাট্যচর্চা, সমাজ কল্যাণ ও নৈশ প্রতিরক্ষা।

সমিতি আয়োজিত ক্যারাম প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোত।

এককালে সমিতির গণসংস্কৃতি বিভাগ খুবই সক্রিয় ছিল।

বর্তমান সভাপতি ঃ মধুসূদন দাস

এবং সম্পাদক ঃ অশোক পোল্লে।

সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির

ইংরাজী ১৯৫৮ স্থানীয় কিছু যুবকের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে বর্ধমান নিবাসী শ্রীচন্দ্রচূড় মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈত্রিক জমিতে সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। পূর্বে এই জমিতে আম ও নারিকেল গাছে ভর্তি ছিল। এখানেই প্রথমে স্থানীয় যুবকেরা একটি বল খেলার ক্লাব গড়ে তোলে, সেই ক্লাবই পরবর্তীকালে বর্তমানের সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দিরে রূপান্তরিত হয়।

সমাজ সেবা ও শরীর চর্চার দ্বারা স্বাস্থ্য গঠন উদ্দেশ্যে ব্যায়াম মন্দিরের সদস্যেরা আত্ম নিয়োগ করেন, সাথে সাথে চলতে থাকে আর্থিক সাহায্য ও চাঁদা গ্রহণ এবং জমির মালিকের সঙ্গেও আলোচনা। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রচূড় মুখোপাধ্যায়ের সদ্ ইচ্ছায় কিছু জমি তিনি দান করেন এবং পরবর্তী কালে 'মন্দিরের' কার্যকলাপে সন্তুষ্ট হয়ে এবং ক্লাব সদস্যদের একান্ত অনুরোধে শ্রী মুখোপাধ্যায় স্বল্পমূল্যে একটি ডোবা সহ কিছু জমি ব্যায়াম মন্দিরকে বিক্রয় করেন। উপপুর প্রধানের সহায়তায় ওই ডোবা ভরাট হয়। বর্তমানে ক্লাব ভবন সহ মোট জমির পরিমাণ প্রায় এক বিঘা।

সমাজ ও নাগরিকদের সেবার স্বীকৃতি স্বরূপ পুর সভার তৎকালীন পুর প্রধান শ্রীবিষ্ণু দত্ত 'মন্দির'কে প্রশংসা পত্র প্রদান করেন। কোন্নগর 'শ্রী' সহ জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দিরের সভ্যেরা অংশ গ্রহণ করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করে।

সময় ও যুগের প্রয়োজনে আধুনিক ব্যায়াম ও অনুশীলনের রূপান্তর ঘটে। এরাও সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভেঙে যুগের দাবি মেনে মাল্টি জিম তৈরিতে সক্ষম হয়। কোন্নগরের অন্যতম সুসন্তান দানবীর ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গঠিত KUDRO-র আর্থিক সাহায্যে ও ক্লাব সদস্যগণের যথা শিবাশীষ দাস, সৌমিত্র গাঙ্গুলী, দিলীপ বাগ ও তরুণ পাত্রের আধুনিক কারিগরি শিক্ষা সহযোগের স্বল্প খরচে 'মাল্টিজিমের বেশিরভাগ যন্ত্রাদি নিপুণভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। KUDRO-১২০০০ টাকা প্রদান করে। এই মাল্টি জিম

বিভাগ সুচারু রূপে চলছে। প্রশংসাযোগ্য এই স্বেচ্ছাশ্রম এই ব্যায়াম মন্দিরের চলার পথে প্রেরণা জোগাবে।

সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দিরে যোগাসন বিভাগ চালু করা হয়েছে, এছাড়া ব্যাণ্ড বাদ্য বিভাগও আছে। তাছাড়া বালকগণ ফ্রি হ্যাণ্ড ব্যায়ামও করে থাকে। আনন্দের ও গর্বের কথা যে, ব্যায়াম মন্দিরে এই ব্যাণ্ডবাদন বিভাগ ও যোগ ব্যায়াম বিভাগের সুশৃঙ্খল কাজের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ও বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের প্রশংসা লাভ করেছে।

পরিশেষে যে স্বপ্ন নিয়ে অর্থাৎ সমাজকে স্বাস্থ্যবান ও চরিত্রবান যুবক উপহার দেয়া, সেই ব্রত ও স্বপ্ন নিয়ে সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির এগিয়ে চলেছে। এ চলার শেষ নেই।

তথ্য সূত্র ঃ সাধারণ সম্পাদক শ্রীপরেশ দাস

ও সভাপতি শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন। লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯০৪

বিংশ হতাব্দীর প্রারম্ভে কোন্নগরের কতিপয় যুবক যারা বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ তারা একত্রিত হয়ে একটি ক্লাব গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ঐ সময়ে রায় মিত্র পরিবারের একটি বাগান যাকে 'রা'য়' বলা হত—যেখানে প্রথম ফুটবল খেলা শুরু হয় ১৯০৪ সালে। ক্লাবটির নামকরণ করা হয়" ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, কোন্নগর। যাঁরা এই ক্লাব স্থাপনায় বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্যাপ্টেন এন, এন, ঘোষ, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, মণীন্দ্র নাথ মিত্র, নিত্য চৈতন্য মিত্র, ফণীন্দ্র নাথ মিত্র, প্রফুল্ল কুমার দেব, নির্মল চন্দ্র ঘোষাল, ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নাথ রায় (শিক্ষক), ননীগোপাল বসু, ললিত মোহন ঘোষাল (গিলুদা) এবং আরো অনেকে।

১৯৩৪ সালে প্রয়াত অনাথ বন্ধু ঘোষ মহাশয়ের চেষ্টায় মাঠের কিছু সম্প্রসারণ করা হয়। তৎকালীন খ্যাতনামা খেলোয়াড় শিবদাস মুখোপাধ্যায়ের (ভাঁগুড়) স্মৃতিতে একটি টুর্ণামেন্টের সূচনা হয়। উইনার্স কাপটি প্রদান করেন বটকৃষ্ণ ব্যানার্জী এবং রানার্স কাপটি প্রদান করেন শ্রীশিশির কুমার ঘোষ, অধ্যাাপক নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ স্মরণে।

১৯৩৮ সালে ডব্লু আর ক্রাইপার সাহেবের আর্থিক সাহায্যে হকি খেলা শুরু হয়।

১৯৪১ সালে স্বর্গত নলিনী নাথ মিত্র (নানী বাবু) মহাশয়ের চেষ্টায় ক্রিকেট বিভাগ খোলা হয়। এবং ঐ বৎসরই সভাপতি হিসেবে শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র মেমোরিয়াল চ্যালেঞ্জ শীল্ড এবং পূর্ববৎ নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ চ্যালেঞ্জ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সূচনা হয়।

১৯৫৪ সালে একটি ক্লাব টেন্ট নির্মাণের জন্য ফাণ্ড গঠন করা হয়। মাঠের উত্তর-পশ্চিম কোণে নিজেদের নামে এক খণ্ড জমি ক্রয় করে পরবর্তী

কালে টেন্ট নির্মাণার্থে ক্লাবকে দান করেন বলরাম পালিতও মিথিলা নাথ ঘোষ। ১৯৫৯ সালে ঐ জমিতে টেন্ট নির্মাণ হয়।

এর পূর্বে ১৯৪৮ সালে শ্রীরামপুর মহকুমা স্পোর্টস এসোসিয়েশন গঠিত হয়। এই বৎসরেই এসোসিয়েশন পরিচালিত ফুটবল লিগে ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব চ্যাম্পিয়ান হয়।

ইতিমধ্যে মাঠের যে অঞ্চলে ক্লাব খেলাধূলা করত তার মালিকানা ছিল নলিনী নাথ মিত্র ও যতীন্দ্র নাথ মিত্র, তার জন্য ক্লাব কতৃপক্ষ তাঁদের কাছে বিশেষ আবেদন রাখে। উক্ত মালিকগণ সানন্দে ক্লাবের নামে জমির মালিকানা হস্তান্তর করেন বিনা অর্থে এবং ক্লাবকে চির কৃতজ্ঞতা সূত্রে আবদ্ধ করেন। ঐ প্রচেষ্টায় প্রয়াত লোকেন্দ্র নাথ মিত্রের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যায়।

এককালে এ ক্লাবের অনেক খেলোয়াড় কলকাতার নামী ক্লাবে বা অন্যত্র খেলে কোন্নগরের সুনাম বজায় রাখেন।

অতি সম্পতি ১৯৯৮ সালে ক্লাবের বর্তমান সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় ক্লাবের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তাঁর পিতা প্রয়াত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্রের স্মৃতিতে একটি সুসজ্জিত শিশু উদ্যান স্থাপিত হয়েছে এবং টেন্টের পাশে একটি কক্ষ নির্মিত হয়েছে। এছাড়া ১৯৯৮ সাল থেকে জুনিয়ার ক্রিকেট খেলোয়াড়দের জন্য শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ জ্যালেঞ্জ কাপ প্রতিযোগিতারও সূচনা হয়েছে।

ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের বর্তমান সভাপতি শ্রীসমরেন্দ্র নাথ মিত্র ও সাধারণ সম্পাদক শ্রীশ্যামাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সূত্র ঃ শ্রীবলরাম পালিত ও
শ্রীশ্যামা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর
সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে লিখিত

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৬৮

চিত্তরঞ্জন স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৬৮ সালে হাতীর কুলে (এস, সি, মুখার্জী স্ট্রীট ও এ, কে ব্যানার্জী লেনের সংযোগ স্থলে) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠানের কার্যের পরিধি খেলাধূলার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিগত কয়েক বছর প্রতিষ্ঠানের কার্যধারা বহুলাংশে বেড়েছে। প্রতিবছর প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় রক্তদান শিবির, ওপোন-টু অল এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে ফুটবল প্রতিযোগিতা, ক্রিকেট প্রতিযোগিতা, বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী নিবন্ধীকৃত। এ অঞ্চলের বালক ও তরুণদের মধ্যে এই কর্মসূচিকে অবলম্বন করে উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। সভ্য সংখ্যা ক্রমবর্ধমান।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর নবারুণ সমিতি

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৯৫৪

এই সমিতির কার্যধারার মধ্যে পড়ে সংস্কৃতি ও ক্রীড়াচর্চা। এটি কোন্নগরের অন্যাতম বিশিষ্ট সংস্থা।

১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী কোন্নগরের হরিসভা (এস, সি, চ্যাটার্জী স্ট্রিট) অঞ্চলের অল্প কয়েকজন যুবকের উদ্যোগে কোন্নগর নবারুণ সমিতির জন্ম হয়। পাড়ার একটা মাঠে ক্রীড়া চর্চা মূলতঃ ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার মাধ্যমে সমিতির যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তী কালে সভ্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও কোন্নগরবাসীর উদার আর্থিক আনুকূল্যে সমিতি খেলার মাঠটি ক্রয় করতে সমর্থ হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই সমিতির সভ্য সংখ্যা আশাতীত ভাবে বৃদ্ধি লাভ করে। খেলা-ধূলা ছাড়াও সমিতি বহুমুখী জনহিতকর এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজ করে যথা ; গরীব ছাত্রদের পড়শোনার সুযোগ করে দেওয়া, দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতাকে সাধ্যমত আথিক সাহায্যদান—ইত্যাদি দায়ভার আনন্দের সঙ্গে বহন করে থাকে। এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ও সমর্থকদের সহায়তায় রক্ত চক্ষু ও দান শিবির সংগঠন ও সমাজ কল্যাণমূলক কার্যধারার অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যসংস্থাকে নিয়ে একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সমিতির এক কার্যকলাপ। বহু গুণীজন আজ এই সমিতির আজীবন সভ্য।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি

১৯৩৬ সালের মে মাস। বিদ্যালয়ে তখন গরমের ছুটি। ছাত্র শিক্ষক অভিভাবক সকলেই তখন অবকাশ যাপন করছেন, কিন্তু কিছু ক্রিয়াশীল মানুষের মনে তখন সৃষ্টির বাসনা জাগে। তৈরী হয় কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি। প্রাথমিক ভাবে ১১জন সদস্য নিয়ে কমিটি গঠিত হয়। সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। এঁদের নাম গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অজয় কুমার মুখোপাধ্যায়, লক্ষীনারায়ণ দাস, বৈদ্যনাথ তরফদার, রাধিকা নাথ তরফদার, শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র, অনন্তকুমার মিত্র, সন্তোষ কুমার দত্ত, সমরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য, নরেন্দ্র নাথ দেব।

খেলা ধুলা দিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যধারার সূচনা হয়। প্রথমে ইনডোর এবং পরে আউটডোর। প্রতিযোগিতার আসরও গড়ে ওঠে এবং ১৯৩৭ সালে বার্ষিক স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে হুগলী জেলার কিছু অঞ্চলের প্রতিযোগী, পরের বছরগুলোতে কলকাতা, ২৪পরগণা, হাওড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রতিযোগীরা যোগদান করলে আইডিয়াল সোসাইটির বার্ষিক স্পোর্টর্সের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। সোসাইটি তখন বেঙ্গল অলিম্পিক এসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিন বছরে বেড়ে ওঠার সময়ে সংস্থার দায়িত্বে ছিলেন নরেন্দ্র নাথ দেব।

উদ্যোক্তাদের বয়সের প্রভাবে ক্রমশ সংস্কৃতি চর্চার দিকে টান জন্মায় এবং বার্ষিক অনুষ্ঠানে নাটক করার আগ্রহ পরস্পরকে আরো কাছে টেনে নেয়। বাঙ্গালির নববর্ষের দিন ছুটি ঘোষিত হওয়ায় ব্যাপক আনন্দে নববর্ষ উৎসব পালিত হয়।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময় আইডিয়াল সোসাইটি সাধ্যমত ত্রাণের ব্যবস্থা করেছে।

এই কর্ম প্রচেষ্টার ধারাতে ১৯৪৫ সাল নাগাদ 'মিউচুয়াল বেনিফিট ফাণ্ড' সমবায় পদ্ধতিতে তৈরী হয়। মধ্যবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের পাশে তখন আইডিয়াল সোসাইটির সহযোগিতা বড় ভূমিকা পালন করে। ক্রমে আইডিয়াল সোসাইটির নিজস্ব দ্বিতল গৃহ নির্মিত হয় জি. টি. রোডের ধারে। নীচে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিক্রয়ের স্থান, সদস্যরা অবৈতনিক ভাবে এখানে অক্লান্ত ভাবে কাজ করেন। এটা কোন্নগরের একটি গর্বের স্থান।

এই উৎসাহে 'কোন্নগর প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকা লেখক পাঠকদের মধ্যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও যথেষ্ট অর্থের আনুকূল্য না থাকাতে ছয় বছরের বেশি এই পত্রিকা চালানো যায়নি।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব পালিত হয় ২৫ ডিসেম্বর ১৯৮৫ থেকে ৬ জানুয়ারী ১৯৮৬ পর্যন্ত। সদস্য গ্রাহক ও বন্ধুদের মধ্যে প্রচুর উৎসাহের আড়ম্বর লক্ষিত হয়। 'মহিলা মঙ্গল' কেন্দ্র স্থাপিত হয়, মহিলাদের স্বাবলম্বি করার জন্যে।

১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর মাসে জয়ন্তী অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিতে আলোচনা সভা, আবৃত্তি অনুষ্ঠান এবং নাট্যাভিনয় হয়। সভ্যদের দ্বারা তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটক পরিচালনা করেন মানস মুখার্জী (মঞ্চ ও ফিল্ম)।

এই ভাবে ১৯৩৬ সাল থেকে কোন্নগরের বুকে আইডিয়াল সোসাইটি একটি সর্বার্থ সাধক প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। 'ক্রেতা দিবস' সকলকে আহ্বান করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মীতায়।
(১৯৯৫ সালে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলিত)

লেখক — সঞ্জীব সেন

কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান

পরাধীন ভারতে যুবকদের মধ্যে বলিষ্ঠ শরীর ও চরিত্র গঠনের জন্য গোপনে বা প্রকাশ্যে বিভিন্ন ব্যায়াম সমিতির জন্ম হতো। ১৯৩৭-৩৮ সালে কোন্নগর জি. টি. রোডস্থিত ঁক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহির্বাটিতে গড়ে উঠেছিল এইরকমই একটি ছোট্ট সমিতি যেখানে ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠিখেলা ও ছোরা খেলা শিক্ষা দিতেন তখনকার দিনের বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা ও অসি চালক ঁক্ষেত্রমোহন বাবু (মাষ্টার মশাই) নিজে।

১৯৪০ সালের গোড়ার দিকে মাষ্টার মশাই অসুস্থ ও অক্ষম হয়ে পড়ায় এই সমিতিটি প্রায় অচল হয়ে পড়ে। সেই সময়ে সেখানকার অগ্রণী সদস্য শ্রী চন্ডীচরণ ভট্টাচার্য, ঁসত্য নারায়ণ পাল, ঁমুক্তারাম ধাড়া ও তরুণ সভ্য ঁকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় ও নীলমণি বন্দোপাধ্যায় নতুন করে আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, ঁকাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পিছনের জমিতে, মূলতঃ তাঁরই অক্লান্ত পরিশ্রম নিষ্ঠা ও পরিচালনায় ১৯৪০ সালে জন্ম নিল এই 'কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান'।

তারপর নানা কারণে বারবার স্থান পরিবর্তন করে ১৯৫০ সালে বর্তমানের নিজস্ব জমিতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রতিষ্ঠান। প্রধানত ব্যায়াম, শরীরচর্চা, ও জিমনাস্টিক্স শিক্ষা দেওয়া হয় এখানে। শরীরচর্চা ও খেলাধূলার সাথে সাথে সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ কর্ম ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপেও অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে এই প্রতিষ্ঠান।

১৯৪৩ সালে দুর্ভিক্ষের সময়ে বুভুক্ষু নিরন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে যৎসামান্য হলেও খাদ্য জোগান ও চিকিৎসার সাধ্যমত ব্যবস্থা করেছিল এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা।

সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশের ক্ষেত্রেও ১৯৫০ এর দশকে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় রচিত হয় এই প্রতিষ্ঠানে। ১৯৫৫ সাল থেকে ক্রমান্বয়ে দশ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে সারা বাংলা থিয়েটার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রয়াত বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায়ের অর্থানুকূল্যে এখানে নির্মিত হয় "বঙ্কিম মঞ্চ"। কোন্নগরের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা ১৯৫৭ সালে এই মঞ্চে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের ক্রিয়াকলাপের ভূয়সী প্রশংসা ও আর্শীবাদ করেন। এছাড়া কোন্নগর পৌর সভার সহযোগিতায় ৮০র দশকে বেশ কয়েক বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিরাট পুষ্পমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলা অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ও সমগ্র কোন্নগর বাসীকে আকৃষ্ট করেছিল।

বিগত ৬০ বছর ধরে নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রতিষ্ঠান তার সুনির্দিষ্ট

লক্ষ্যে সগৌরবে এগিয়ে চলেছে।

১৯৯৩ সালে এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের আকস্মিক মৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানেব কাছে এক বিরাট আঘাত স্বরূপ। অবশ্য সেই আঘাতের হতাশা কাটিয়ে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র শ্রী মোহিত পাল, অশোক পান, সন্তোষ বেরা, অসিত পাল, অমর নাথ পাল প্রভৃতি নিষ্ঠার সঙ্গে এর পরিচালনার ভার নিজেদের কাঁধে তুলে নেন।

বর্তমানে বিভিন্ন বয়সের বালক বালিকাদের জিমনাস্টিক্স প্রশিক্ষণ দেওয়া ছাড়াও শুরু হয়েছে বয়স্ক পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যোগ ব্যায়াম শিক্ষা। এজন্য একটি সুন্দর যোগ ব্যায়াম কক্ষ নির্মিত হয়েছে এবং প্রয়াত কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত।

প্রতিষ্ঠানের বালক বালিকারা প্রায়ই বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা, রাজ্য ও জাতীয় স্তরে জিমন্যাস্টিকস প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক ও আরো নানা প্রকার পুরস্কার লাভ করেছেন।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায ১০০ জন। এদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বে আছেন সর্বশ্রী মোহিত পাল, অশোক পান সুদীপ বিশ্বাস প্রমুখ অগ্রগামী সদস্যেরা। মূল প্রশিক্ষক হিসাবে আছেন 'সাই' এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক শ্রী সুতেজ সাত্বিক।

বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সভ্য শ্রী অশোক পান, সুদীপ বিশ্বাস, অঞ্জন পাল ও মধুমিতা রাউত জাতীয় বিচারক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

যদিও এই প্রতিষ্ঠান জন্মাবধি তার আদর্শে ও কর্মে সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক. তবুও দেশাত্মবোধের তাড়নায় মাত্র দুবার ব্যতিক্রম হয়েছিল। প্রথমবার ১৯৪২ সালের আগষ্ট বিপ্লবের সময়ে এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকজন সদস্য সক্রিয় ভাবে "ভারতছাড়ো" আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল এবং দ্বিতীয় বার ১৯৪৬ সালে তদানীন্তন বাংলার মুস্‌লিম লীগ মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দীর প্রস্তাবিত 'সেকেন্ডারী এডুকেশন" বিলের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে, যেখানে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করেছিলেন ভারতের সুসন্তান বাংলার গৌরব শ্রী শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই সভার উদ্যোক্তা ছিলেন কোন্নগরের তখনকার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি ৺রমণীকান্ত চক্রবর্তী, ৺ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺মুরারী মোহন মিত্র, ৺ফণীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিরা।

এই কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান বর্তমানে কোন্নগরের একটি স্বনাম ধন্য প্রতিষ্ঠান এবং আশা করা যায় আগামী দিনে এই প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রী বৃদ্ধি ঘটবে।

সূত্র ঃ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত
৫০ বছর পূর্তি উৎসবের স্মরণিকা

লেখক ঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি

১৯২৮ সালে স্থাপিত রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি। হুগলি জেলা তথা সারা পশ্চিম বঙ্গে নিয়মিত খেলাধূলা চর্চার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে ; বিশেষ করে ভলিবল খেলা ও জেলা ভিত্তিক এই খেলার প্রতিযোগিতা পরিচালনায় এই সমিতি পথ প্রদর্শক বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না। সমিতি ভলিবলে সুপার ডিভিসন, ফার্ষ্ট ডিভিসন ও থার্ড ডিভিসনে অংশ গ্রহণ করে এবং গত বছরে (২০০০সালে)সুপার ডিভিসনে চাম্পিয়ন হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

হুগলী জেল টেবিল টেনিস এসোসিয়েশন অনুমোদিত এই সমিতি নিয়মিত টেবিল টেনিস খেলার অনুশীলন করে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সুনামের অধিকারী হয়েছে। ক্যারাম খেলার ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমানে টেবিল টেনিস খেলার জন্য স্থান সঙ্কুলানে যথেষ্ট অসুবিধা হওয়ায় সমিতি নিজস্ব জমিতে একখানি গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সাংস্কৃতিক চর্চার ক্ষেত্রে সমিতি যথেষ্ট তৎপর এবং নানা বিষয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে। সমিতির নাট্য ও ব্যাণ্ড বাদন বিভাগ আছে।

দুঃস্থদের সাহায্যে সমিতি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে।

সমিতির বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র রায় চৌধুরী ও শ্রী চন্দ্রনাথ সামন্ত।

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্নগর ইউথ রিক্রিয়েশন ক্লাব

১৯৬১র সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠিত একটি জন কল্যাণমুখী সমাজ সেবা মূলক ও সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার প্রতিষ্ঠান। ১৯৯৮-র ডিসেম্বরে এই ক্লাবের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ হয় এবং বর্তমান স্থায়ী ঠিকানা চণ্ডীতলা লেন, কোন্নগর হুগলি।

১৯৯৯ সালে কোন্নগরে সর্বপ্রথম স্বল্প মূল্যে যে, হেপাটাইটিস-বি টিকা করণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, সেই অনুষ্ঠানে এই ক্লাব সম্পূর্ণ ভাবে সর্বভারতীয় চিকিৎসক সমিতি কোন্নগর শাখার সংগে সর্বোতভাবে সাহায্য করে এবং ১৪০০ জনকে টিকাদান করে।

গ্রামের ও সমাজের উন্নতিকল্পে কোন্নগর ইউথ রিক্রিয়েশন ক্লাব নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনারপ্রতি গভীর আস্থাবান।

১৯৯৯ সালে সংস্থার সম্পাদক ছিলেন শ্রী শ্যামল দাস ও শ্রী সমীর সরকার।

তথ্য ঃ সর্বভারতীয় চিকিৎসক সমিতি কোন্নগর শাখা কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিশু চক্র ঃ শিশু উদ্যান ও শিশুমঞ্চ

রাজেন্দ্র নগর সমবায় আবাসন সমিতির আনুকূল্যে ইংরাজীর ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। (অন্যত্র লিখিত অধ্যাপক বঙ্কিম চ্যাটার্জীর জীবনী লেখার সময় রাজেন্দ্র নগর কো-অপারেটিভ সোসাইটি, রাজেন্দ্রনগর বিদ্যালয় এবং রাজেন্দ্র নগর লাইব্রেরী স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।) ঔষধের বিকল্প হিসাবে ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় যোগব্যায়াম অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুদের সুস্থ রাখাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৯১৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকুল্যে এখানে একটি মুক্ত মঞ্চের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। বর্তমানে এখানে শতাধিক শিশু ও মহিলা নিয়মিত যোগ অনুশীলন করে। বাৎসরিক অনুষ্ঠানে শিশুদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও যোগব্যায়ামের প্রদর্শনী হয়।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

অরবিন্দ পল্লী সবপেয়েছির আসর

যে কোন দেশের অগ্রগতি ও সুনামের মূলে রয়েছে সেই দেশবাসীর শিক্ষা, আচরণ ও কর্তব্যনিষ্ঠা। এই লক্ষ্য সামনে রেখে অরবিন্দ পল্লীর ছিন্নমূল উদ্বাস্তু পরিবারের শতাধিক শিশু ও কিশোরদের নিয়ে ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ৭ নভেম্বর জোড়াপুকুর এলাকায় স্থাপিত হয় এক কল্যাণ কেন্দ্র যা পরবর্তীকালে স্থানীয় কয়েকজন যুবক যুবতীর উদ্যোগে ভারতের অন্যতম বৃহৎ জাতীয় প্রতিষ্ঠান 'সব পেয়েছির আসর'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়। আসর-পতাকা প্রথম উত্তোলন করা হয় ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শুভ মহালয়ার দিনে। ক্রমশ অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়। অভিজ্ঞতার আলোকে দুর্বার গতিতে আসর এগিয়ে চলে।

শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ও নিয়মানুবর্তিতা, বিভিন্ন খেলাধূলা ও ব্যায়াম, কুচকাওয়াজ, ব্রতচারী, ড্রিল ও লোকনৃত্য, ব্যাণ্ড বাঁশি ও সঙ্গীত চর্চা করা হয়। আবৃত্তি, নাটক ও অংকন শিক্ষার ব্যবস্থাও আছে। বিভিন্ন হাতের কাজ শেখানো হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয়ে থাকে। খেলা ধূলার মধ্যে খো খো খেলায় এই আসরের সদস্যরা আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুষ্ঠিত জাতীয় উৎসবে ও বিশ্ববঙ্গ সম্মেলনে এই আসরের ভাই বোনেরা যোগ দিয়েছেন।

এই দীর্ঘ বৎসরগুলিতে রাজনৈতিক দলাদলি বর্জন করে এই আসর মানুষ গড়ার কর্মে নিযুক্ত। বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ীর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা এই আসর আন্তরিকভাবে প্রত্যাশা করে।

তথ্য ঃ আসর সভাপতি শ্রীচন্দ্রশেখর বসু

লেখক ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

আবাসন ফ্ল্যাট বাড়ি

লোক সংখ্যা, জমির দাম বৃদ্ধি প্রভৃতি নানা কারণে প্রমোটার কর্তৃক যৌথ আবাসন (বা ফ্ল্যাট বাড়ি) বহু পরিবারের এক ছাদের তলায় এক সাথে বসবাস বিগত ২০/২৫ বছর যাবৎ জীবন যাপনের এক অচ্ছেদ্য অংশ রূপে পরিগণিত হয়েছে অন্ততঃ এতদঞ্চলে। আমাদের রাজ্যে এবং সারা ভারতের প্রেক্ষিতে বিশেষ করে সহর ও সহরাঞ্চলকে ঘিরে খণ্ড খণ্ড জমিতে এক পরিবারের গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করা এখন ব্যতিক্রমে পরিগণিত হয়েছে। তাছাড়া পরিবারগুলিও নিউক্লিয়ার বা অণুতে পরিণত হয়েছে।

এই আবাসনগুলি কোন্নগরের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রমোটার দ্বারা নির্মিত হয়েছে ও হচ্ছে। আবাসনগুলি নির্মাণে ও সেগুলিতে বসবাসের ফলে অনেক সামাজিক, আইনগত (বিশেষ করে পুর গৃহ নির্মাণ আইন) সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে—যথা আবাসিকদের খেলধূলা ও বিনোদন সমস্যা প্রভৃতি।

এই সকল কারণে এই নূতন বাস্তবতার কারণে সমাজ বিশেষযজ্ঞদের নিবিড় অনুসন্ধান ও সমাধানের সূত্র আবিষ্কার করতে হবে। কোন্নগরে বর্তমানে আট/দশ জন এরূপ প্রমোটার এই কর্মকাণ্ডে জড়িত আছেন।

যতদূর মনে পড়ে এই কাজের সূচনা করেন শ্রী রাধাবল্লভ কর্মকার ও উপেন্দ্র নাথ ঘোষ।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

চারু-দুর্গা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড

চারু-দুর্গা মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড-র কাজ শুরু হয় ৯.৯.৮৪ সালে। বছরে আনুমানিক ৩০ হাজার টাকা বিভিন্ন সংস্থাকে অনুদান দেওয়া হয়। ট্রাষ্ট ফাণ্ডের বর্তমান কর্মপরিষদ ঃ

১। শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য — সভাপতি

২। শ্রী অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রাক্তন সম্পাদক ঃ কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক) — সম্পাদক

৩। ডঃ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় — ট্রাষ্টি

৪। শ্রী বাসুদেব ভট্টাচার্য — ট্রাষ্টি

৫। শ্রী রাখহরি ভট্টাচার্য — ট্রাষ্টি

৬। শ্রী মহাদেব ভট্টাচার্য — ট্রাষ্টি

৭। শ্রী গোপীনাথ মিত্র — ট্রাষ্টি

৮। শ্রীস্বপন দাস — পুর প্রধান, কোন্নগর পুর সভা-ট্রাষ্টি পদাধিকার বলে।

তথ্য সংগ্রাহক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

যুক্তিমন কলা ও বিজ্ঞান কেন্দ্র

স্থাপিত : ১৯৮৭

যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান সচেতনতা বৃদ্ধি অন্যতম সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোন্নগরের উত্তরে পি, সি, মুখার্জী স্ট্রিটে এটি গড়ে উঠেছে। ১৯৮৮ সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছোট বড় বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে সাফল্যের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছে এই সমিতি। তাছাড়া বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষচারা বিতরণ, রোপণ ও পরিবেশ দূষণ রোধে পথসভা করে থাকে। এছাড়া রক্তদান শিবির, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিশুদের উৎসাহ বর্ধনের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা প্রভৃতির আয়োজন করে থাকে। সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সংক্রান্ত সেমিনার, স্লাইডশো, মডেল তৈরি ও শিবির স্থাপনা প্রভৃতি সংগঠিত করে এই সমিতি।

লেখক : বিষ্ণু দত্ত

আনন্দম ক্লাব

(স্থাপিত ঃ ১৯৬১)

হারাণ ব্যানার্জী লেনের চলচ্চিত্রমের নিকট স্থানীয় কিছু যুবক ঐ অঞ্চলের অনুন্নত নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নয়নের ও জনসেবা তথা শিক্ষা-সংস্কৃতি খেলাধূলা প্রভৃতির কথা ভেবে সমবেত হয়ে "আনন্দম" নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে ১৯৬১ সালে। প্রথমে তারা পুর প্রশাসনের নিকট রাস্তাঘাট পানীয় জল, নিকাশী ব্যবস্থা প্রভৃতির উন্নতির জন্য দরবার করে এবং এ বিষয়ে কিছু সফলও হয়। সাথে সাথে খেলাধূলা ও অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং কর্মসূচি অনুযায়ী কাজ চালায়।

এরপর এই সংস্থা স্থানীয় শিশু ও বালকদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালে "আনন্দম নার্শারি এবং প্রাইমারী স্কুল" স্থাপিত করে। এই ব্যাপারে নারী পুরুষ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষের সহায়তা লাভ করে ধীরে ধীরে দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করতে সমর্থ হয়। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৩০০ জন ছাত্রছাত্রী ও কয়েকজন শিক্ষিকা আছেন। তাঁদের মাসিক বেতন ৭৫০/- টাকা। শিক্ষিকাদের মধ্যে বি.এ, বি, এড ও আছেন। এই বিষয়ে লায়ন্স ক্লাব, কলকাতা থেকে অর্থ সাহায্য লাভ করেছে।

এই ক্লাবের আর একটি উদ্যোগ এই অঞ্চলে একটি মাত্র জলাশয় আছে, যার সত্ত্বাধিকারী হচ্ছেন শ্রী কৈলাস মুখোপাধ্যায়। স্থানীয় মানুষ ও ক্লাবের দীর্ঘকালীল আবেদন নিবেদনে শ্রী মুখোপাধ্যায় এই বৃহৎ পুস্করিণীর অ'ট কাঠার মতো অংশ প্রয়াতপিতা ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়-এর স্মরণে "ভূপেন্দ্র সরোবর" প্রতিষ্ঠার জন্য পুরসভাকে দানের ইচ্ছা প্রকাশ করে এক পত্র দেন। এখন সেই 'ভূপেন্দ্র সরোবরের, কাজ যথারীতি সমাপ্তির অপেক্ষায় আছে। এই কাজ সমাপ্ত হলে শুধু জলের অভাবই পূর্ণ হবে না। স্থানীয় যুবকরা সাঁতার অভ্যাস করতে পারবে।

সূত্র — আনন্দম ক্লাবের সভাপতি
শ্রী ভক্তিব্রত্ত ভট্টাচার্যর প্রতিবেদন

উজ্জ্বল সঙ্ঘ

(স্থাপন ঃ ১৯৭২)

কোন্নগরের অরবিন্দ পল্লীর 'এল' পুকুরের পূর্বদিকে ১৯৭২ সালে কতিপয় যুবকের উদ্যোগে উজ্জ্বল সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল অঞ্চলের যুবকদের মধ্যে সংস্কৃতি চর্চা এবং সমাজ সেবা। সমিতি সরকারী সংস্থায় নিবন্ধীকৃত।

বিগত পাঁচ বছর ধরে নিয়মিত যুবক, যুবতী ও মহিলারা রক্তদানের মতো মহৎ কার্যে যুক্ত আছে। ২০০১ সালে ৬০ জন রক্তদান করেন। আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল অধিবাসীদের ছেলে মেয়েদের শারদোৎসবের সময় বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক বিতরণ করা হয় বছরে একবার।

পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সঙ্ঘের সভ্যগণ অঞ্চলে বৃক্ষরোপণে অংশ গ্রহণ করে থাকে।

লেখক ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন্নগর আরবান ডেভলপমেন্ট এণ্ড রিলিফ অর্গানাইজেশন

(K U D R U)

স্থাপিত ঃ ১৯৮১

১৯৮৯ সালে ডাক্তার নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-উপার্জিত প্রায় ১১ লক্ষ টাকা দিয়ে কোন্নগর আরবান ডেভলপমেন্ট রিলিফ অর্গানাইজেন (KUDRO) গঠন করেন। এই ট্রাষ্টের মূল উদ্দেশ্য ছিল কোন্নগর পৌর সভার পরিচালনায় কোন্নগর মাতৃসদন প্রাঙ্গনে একটি মেডিকেল ও সার্জিকাল ওয়ার্ড স্থাপন পিতৃব্য বিনয় কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং নামাঙ্কিত একটি পাঠাগারও প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্থানীয় শিক্ষা, সমাজ সেবা ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা এই ট্রাষ্টে আছে।

ইতিমধ্যেই কোন্নগর পৌরসভাকে মেডিকেল ও সার্জিকাল ওয়ার্ড স্থাপনের জন্য ২, ৬০, ০০০ টাকা দেওয়া হয়েছে। ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য পৌরসভা ২৫,০০০ টাকা পেয়েছে। সি. এস. মুখার্জী ষ্ট্রীটে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুরাতন চেম্বারের দ্বিতলে ১,৩২,০০০ টাকা ব্যয়ে বিনয়কৃষ্ণ পাঠমন্দির নির্মিত হয়েছে। এখানে একজন গ্রন্থাগার কর্মী আছেন। সপ্তাহে পাঁচদিন বিকেল ৪টে থেকে ৬টা পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। গ্রন্থাগারে আসবাবপত্র ও পুস্তক ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে স্থানান্তরিত। কোন্নগর পাঠচক্রকে এখানে সভা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কয়েকটি বিদ্যালয় ও ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান আনুমানিক ৫০,০০০ টাকা সাহায্য পেয়েছে।

এই ট্রাষ্টের পরিচালক সমিতির সদস্য সংখ্যা ৭।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফান্ড

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতিতে থেকে উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন অর্থের। ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় স্ব-উপার্জিত অর্থ দেড় লক্ষ টাকা দিয়ে পিতা প্রসাদ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা হরিদাসী দেবীর স্মৃতিতে ১৯৮০ সালে "হরি-প্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফান্ড" স্থাপন করেন। এই ট্রাষ্টের সুদ থেকে বছরে আনুমানিক ১৭/১৮ হাজার টাকা কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে অনুদান দেওয়া হয়।

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মোট অনুদানের পরিমাণ ২, ৮৪, ৪১০ টাকা। যেসব প্রতিষ্ঠান সাহায্য পেয়েছে তাদের মধ্যে আছে হাসপাতাল, খেলাধূলা ও ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সমিতি, বিদ্যালয়, পাঠাগার, ধর্মীয় ও সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠান।

৭ সদস্যের এক অছি পরিষদ ট্রাষ্টটি পরিচালনা করেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

উন্নয়নী মহিলা সমবায় সমিতি (নারী সহায়ক সংস্থা)

স্থাপিত ঃ ১৯৯১

এখন থেকে বছর দশেক আগে কয়েকজন সমাজ সচেতন মহিলা লক্ষ্য করলেন যে, কোন্নগর শহরে বা আশে পাশে এমন কোন সংস্থা নেই যেখান থেকে অসহায়, স্বামী পরিত্তুতা, নিপীড়িতা ও দরিদ্র বিধবা মহিলা সামান্যতম সাহায্য পেতে পারেন। এঁদের জন্য সহায় সম্বল কিছুই ছিল না। কিন্তু কেবল মাত্র প্রবল ইচ্ছা শক্তি মনের দৃঢ়তা ও সাহসের উপর নির্ভর করে ১৯৯১ সালের ২২ নভেম্বর রবিবার, মাত্র ৩ জন মহিলা মিলে ২৩বি/ডি, এ. কে. ব্যানার্জী লেনে রমা দাঁ ও শঙ্কর দাঁর বাড়ির ছাদে উন্নয়নী মহিলা সমবায় সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক চিন্তা ভাবনা করে প্রথমে ১৫ জন মহিলাকে দিয়ে ডালের বড়ি তৈরি করা দিয়ে শুরু হয়। এতে তখনকার সময়ে ওদের মাসে অন্তত ২০০/৩০০ টাকার সংস্থান সুনিশ্চিত হল।

সে অঙ্কুর আজ শাখা প্রশাখা বিস্তার করে অনেক বিস্তৃত হয়েছ। সমিতির কর্মকাণ্ডের সঙ্গে আজ অনেকেই যুক্ত হয়েছেন। এখানে বলা দরকার সমিতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মহিলাদের আত্ম চেতনাকে উন্নত করা। বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলা ও অক্ষর পরিচয়হীনকে সাক্ষর করে তোলা। এছাড়াও সামাজিক উন্নয়ন সহায়ক কর্মসূচিতে যুক্ত হওয়া। যে সমস্ত কর্মসূচি চালু হলো তা হলো—সূচী শিল্প, টেলারিং, বাটিক, ফেব্রিক, পাটজাত শিল্পকর্ম, ইনটিরিয়র ডেকোরেশান, সফট্‌ডলিং, উলবয়ন, কাঁচা শাক সবজী ও ফল সংরক্ষণ, জেলী ও আচার তৈরি করা ইত্যাদি।

এ ছাড়া সরকারী ও পৌর সভার সহায়তায় বিভিন্ন ধরণের স্বল্প-মেয়াদী প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ। যেমন, মৌমাছি পালন, মাশরুম চাষ, মেশিন রিপেয়ারিং, প্যাডইঙ্ক, লিকুইড সোপ, মোমবাতি, ধূপকাঠি, কাঠের চামচ তৈরি করা। শিক্ষিতা ও অল্প শিক্ষিতা মহিলারা যাতে স্বনির্ভর হতে পারেন সে জন্য ১৯৯৮ সাল থেকে মন্তেসরী ট্রেনিং শুরু করা হয়েছে। আগামীতে যে সমস্ত পরিকল্পনা

চালু করার সম্ভাবনা আছে সেগুলি হলো—ক্রেশ ও নার্সিং ট্রেনিং, স্পোকেন ইংলিশ, কম্পিউটার, ফাস্ট এড। প্রতিবছর ১০জন নিম্নবিত্ত পরিবাবের মহিলাকে বিনা ব্যয়ে সূচী শিল্প ও টেলারিং শেখানো হয়। প্রতি বছর মহিলাদের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য শিবির ও সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শিবিরে বিনা ব্যয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকে।

সামাজিক উন্নয়নে কিছু কর্মসূচীও সমিতির কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত। যেমন কোন দুঃস্থা ও অত্যাচারিতা মহিলাকে বিনা ব্যয়ে আইনি সহায়তা দেওয়া। পুরনো জামা কাপড় সংগ্রহ করে দরিদ্র মানুষের মধ্যে ও অনাথ আশ্রমে বিলি করা পুরনো পেসমেকার সংগ্রহ করে নিম্ন আয়ের রোগীকে দেয়া। উল্লেখ্য অতি সম্প্রতি কানে শুনতে অসুবিধা হয় এমন একজন দুঃস্থ বালককে বিনা মূল্যে হিয়ারিং এড দেওয়া হয়েছে। মরণোত্তর চক্ষু ও দেহদান কর্মসূচীওসমিতি গ্রহণ করেছে।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর মধ্যে আছে, প্রতিবছর বিদ্যালয় পর্য্যায়ের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় ও সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। এছাড়া সমিতির সদস্যা ও ছাত্রীরা একযোগে সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদিব আযোজন ও তাতে অংশ গ্রহণ করে। সমিতির ছাত্রীদের মধ্যে সূচী শিল্পের প্রতিযোগিতা হয়। এতো বিস্তৃত কর্মসূচী সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত এই সমিতির স্থায়ী ঠিকানা নেই।

সম্পাদিকা

উন্নয়নী মহিলা সমবায় সমিতি

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড

কোন্নগরের অর্থনীতিতে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের এক উজ্জ্বল ভূমিকা আছে। আজ থেকে প্রায় ৮০ বছর আগে ভারতবর্ষ তখন বৃটিশ সরকারের শাসনাধীনে। দেশের যুব সাধারণের মনে নিজের দেশ ভারতবর্ষকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্ত করার প্রচণ্ড প্রয়াস চলছে। কেউ বিপ্লবী হয়ে আত্ম বিসর্জন দিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে চাইছে, আবার কেউ কেউ অন্যভাবে নিজেদের ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে মানুষকে একতাবদ্ধ করে মানুষের সেবায় নিজেদের উজার করে দিতে চাইছেন। ঐ সময় আমরা সব দিক দিয়েই তদানীন্তন সরকারের কাছে অবহেলিত ছিলাম। বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায়, সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের কষ্টের শেষ ছিল না। সুদখোর কাবুলিওয়াদের শোষণ দারুণ ভাবে অব্যাহত ছিল। ঐ সময় দেশে নবজাগরণের জোয়ার এসেছিল কোন্নগরের জনক মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের কয়েকজন উত্তরসূরী, এই কোন্নগর গ্রামেরই কয়েকজন শিক্ষিত ও উৎসাহী যুবক সমবায়ী চিন্তাধারা ও এর উপকারিতাকে মাথায় রেখে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। প্রথমে তাঁরা Friends Literary Organisation নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পরলোকগত অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয় ভূষণ ঘোষ, ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বসু ও ললিত মোহন ঘোষাল প্রমুখ। তাঁরা ঐ সময়ে গ্রামের পাঠাগার, বিদ্যালয় প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে সেগুলির উন্নতিসাধনে নিজেদের নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা রোজই ৺বিনয় ভূষণ ঘোষের বাড়িতে বসতেন। সকলে ঐ বাড়িটিকে বিলেতের Carlton House বলে পরিচয় দিত অর্থাৎ এই বাড়িতে বসেই যুব সম্প্রদায় কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি সেই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতো। এই রকম একটা চিন্তাভাবনা থেকেই ১৯২৩-র ১লা এপ্রিল কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের জন্ম হয়। এঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ৺সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ৺উত্থানপদ মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় প্রমথ নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ৺নলেন্দ্র নাথ ঘোষ, শ্রদ্ধেয় ৺অচ্যুত চরণ

মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ঁপ্রফুল্ল কুমার দেব, শ্রদ্ধেয় ঁবিষ্ণু চরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় ঁভবাণী চরণ সেন, শ্রদ্ধেয় ঁনগেন্দ্র নাথ সেন, ও শ্রদ্ধেয় ঁতুলসী চরণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ যুবক বৃন্দ তাস পাশা খেলে আড্ডা না দিয়ে সমবায় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হলেন। ঐ সময় ঁললিত মোহন ঘোষাল সমবায় দপ্তরে কাজ করতেন। তিনি খুব সাহায্য করেছিলেন। নিম্নলিখিত সভ্যদের নিয়ে প্রথম কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় ঃ

১।। ঁননীগোপাল বসু — সভাপতি

২।। ঁসত্যচরণ মুখোপাধ্যায় — সম্পাদক

৩।। ঁউত্থানপদ মুখোপাধ্যায় — কোষাধ্যক্ষ

৪।। ঁনলেন্দ্র নাথ ঘোষ — সদস্য

৫।। ঁপ্রফুল্ল কুমার দেব — সদস্য

৬।। ঁসুরেশ চন্দ্র বসু — সদস্য

৭।। ঁগোপাল কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — সদস্য

ঐ সময় (১৯২৩) সভ্য ছিলেন ১৫ জন, মূলধন ছিল ১২৫ টাকা মাত্র। ১৯২৪ সালে সভ্য সংখ্যা হয় ৭৩ জন, মূলধন ১০৪৬ টাকা, আমানত সংগ্রহ ৭৮৩ টাকা, বিবিধ খরচ হয় ১৫ টাকা, লাভ হয় ৮৩ টাকা ও মোট দায় ১৯২৭ টাকা ও লভ্যাংশ বণ্টন হয় শতকরা ৬.২৫ ভাগ। আর এখন ৩১.৩.২০০১-এ দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ ঃ

সদস্য সংখ্যা ঃ ৪৫১৭ জন

নামমাত্র সভ্য ঃ ১৯১০ ”

আদায়কৃত মূলধন ঃ ৪৪.৮৭ লক্ষ টাকা

আমানত সংগ্রহ ঃ ১৪.১৮ কোটি টাকা

ঋণ দান ঃ ১২৫ লক্ষ টাকা

প্রথম প্রথম ঁবিনয় ভূষণ ঘোষ, ঁনলেন্দ্র নাথ ঘোষ ও ঁসত্যচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে পর্যায়ক্রমে ব্যাঙ্কের কাজকর্ম চলত। পরে ১৯৩৬-৩৭

সনে বর্তমান ব্যাঙ্কের নিজস্ব জমিতে ৯৬২০ টাকা খরচ করে ব্যাঙ্ক ভবন তৈরি করা হয় ১০ কাঠা ১১ ছটাক জমিতে। এই কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের ৭৫ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বর্তমানে ব্যাঙ্কের চারটে বাড়ি ও ১টি মোটামুটি বড় তিনতলাতে প্লাটিনাম জুবিলী হল তৈরি করা হয়েছে। কোন্নগর ক্রাইপার রোডে একটি নতুন ব্রাঞ্চ চালু করা হয়েছে। ১৯৭৫ সন অবধি এই ব্যাঙ্ক ক্রেডিট সোসাইটি হিসাবে চিহ্নিত ছিল। ১৯৭৬-৭৭ সাল থেকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের লাইসেন্স প্রাপ্ত একটি পূর্ণাঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক হিসাবে অত্যন্ত দক্ষতা ও প্রশংসার সঙ্গে সুন্দর ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কোন্নগর বাসীর কাছে এই ব্যাঙ্ক তাদের নিজস্ব সম্পদ। তাদের আশু প্রয়োজনে যেমন মেয়ের বিয়ে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, গৃহ নির্মাণ, গৃহ সংস্কার, বেকার সমস্যা সমাধান ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতা ও দুঃস্থ মহিলাদের স্বনির্ভরশীল করার জন্য সব রকমের সাহায্য এই ব্যাঙ্ক দিয়ে আসছে। গ্রামবাসীদের মধ্যে সঞ্চয়-অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখার সহজ ও নির্ভরশীল ব্যবস্থা করা হয়েছে। সভ্য/সভ্যাদের প্রয়োজনে লকারের ব্যবস্থা যেমন করা হয়েছে তেমনি অবসর বিনোদনের জন্য পুরীতে সমুদ্রের তীরে একটি সুন্দর হলিডে হোমেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ এই প্রাচীন সমবায় ব্যাঙ্কটি কোন্নগর বাসীর কাছে সত্যিকারের বন্ধুর মতন কাজ করে চলেছে! শুধু তাই নয় কোন্নগর পৌরসভার সহায়ক হিসাবে কোন্নগরের অর্থনীতিতে এই সমবায় ব্যাঙ্কটির ভূমিকা অনবদ্য। এই সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য একদিকে যেমন দক্ষ প্রশাসনের ভূমিকা আছে, তেমনি সমস্ত স্তরের কোন্নগরবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা সব সময় পেয়ে আসছে। বর্তমান পরিচালকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা তাদের লাভের অংশ থেকে প্রতি বছর পালন করতে হচ্ছে যেমন মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিকে ভাল ফল করলে ঐ সমস্ত ছেলে মেয়েদের পুরস্কারের মাধ্যমে তাদের সম্মান ও উৎসাহ দেওয়া হয়। আবার বিদ্যালয়গুলির উন্নতির জন্য আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে। সব শেষে একটি আবেদন রেখে আমার প্রতিবেদন শেষ করতে চাই যে যাঁরা প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণ করবেন ঠিক ঠিক সময়ে আপনার ঐ ঋণের মাসিক কিস্তির টাকা ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে দেবেন কারণ আপনার দেয় টাকাই আবার অন্যজনের প্রয়োজনে ভীষণ ভাবে সাহায্য করে থাকে। আর যাঁরা এখনও সমবায়ের আওতার বাইরে রয়েছেন তাঁরা সমবায়ী হউন ও এই

সমবায় ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেশ ও দশের সেবায় নিজেকে যুক্ত করুন, কারণ সমবায়ের আর একটি মহান গুণ যে সমবায় শান্তির দূত। আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে যেমন থাকতে পারি,—তেমনি হঠাৎ কোন বিপদে পড়লে এই সমবায়ই সর্বাগ্রে এগিয়ে আসবে আপনাকে সাহায্য করতে। সেই জন্য সমবায় আজ শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় পৃথিবীর সর্বত্রই আদৃত।

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেড দীর্ঘজীবী হউক, শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলুক, মানুষের সেবা করুক।

লেখক ঃ শ্রীগৌরীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায়

পরিচালক

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ ও

সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ সমবায় ব্যাঙ্ক সমূহের ফেডারেশন

কোন্নগরে অবস্থিত ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলি

ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া— কোন্নগর শাখা

- সর্বোচ্চ পে-অফিস ১৯৬০ সাল থেকে স্বীকৃত
- বর্তমানে এই ব্যাঙ্কে সব রকম ব্যাঙ্কিং কাজ হয়ে থাকে
- কোন্নগর এস. পি. মুখার্জী স্ট্রিটস্থ শ্রীশিবশঙ্কর গাঙ্গুলী কর্তৃক নির্মিত ভবনে ১৯৭৬ সালে স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে এই বাড়ির মালিক শ্রী সাধন দাস। ভবনটি ত্রিতল
- ২৬/১২/৯৬ থেকে ব্যাঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে কমপিউটারাইজড হয়েছে

এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক কোন্নগর শাখা

- ব্যাঙ্কটির উদ্বোধন হয় ক্রাইপার রোডে শহীদ বেদীর উল্‌টা দিকে এক ভাড়া বাড়িতে। বাড়ির মালিক—শ্রীজগবন্ধু সাধুখাঁ।
- ১৯৭৫-র পর কোন্নগর পুরসভার সাথে চুক্তি অনুযায়ী পুরসভা পরিচালিত সুপার মার্কেটের দোতলায় দক্ষিণ দিকে ১৯৯৩/৯৪ সালে এই ব্যাঙ্ক স্থানান্তরিত হয়।
- সম্পূর্ণ কম্‌পিউটারাইজড হয় ২২/৪/২০০১

কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ

প্রধান কার্যালয় ঃ ৬৬ জি. টি. রোড (পশ্চিম) কোন্নগর

শাখা ” ঃ ২ ডাঃ এস. কে. দেব স্ট্রিট, কোন্নগর

(সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত পৃথক ভাবে দেওয়া আছে)

তথ্য ঃ শ্রী সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

আনন্দমঠ

স্থাপিত ঃ ১৯৬৫

সি. এস. মুখার্জী স্ট্রীট ও নেতাজী সুভাষ রোডের সংযোগস্থলের কাছে নেতাজী সুভাষ রোডের পূর্বধারে এই প্রতিষ্ঠান।

ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার অনুশীলন করে এরা শ্রীদুর্গার মাঠে। ইন্‌ডোর ক্যারাম খেলার বোর্ড আছে। প্রতিবছর এই সংস্থা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকে। এরা দীর্ঘদিন বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী পালন করে আসছে উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি ও লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায়। রেল লাইনের ধারে এদের সৃষ্ট বনবীথি পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

কিশোরদের শিক্ষাদান ও অঙ্কন শিক্ষার বিভাগ আছে। এছাড়া বিপদগ্রস্ত মানুষের জন্য এরা চাঁদা সংগ্রহ করে নানা ভাবে সহায়তা করে। সভ্য সংখ্যা ৫০। বর্তমানে এই সংস্থার সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীকান্ত সিং ও শঙ্কর সিং।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সূত্র ঃ সুব্রত ভৌমিকের সাথে কথোপকথন।

কোন্নগর সম্মিলনী ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৬৬

১৯৬৬ সালে কালীপূজার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। ছাঁচী বেড়া দিয়ে ৩৬, জি. টি. রোড (পূর্বে) একটি ঘর তৈরি হয় এবং শুরু হয় নানা সমাজ সেবামূলক কাজ। সাথে সাথে চলতে থাকে প্রগতিশীল নাটক ও সংগীতের চর্চা। কলকাতা সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হয় এই সংগঠন। শারীরিক সক্ষমতা ছাড়া কোন কাজেই প্রতি ষ্ঠিত হতে পারে না মানুষ। একথা মাথায় রেখে শুরু করা হয় ফুটবল ক্রিকেট ও টেবিল টেনিসের সাব জুনিয়র কোচিং ক্যাম্প। প্রতি বছরে এই সব জুনিয়র বিভাগের প্রতিযোগিতা স্থানীয় পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে সাড়া জাগায়,সহযোগিতায় এগিয়ে আসেন স্থানীয় রেফারী, আম্পায়ার ও ক্রীড়ামোদী জন সাধারণ। তাঁদের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কৃত হয় এই প্রতিষ্ঠান।

কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সভ্যেরা এখানেই থামতে চায়নি। নিম্নবিত্ত মানুষের অসুস্থতা ও পরিষেবার কথা মাথায় রেখে প্রতিষ্ঠিত হয় ফ্রী মেডিসিন ব্যাঙ্ক যা উৎসর্গীকৃত হয় কোন্নগরের আপামর জনগণের হৃদয়ের মানুষ প্রয়াত জয়ন্ত ঘোষের (ঘণ্টুদার) নামে। স্থানীয় চিকিৎসকগণের সহায়তায় আজও চালু আছে জয়ন্ত ঘোষ স্মৃতি ফ্রী মেডিসিন ব্যাঙ্ক। শুধু কোন্নগর নয় দূর দূর থেকে মানুষ আসেন এখানে চিকিৎসার জন্য।

১৯৯৭ সালের ২০শে জুলাই বাংলা তথা ভারতের প্রখ্যাত ক্রিকেটার অম্বর রায় উদ্বোধন করেন এ্যাম্বুলেন্স ও শববাহী গাড়ীর। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দলমত নির্বিশেষে স্থানীয় জনসাধারণ দু'টি বেড উপহার দেন দরদী চিকিৎসকের অধীনে সাময়িক চিকিৎসার জন্য। রাত্রিকালীন পরিষেবা দেওয়ার জন্য একজন করে চিকিৎসক রাত্রে থাকা শুরু করেন। পরবর্তীকালে নানা বহিরাগত কারণে এটা বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের প্রতিবেশী শ্রীজয়ন্ত চক্রবর্তী তাঁর পিতার স্মরণে একটি ECG ও X Ray মেশিন এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেছেন। X Ray,

Patholagy ও Ultrasonography শীঘ্রই চালু করতে পারা যাবে বলে আশা আছে। ছোটদের বসে আঁকো, নজরুল, রবীন্দ্র সংগীত ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য নানা রকম আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় মাঝে মাঝে। করা হয় রোগ নির্ণয়ের জন্য স্বাস্থ্য শিবির। প্রতি বছর রক্তদান শিবির করা হয় ও সংগৃহীত রক্ত বিনামূল্যে আর্ত মানুষের জন্য দেওয়া হয়

লেখক ঃ মানস রায় চৌধুরী

বকুলতলা স্পোর্টি ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৯১

প্রায় দশ বছর আগে বেঙ্গল ফাইনের মোড়ের কাছে নিউপার্ক, নতুনপাড়া ও সন্নিহিত অঞ্চলের কতিপয় কিশোর রক্তদান শিবিরের আয়োজন সহ বিভিন্ন সমাজ উন্নয়ন মুলক কাজ করতে করতে অনুভব করে যে সুনির্দিষ্ট একটি সংগঠন ছাড়া তাদের ক্রিয়া কলাপ সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করবে না। তাই ১৯৯১ সালে লাল্টু দাস, বিদ্যুৎ ভৌমিক, অপূর্ব সাহা, সহ প্রায় ৩০ জন কিশোর ডাঃ নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যকে সভাপতি, শ্রীপ্রাণগোপাল চক্রবর্তীকে সহ সভাপতি এবং শ্রীবিদ্যুৎ ভৌমিককে সম্পাদক করে প্রতিষ্ঠা করে বকুলতলা স্পোর্টিং ক্লাব।

প্রতিবছর রক্তদান শিবির, ক্যুইজ প্রতিযোগিতা, ফুটবল টুর্নামেণ্ট, বৃক্ষ রোপণ, রবীন্দ্র নজরুল জন্ম জয়ন্তী পালন প্রভৃতি কাজের মাধ্যমে এলাকার মানুষের প্রশংসা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। তাছাড়া মানুষের বিপদে আপদে ক্লাব সদস্যরা যথাসাধ্য সাহায্য করে।

বর্তমানে এই ক্লাবের সভাপতি, সহ সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে ডাঃ নরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রাণগোপাল চক্রবর্তী ও শ্রীঅপূর্ব সাহা।

সূত্র ঃ ক্লাব প্রেরিত প্রতিবেদন — লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কে. কে. রিক্রিয়েশন ক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৯০

১৯৯০ সালের কোন এক সময়ে কতিপয় বিভিন্ন বয়সের উৎসাহী যুবক শুধু খাওয়া আর আড্ডা দেওয়ার ইচ্ছায় জমায়েৎ হয়েছিল— পরিচিত হয়েছিল 'খাই খাই ক্লাব' নামে। কিছুদিনের মধ্যে এই উৎসাহী যুবকদের কাছে এটা একঘেয়ে লাগার জন্য তাদের মনের উত্তরণ ঘটল এবং একটা কিছু করার তাগিদ অনুভব করল। ফলতঃ কে. কে. রিক্রিয়েশন ক্লাবের জন্ম হলো। এবং কে. কে. রিক্রিয়েশন ক্লাব মানেই দুঃস্থ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সাহায্য সামগ্রী সংগ্রহ, চশমা, স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের জন্য পাঠ্য পুস্তক, পূজার আগে নতুন জামা কাপড়, মশারী ও কম্বল দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা।

এই সংস্থার কাছে যে কোন বিষয়েই আবেদনে সাড়া দেওয়া ও সাধ্যমত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর যোগান দেওয়া তাদের প্রধান ও একমাত্র কাজ। এখানে উল্লেখ্য যে, সংস্থা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের যাবতীয় দায় বিগত তিন বছর ধরে সংস্থা বহন করে চলেছে। কোন্নগরের বুকে অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান সাধারণ মানুষের বিশ্বাস ও আস্থার স্থলে পরিণত হয়ে ক্রমশই বিভিন্ন সেবা মূলক কর্মযজ্ঞের মধ্যে নিজেদের সমর্পণ করে চলেছে।

এই সংস্থার পাশে আজ অনেক হিতাকাঙ্খী ও সমধর্মী মানুষ দু'হাত বাড়িয়ে অর্থ সাহায্য ও সহযোগিতা করছেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য এরা যাত্রানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুষ্ঠান করে থাকে। এ বছর এরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছিল। সংস্থার বর্তমান সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে শ্রীবদ্রীনারায়ণ গাঙ্গুলী ও শ্রীপ্রভাস নন্দী।

সূত্র ঃ ক্লাব প্রেরিত প্রতিবেদন

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

পূর্বাচল সঙ্ঘ

(স্থাপিত ঃ ১৯৫০)

ডাকনাম ছিল বরিশাল পাড়া। কারণ '৪৭ সালে দেশভাগের পর বরিশাল থেকে আগত কয়েকটি পরিবার বাসগৃহ নির্মাণকল্পে এখানে জমি ক্রয় করেন। প্রথম বাড়িটি নির্মিত হয় ১৯৪৯ সালে। প্রথম দিকে স্থায়ী পথঘাট ছিল না বললেই হয়। পৌরখাতায় নাম ছিল, এস. সি. চ্যাটার্জী বাই লেন। কালক্রমে বাসিন্দাদের তাগিদে এবং তৎকালীন পৌরসভার উদ্যোগে রাস্তা তৈরি হয়। নাম, ক্ষুদিরাম সরণি—উত্তরে শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের মোড় থেকে দক্ষিণ-পূর্বে ডাঃ বঙ্কিম মুখার্জী স্ট্রীট অবধি।

পৃথিবীর কোনো মানব পুত্রই ডাজ্ নট্ লিভ বাই ব্রেড্ এলোন্। এখানেও তাই হলো। প্রথমে আবাস ও আহারের সংস্থান। তার পরই মনের বাতায়ন খুলে দিয়ে মুক্ত বাতাসের আনাগোনা। প্রতিষ্ঠা হলো 'পূর্বাচল সঙ্ঘ'। প্রতিষ্ঠা কাল ১৯৫০। প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক যথাক্রমে প্রয়াত বিনয় কুমার বসু ও প্রয়াত সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে প্রয়াত অধ্যাপক চঞ্চল কুমার চট্টোপাধ্যায়-এর নাম স্মরণযোগ্য। স্থানীয় তরুণদের নিজস্ব শ্রমে তৈরি হলো ক্লাবঘর। তখনকার প্রজন্মের অনেকেই ছিল তরুণ অথবা যুবা। বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা হতো। আজকে টিভি এবং ইণ্ডোর গেমস্ সম্বল।

ক্ষুদিরাম জন্মশতবর্ষে ১৯৮৯/৯০ সালে ক্ষুদিরাম সরণি ও শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের সংযোগস্থলে পূর্বাচল সঙ্ঘ একটি 'শহীদ বেদী' প্রতিষ্ঠা করে জনগণের পক্ষ থেকে অমর শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। বেদীমূলে বিশেষ অনুষ্ঠানে এখনো মাল্যদান করা হয়। উদ্যোক্তা পূর্বাচল সঙ্ঘ। এঁদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ওই স্থানে ক্ষুদিরাম বসুর একটি মূর্তি বসাবার পরিকল্পনাও তাঁদের রয়েছে।

শুরু থেকেই পূর্বাচল সঙ্গের উদ্যোগে ঘটা করে কালী পূজা করা হতো। এখন ঘটা করে দুর্গোৎসব পালন করা হয়। নিয়ম রক্ষার্থে কালীপূজাকেও এঁরা ত্যাগ করেন নি।

তথ্য ঃ শ্রী পুষ্কর পাল   লেখক ঃ নৈমিষারণ্য মুখোটী

তরুণ সঙ্ঘ

(শ্রীঅরবিন্দ রোড)

বিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে তখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ। সেই সময়ে কোন্নগরের যুবকদের মধ্যে নানা সংগঠন গড়ে তোলার প্রবণতা দেখা যায়। তরুণ সঙ্ঘ ছিল এমনই একটি শুভ প্রচেষ্টার ফসল। নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অবৈতনিক শিক্ষা বিস্তার ও জন কল্যাণ মূলক কাজ ছিল প্রধান কর্মসূচি। তারা নৈশ বিদ্যালয় ও অনাথ ভাণ্ডার—এই দু'টি বিভাগ চালু করে।

নানা আস্তানা বদলের পর অবশেষে ১৯২৪-২৫ সালে দীঘির মোড়ে মতিলাল মুখোপাধ্যায়-এর দান করা একখণ্ড জমিতে নৈশ বিদ্যালয় নির্মিত হয়। ভবনের উদ্বোধন করেন ড. ত্রৈলোক্য নাথ মিত্রের পুত্র শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয়।

তরুণ সঙ্ঘের স্থাপযিতাদের মধ্যে ছিলেন—অনাথ বন্ধু ঘোষ (বুলবুল), নন্দদুলাল মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ফণীন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

মেরী ক্লাব নাট্যানুষ্ঠানের মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে দেয়, বাকি অর্থ জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়। ননীগোপাল বসু ভবনের নকশা তৈরি করে দেন।

চল্লিশের দশকের শেষ নাগাদ সঙ্ঘের অবলুপ্তি ঘটে। বর্তমানে শিশির কুমার ঘোষের বিশেষ উদ্যোগে এই ভবনে এক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়, সেটি এখনো চালু আছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

শ্রীরামপুর লায়ন্স ক্লাব ঃ

শ্রীরামপুর লায়ন্স ক্লাব ১০ বছরের বেশি সময় কোন্নগর অঞ্চলে নানা জন কল্যাণমূলক কাজে ব্যাপৃত আছে—যথা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের ভিটামিন সেবন করান, পালস পোলিও টীকা করণ, কোন্নগর মাতৃসদনে রোগীদের বিনামূল্যে চক্ষের ছানি অপারেশন, রক্তদান শিবিরে সহায়তা দান, এবং বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ ও অর্থসাহায্য দান।

কোন্নগর লছমী নারায়ণ জুট মিলের পশ্চিমে 'এসটেট সূর্য নারায়ণ সাহা' কর্তৃক প্রদত্ত আনুমানিক ৫ কাঠা জমিতে ২/৩ বছর আগে ক্লাব 'সূর্য নারায়ণ মেডিকেয়ার সেণ্টার' নির্মাণ করেছে।

লায়ন্সদের মধ্যে অধ্যাপক সতোন সাহা, লাঃ প্রদীপ ব্যানার্জী, লাঃ সন্তোষ পচিসীয়া, লাঃ ডাঃ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি

(কোন্নগর শাখা)

ভূমিকা—১৮৬০ সালে কোন্নগরে জনক শিবচন্দ্র দেব নিজ বাড়িতে (বর্তমান গৌরধাম) কোন্নগর বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময়ের সামাজিক প্রথা অনুযায়ী অল্প বয়সেই মেয়েদের বিবাহ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি দীর্ঘকাল প্রাথমিক পর্যায়েই ছিল। সুতরাং কোন্নগরে নারী শিক্ষার প্রসার খুবই সীমিত ছিল। তাছাড়া নারীকে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সামাজিক বাধাও ছিল। এবং সেই সময়ে নারী আন্দোলনের কথা চিন্তা করাই যায় না। তবে কিছু কিছু নব চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন্নগরবাসীর বাড়ির মেয়েরা বাড়িতে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে নারী কল্যাণের কাজ করতেন। আর তাঁদের মধ্যে শিক্ষার আলোক প্রাপ্তি ঘটে।

১৯৫০ সালে বালিকা বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্তরের অনুমোদন পায়, ফলে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে বাল্য বিবাহও লোপ পেতে শুরু করে। তাই দেখা যায় নারীরা স্বাতন্ত্র লাভ করছেন ও স্বাধীনভাবে কাজে ব্যাপৃত থাকছেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে কোন্নগরে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে এবং তাদের উদ্যোগে তাদের বাড়ির মহিলারা তাদের পরিচিত মহিলাদের নিয়ে ১৯৫০ সলে কোন্নগরে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা গঠিত হয়—এ ব্যাপারে জেলার মহিলারা যথা মুক্ত কুমার, সন্ধ্যা মুখার্জী প্রভৃতি তাঁদের সংগঠিত হতে সাহায্য করেন। কোন্নগরের ইতিহাসে এটাই প্রথম মহিলা সংগঠন।

সমিতির যে কমিটি তৈরি হয় তার সভানেত্রী হন প্রয়াতা সুহাসিনী সেন বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। কার্যকরী সভানেত্রী অপর্ণা চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিকা ডলি বসু, সহ-সম্পাদিকা অনুপমা বসু (কালী দি), অন্যান্য সভ্যগণ—অন্নপূর্ণা চট্টোপাধ্যায়, মহামায়া সিংহ, রেখা দত্ত, নকুল রায়চৌধুরী, মীনা রায় চৌধুরী প্রমুখ।

সমিতি নারীদের মধ্যে সামাজিক ও কল্যাণমূলক কাজ শুরু করে। মহিলাদের সেলাই ও সূচী শিল্প শিক্ষাদান ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করত। বন্যা পীড়িতদের সাহায্যের জন্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে তাদের প্রেরণ করা ও বাড়ি বাড়ি গিয়ে কলেরা প্রতিষেধক টিকা দান করত। এখানে উল্লেখ্য, কোন্নগরে মাতৃসদন স্থাপনের জন্য সমিতি দাবি তোলে। ১৯৫৭ সালে কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠিত হয়। পুরনির্বাচনে এই সমিতির সভ্যবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টি ও প্রগতিশীল প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে।

কোন্নগরে প্রথম নারী সংগঠন হিসাবে সমিতির প্রার্থীদের জয়ে বিজয় মিছিল বার করত।

প্রায় ১২/১৪ বছর কার্যকলাপ চালিয়ে ধীরে ধীরে সমিতির কাজ ক্ষীণ হয়ে যায়।

তথ্য ঃ শ্রীমতী ডলি বসু। লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট পেনশনার্স এসোসিয়েশন

কোন্নগর

স্থাপিত ১৯৮০ সালে।

বাংলার জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে কোন্নগরের এক বিশেষ অবদান আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ডিরোজিওর শিষ্য মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব (১৮১১-১৮৯০) প্রমুখ ব্যক্তিগণ কোন্নগরের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ প্রচেষ্টায় একান্ত ভাবে সর্বশক্তি ও উদ্যম নিয়োজিত করেন। কোন্নগরের সুসন্তানগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সে-ধারা বিংশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। আর, এখন আমরা একবিংশ শতাব্দীর পাদপ্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত।

এতদঞ্চলের কিছু প্রবীণ নাগরিক কেন্দ্রীয় সরকারী অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সংগঠিত করা ও তাদের অভাব অভিযোগ নিয়ে তদ্‌বির-তদারকি করার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে এই সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। সূচনাকালে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধায়, কৃষ্ণলাল চট্টোপাধ্যায়, সুখময় পাকড়াশী, অনিল কুমার পাকড়াশী, দেবব্রত সুর চৌধুরী, মুকুন্দলাল বর্মণ, মণীন্দ্র নাথ মিত্র, বি, সি, রায়, বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে এর হাল ধরেন কালিদাস ভট্টাচার্য, বিমান চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন রায়, হৃষিকেশ সাউ, প্রবোধ কুমার মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ দাস, সুনীল কুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ।

মাত্র কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী এই সংগঠনের যে অঙ্কুর রোপন করেন, তা আজ ২০০১ সালে এক বিশাল মহীরূহের রূপ ধারণ করেছে। এই সংগঠনের বর্তমান সদস্য সংখ্যা প্রায় এক হাজার। এর পরিধিও এক বিরাট অঞ্চলে পরিব্যাপ্ত। উত্তরে বাঘের খাল (বাগখাল) ও রিষড়ার দক্ষিণ প্রান্ত, দক্ষিণে হিন্দমোটর, পূর্বে ভাগীরথী নদীর তীর থেকে রেল লাইনের পশ্চিমে অবস্থিত নবগ্রাম, সিল্লক, বহবহেড়া, ও কানাইপুর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই বিরাট অঞ্চলের কর্মপরিচালনা খুবই কঠিন ব্যাপার। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ ও পরিচালনার সুবিধার্থে

সমগ্র এলাকাকে ২২টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি অঞ্চলকে এক একজন কার্যনির্বাহী সদস্যের অধীনে রাখা হয়েছে। তাঁরা নিজ নিজ এলাকার সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

এই প্রতিষ্ঠান কলকাতা পেনশনার্স ফেডারেশন, চেন্নাই পেনশনার্স ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় পেনশনার্স কনফেডারেশন, দিল্লির সঙ্গে অনুমোদিত থেকে এই বিস্তৃর্ণ এলাকার অবসর প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সুখ-সুবিধা ও দাবী দাওয়া নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভারতব্যাপী প্রায় ৩৬ লক্ষ অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী সংগঠন সঙ্গেও বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ রেখে চলেছে। এছাড়াও এলাকার চারটি পোষ্টাফিস ও চারটি ব্যাঙ্কের আধিকারিকাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের পেনশন, তাঁদের অবর্তমানে তাঁদের স্ত্রীদের ফ্যামিলি পেনশন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে এই প্রতিষ্ঠান তৎপর থাকে। প্রতিষ্ঠানের ষান্মাসিক মুখপত্র 'পেনশন বার্তায়' পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ, সরকারী নির্দেশাবলী ও এলাকার বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সমস্যাবলীর কথা ছাপা হয় এবং তা সদস্যদের নিকট বিনামূল্যে বিতরিত হয়। এছাড়া সদস্যদের পরিবারের চিকিৎসার জন্য তাৎক্ষণিক আর্থিক সাহায্য দেওয়ার উদ্দেশ্যে গঠিত 'ওয়েলফেয়ার ফাণ্ড' থেকে প্রয়োজনে সুদমুক্ত ঋণদানের ব্যবস্থা আছে।

কেবলমাত্র আর্থিক দাবীদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এই সংগঠন নাগরিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনেও এগিয়ে এসেছে। যেমন কোন্নগর স্টেশন সংলগ্ন রেললাইনের পূর্বদিকে একটি অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার এবং উভয় বুকিং কাউন্টারের মধ্যে ভূগর্ভস্থ সংযোগস্থাপনের ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। রেলমন্ত্রীর কাছে লিখিত প্রস্তাব পাঠানোর ফলে পূর্বপারের বুকিং কাউন্টারটি সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে এবং গত ৭ই মার্চ সেটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানও সম্পন্ন হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত সহকর্মীদের সতেজ রাখতে, তাদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে সংগঠনের ভিতকে আরও মজবুত করে গড়ে তুলতে আনন্দানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। তাই এই সংগঠন প্রতি বছর কিছু কিছু বিনোদন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যেমন, বিজয়া সম্মিলন, বাৎসরিক মিলনোৎসব ইত্যাদি। একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি নিয়ে একটা

দিন সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত বয়স্ক লোকদের নিজেদের উপযোগী খেলা ধূলা, আবৃত্তি, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হয়। শীতের কয়েকমাসে আরো কয়েকটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তার মধ্যে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সেখানে সংগীতানুষ্ঠানের সাথে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সমাজ ও সাহিত্যচর্চারও ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া লাক্সারী বাসে করে বিশেষ বিশেষ স্থান পর্যটন ও লঞ্চযোগে নদীবক্ষে ভ্রমণ প্রভৃতিও সংগঠিত করা হয়। এটা বিনোদন ও শিক্ষামূলক ভ্রমণের মধ্যে পড়ে।

দেশের প্রবীণ নাগরিকদের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের বিরূদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নাম চেয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এই সংগঠনের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সংগঠন থেকে তিনজন সদস্যের নাম সুপারিশ করা হয় এবং সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সেই তিনজনকেই হুগলী জেলার 'জিলা-আধার' নামে সম্মানিত করে এই জেলার বয়স্ক ব্যক্তিগণের জন্য সামাজিক ন্যায় বিচার ও কল্যাণমূলক কাজ করার নিয়োগপত্র পাঠিয়েছেন।

কোন্নগর অঞ্চলের এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যবৃন্দ তাদের প্রশংসনীয় কাজের জন্য কোন্নগরের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। কুড়ি বৎসরের অধিক একটি প্রতিষ্ঠানকে সজীব ও সক্রিয় রাখা নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে শান্তি পদ ঘোষ ও সাধারণ সম্পাদক সুশীল চক্রবর্তী মহাশয় আছেন। তাঁদের এবং কার্যনির্বাহী সদস্যদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই সংগঠন বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে হুগলী জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের যথোপযুক্ত নেতৃত্বদানে সক্ষম হয়েছে।

লেখক ঃ সুশীল চক্রবর্তী

কোন্নগর পুরসভার অন্তর্গত শিশুউদ্যান, খেলার মাঠ ও বিনোদনের স্থান সমূহ এবং পরিবেশ সমস্যা

কোন্নগর পুর সভার আয়তন নির্দিষ্ট বা স্থির (অর্থাৎ ১,৬৭৩ বর্গমাইল—৪৩২ বর্গ কিলোমিটার) কিন্তু জনসংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ১৯৪৪ সালে ১৬ জুন যখন রিষড়া-কোন্নগর পুর সভা থেকে কোন্নগর পুরসভা আলাদা ভাবে সৃষ্টি হলো তখন এর লোক সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার, আর বর্তমানে যে হারে বাসগৃহ ও বিশেষ করে আবাসন গৃহ সমূহ (apartment house) নির্মিত হচ্ছে তাতে একবিংশ শতকে একলক্ষ অতিক্রম করার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং সম্ভাব্য এই পরিমান লোকসংখ্যার উপযুক্ত পানীয় জল, রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, নিকাশী ব্যবস্থা প্রভৃতি পরিষেবার জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রূপায়ণের সমস্যা ত আছেই, কিন্তু তার সঙ্গে নোতুন ধ্যান ধারণা (New Modern Conception) অনুযায়ী স্থানীয় পুরসভা বা সরকারের সামনে যে সমস্ত অবশ্য কর্তব্য বা করণীয় উপস্থিত হয়েছে তা হচ্ছে—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধূলা, সংস্কৃতি, বিনোদন বা অবসর যাপন এবং অবশ্যই পরিবেশ সুরক্ষা।

এই কারণে এবং এই প্রসঙ্গে ৩১. ৩. ৮৬ তারিখে অনুষ্ঠিত কোন্নগর পুরসভার উন্নয়ন স্ট্যাডিং সমিতির সভায় এই নিবন্ধের লেখক যে নোট দিয়েছিলেন তার অনুদিত কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হল—

*** তৃতীয় হচ্ছে সেটার কথা যেটা বর্তমান প্রকল্পে গুরুত্ব দেওয়া যায়নি, অর্থাৎ খেলাধূলা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য একটা উপযুক্ত মোটা টাকা বরাদ্দ করা দরকার যা মোট পরিকল্পনার ১০ শতাংশের কম হবে না। এর মধ্যে পড়বে (ক) পার্ক ও প্লে গ্রাউণ্ড (খ) আধুনিক কালের উপযোগী রবীন্দ্র মঞ্চ (Complex) ও (গ) সাহিত্য-সংস্কৃতি-শিক্ষা চর্চার জন্য ছোট ছোট হল।

*** সর্বশেষে পরিবেশ দূষণ রোধে ব্যাপক বৃক্ষ রোপণ কার্য-যার জন্য ইটের বেষ্টনী নির্মাণ অপরিহার্য।

৫০/৬০ বছর পূর্বে কোন্নগরে জলাভূমি সহ যে খোলা জায়গা, গাছ গাছালি ছিল, ছিল গঙ্গার ঘাট, পুকুর, ধানক্ষেত তাতে খুবই উন্মুক্ত পরিবেশ ছিল। এখনকার মত বন্ধ হওয়া পরিবেশ ছিল না। খেলাধূলার জন্য খেলার মাঠ ছাড়া অনেক খোলা জায়গা ছিল। তাই তখন খেলাধূলার জন্য মাঠ ও পরিবেশ সমস্যার কথাভাবতে হতোনা। বলা চলে কোন্নগর তখন একটি গ্রাম ছিল।

১৯৭০ সালে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়-এর আমলে যখন সি. এম. ডি. এ-র জন্ম হয় এবং সরকারের পক্ষ থেকে পুর উন্নয়নের পরিকল্পনা তৈরি ও অর্থ সংস্থানের ব্যবস্থা হয়। (পূর্বে এই সরকারী সহায়তার জন্য ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে পুরসভাগুলি ও তার সংগঠন ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েশনের মঞ্চ থেকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন করতে হয়েছিল।) এবং পুরসভা অনেক পরে, পঞ্চায়েতগুলির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার উদার হস্তে অর্থবরাদ্দ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিকল্পনা তৈরির দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে অবশ্য পুরসভাগুলির মতামত গ্রহণ করে।

এখন দেখা যাক ১৯৭০ সাল থেকে খেলাধূলা ও বিনোদনের জন্য সরকারী সহায়তায় কোন্নগর পুরসভার কি কি কাজ হয়েছে—

পার্ক ও খেলার মাঠ

১৯৭০-১৯৯৫ এই কার্যকালের মধ্যে ছোট বড় মোট ১৪টি শিশু উদ্যান তৈরি হয়। নিম্নে নামগুলি উল্লেখ করা হলো—মিত্র পার্ক, লেলিন শিশু উদ্যান, রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গ মঞ্চ (সীমানা প্রাচীর), একের পল্লী শিশু উদ্যান, সুব্রত শিশু উদ্যান, অমৃতলাল শিশু উদ্যান, সুকান্ত শিশু উদ্যান, সর্বমঙ্গলা দেবী শিশু উদ্যান, নারায়ণ শিশু উদ্যান, নজরুল কর্ণার, শহীদ স্মৃতি শিশু উদ্যান, নেলসন ম্যাণ্ডেলা শিশু উদ্যান, ক্ষুদিরাম শিশু উদ্যান ও গ্রীণ পার্ক।

১৯৯৫-১৯৯৭ কাল পর্বে শিবচন্দ্র দেব উদ্যান (কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সৌজন্যে) এবং গ্রামীণ ও নগর বিকাশের জন্য সাংসদ সুদর্শন রায় চৌধুরীর কোটা থেকে প্রাপ্ত ছ' লক্ষ আশি হাজার টাকায় এই উদ্যান নির্মিত, সত্যজিত রায় শিশু উদ্যান, কিশলয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দক্ষিণে নির্মিত শিশু উদ্যান এবং ১৯ নং ওয়ার্ডে নির্মিত শিশু উদ্যান। ১৯৭০-৯৫

কাল পর্বে দেব পাড়ায় অর্ধ সমাপ্ত শিশু উদ্যান। আর এই সময়ে যেগুলির জন্য স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল অথচ শিশু উদ্যান নির্মাণ সম্ভব হয়নি সেগুলির নাম—রায়পাড়া শিশু উদ্যান, নদীতট শিশু উদ্যান (বেঙ্গল ডিস্টিলারি, ভদ্রকালী প্রদত্ত জমি), শিবচন্দ্র শিক্ষাভবনের কাছে, এটি দেবের বাগানের কাছে (গোপাল বসু সরণিতে), সাতকড়ি কুমদিনী পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পূর্বে প্রস্তাবিত ননীগোপাল বসু শিশু উদ্যান।

এছাড়া Town and Country Planning Act বাবদ ছোট বড় অনেক জমি খণ্ড শিশু উদ্যান নির্মাণের জন্য রাখা আছে। অরবিন্দ পল্লীতে R.R. Department থেকে প্রাপ্ত খেলাধুলা ও বিদ্যালয় প্রভৃতির জন্য রাখা অনেক জমিও পুরসভার হাতে আছে যা দিয়ে একটি পূর্ণ মাপের খেলার মাঠ তৈরি এখনই সম্ভব। আরো আছে শকুন্তলা কালী মন্দিরের কাছে R.R. Department থেকে প্রাপ্ত জমি এবং বর্তমানে অব্যবহার্য কবর স্থানের পুরসভার জমি—এখানে বর্তমানে সারা বছরই খেলাধূলা হয়। নিবন্ধ লেখক পুর প্রধানকে আরো দুটি শিশু উদ্যান নির্মাণের জন্য স্থান নির্দিষ্ট করে চিঠি দিয়েছেন (১) ড. বি, আর আম্বেদকর শিশুউদ্যান (২) স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী শিশু উদ্যান। এছাড়া তারাশঙ্কর সরণির শেষ প্রান্তে কমবেশি ৫ কাঠার মাপের একটি ডোবা আছে, এখানে তারাশঙ্কর জন্ম শতবর্ষে একটি শিশু উদ্যান করা যেতে পারে। .

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে এই এলাকায় বিভিন্ন ক্লাবের নিজস্ব খেলার মাঠ আছে। যেমন, ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, শকুনতলা কালীমাতার নিজস্ব মাঠ, সপ্তর্ষি ব্যায়াম মন্দির, কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান, এ্যালকেলি কেমিকেলের আবাসনের মাঠ, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়, অরবিন্দ বিদ্যাপীঠ, নগেন্দ্র কুণ্ডু বিদ্যালয় প্রভৃতি। মাষ্টার পাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদের মাঠ (কোন্নগর পুরসভার সৌজন্যে), নবারুণ সমিতি, রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি, এবং সরকার এবং পুরসভার অধীনস্থ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মাঠ, এছাড়া দ্বাদশ মন্দির সংলগ্ন খেলার মাঠ ও পূজা স্থানের সংলগ্ন মাঠ সমূহ যথা—কালীদালান, চণ্ডীতলা, চড়কতলা, সাতবকুলতলার মাঠ (গোপীনাথ জীউর)

স্থায়ী মঞ্চসমূহ

যেখানে নানা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। যথা— কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের বঙ্কিম মঞ্চ (কোন্নগরে প্রথম মঞ্চ), ছোট কালীতলার পূজা মণ্ডপ, কালীতলা কলোনীস্থিত স্থায়ী মঞ্চ, মাষ্টার পাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদের নরেন্দ্র ব্যানার্জী পূজামণ্ডপ ও নাট মন্দির, নিউপার্ক এসোসিয়েশনের পূজা মণ্ডপ, 'এল' পুকুরের উত্তরে পূজা মণ্ডপ ও মঞ্চ, বারোয়ারীতলা (তিনবাতি) পূজা মণ্ডপ, চড়কতলা পূজা মণ্ডপ, হাতীরকুল সার্বজনীন পূজা মণ্ডপ, একের পল্লীর নির্মিয়মান পূজা মণ্ডপ ও মঞ্চ, ইউনাইটেড ইয়ুথের পূজা মণ্ডপ ও মঞ্চ, চক্রশ্রী ক্লাবের মঞ্চ, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন শিবচন্দ্র বিনোদ ভবন ও রমণীকান্ত মঞ্চ।

কোন্নগর রবীন্দ্রভবন

১৯৬১-৬২ সালে কোন্নগরের একটি প্রাচীন নাট্য সংস্থা ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের অছি পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে কোন্নগর পুরসভার তদানীন্তন বোর্ডের কথাবার্তা হয় যে, যদি পুরসভা উক্ত নাট্য সংস্থার এক বিঘা এক ছটাক জমিতে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণ তৎসহ ঐ জমিব দক্ষিণ পূর্ব কোণে একটি মহলা কক্ষ নির্মাণ করে দিতে রাজী থাকে তাহলে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের অছি পরিষদ এই জমি দান করতে রাজী আছে। তারপর অনিবার্য কারণে দীর্ঘদিনের ব্যবধানে ১৯৬৫-৬৬ সালে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়ন ৩/৫/১৯৬৬ তারিখে এক রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল মারফৎ কিছু সর্তসাপেক্ষে উক্ত জমি পুরসভাকে দান করে। এর পরে এক পয়লা বৈশাখে মঞ্চের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন অছি পরিষদের অন্যতম সদস্য সত্যহরি রায় মিত্র। মঞ্চের উদ্বোধন হয় ঐ বছরের শেষে। ঐ সময় থেকে ১৯৯৫-র ১৯মে ভবন নির্মাণের দিন পর্যন্ত মুক্ত মঞ্চে বহু নাটক মঞ্চস্থ হয়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ঐ দানকরা জমির দক্ষিণে মণি বাটীর অংশীদারদের কাছ থেকে এক বিঘা সাড়ে ছ'কাঠা পরিমাণ জমি স্বল্প মূল্যে পুরসভা ক্রয় করে। এবং ১৯ এপ্রিল ১৯৮১ তারিখে জমির দক্ষিণ পূর্ব কোণে ১৭০০০ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এক মহলা কক্ষের উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন

নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায়। ক্রীত জমির উত্তর পূর্ব কোণে প্রয়াত বিভূতি ভূষণ চক্রবর্তীর স্ত্রী সত্যবতী চক্রবর্তী একখণ্ড জমি দান করেন।

অবশেষে ১৯৯৫-র ১৯মে ১২০০ আসন বিশিষ্ট রবীন্দ্র ভবনের অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। এই ভবন নির্মাণে মোট ব্যয় হয় প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে সরকারী সাহায্য ২২ লক্ষ টাকা এবং পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় হয় ২০ লক্ষ টাকা। যদিও রবীন্দ্র ভবনের এখনো অনেক কাজ বাকি—যেমন শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য সিলিং, আঁলো, পাখা চেয়ারের ব্যবস্থা এবং মঞ্চ সংস্কার। এই কাজগুলি সম্পূর্ণ হলে কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন হুগলি জেলার মধ্যে একটি প্রশস্ত ও সুরম্য সংস্কৃতি ভবন রূপে স্বীকৃত হবে।

টাউন হল (নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল)

১৯৪৪ সালে কোন্নগর পুর সভার প্রতিষ্ঠা কাল থেকেই শহরের মধ্যস্থলে সভা সমাবেশ ও সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হিসাবে একটি টাউন হলের অভাব অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে ১৯৬৯এ তদানীন্তন পুর প্রধান অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে ২৮৯২৫ টাকা ৬৬ পয়সা ব্যয়ে এই হল নির্মিত হয়। এর মধ্যে কোন্নগর পুরসভার প্রথম পুর প্রধান নৃসিংহ দাস বসু মহাশয়ের পুত্রসুধীর কুমার বসু এককালীন ১২০০০ টাকা দান করেন। এই হল ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত কোন্নগরের যাবতীয় সভা, সম্মেলন ও নৃত্য সংগীত প্রভৃতি বহু অনুষ্ঠানের একমাত্র প্রশস্ত হল হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বর্তমানে এই হলের ১/৩ অংশ অধিকার করে নেওয়া হয়েছে, বাকি ২/৩ অংশ হল হিসাবে ব্যবহারের অপেক্ষায় আছে, আর এর জন্য বিভিন্ন মহল থেকে জোর দাবি আসছে।

সবুজায়ন ও পুষ্করিণী সমূহ

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা বলে যে, নগরায়নের সঙ্গে বৃক্ষ সম্পদের ধ্বংস চলতে তাকে এবং বর্তমানে এই ধ্বংসের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে, তাই সবুজায়ন বা বৃক্ষ রোপণের গতি আরে দ্রুততর করতে হবে। এ কাজে N.G.O যেমন উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি ও অন্যান্য বৃক্ষপ্রেমী সংস্থার সাথে পুরসভার এবং সরকারকে সমবেত ভাবে কাজ করতে হবে আর যুব সমাজকে ও ছাত্রছাত্রীদের এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।

এই কাজের সঙ্গে পুষ্করিণীগুলিকে রক্ষা করার একটা দায়িত্ব এসে পড়ে, যদিও এক নিশ্ছিদ্র আইনের মাধ্যমে এ কাজকে সহজ করেছে। পুষ্করিণীগুলি শুধু যে আবহাওয়াকে শীতল রাখে তাই নয় ভূগর্ভ জলস্তরকেও ধরে রাখে, মৎস্য সম্পদ সৃষ্টি করে এবং জল নিকাশী ব্যবস্থাকে সচল রাখে। আর সর্বোপরি পরিবেশকে রক্ষা করে।

পুষ্করিণী সমূহ

কোন্নগরে ব্যক্তিমালিকানাধীন বহু পুষ্করিণী আছে। এছাড়া পুরসভার নিজস্ব অনেকগুলি পুষ্করিণী আছে যার সংখ্যা অরবিন্দ পল্লীতে ১৪টি এবং অন্যত্র ৪টি। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বেশ কিছু পুষ্করিণী নানা আগাছা ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, ফলে সেখানে মশার উপদ্রব হচ্ছে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে। এগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরসভার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত জরুরী।

গঙ্গার ঘাট সমূহ

কোন্নগরে ৭টি গঙ্গার ঘাট আছে যে ঘাটগুলিত স্নান করা যায়। পূর্বে এরূপ দুটি স্নানের ঘাট গঙ্গাগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই সমস্ত ঘাটে তৎসহ দ্বাদশমন্দির ও নবনির্মিত শঙ্করাচার্যের মন্দির সংলগ্ন জমিতে বহু মানুষ অবসর বিনোদনের জন্যও ব্যবহার করে, যদিও ধর্মস্থান হিসাবে এগুলির প্রাধান্য।

বুলেভার্ড ও ছোট ছোটবিরাম আচ্ছাদন (Shed)

অনেক চওড়া রাস্তা আছে যার ধারে বুলেভার্ড নির্মাণ করা যেতে পারে, যেখানে মানুষ অবসর সময়ে বসতে পারে।

যুব হল (সভাগৃহ)

এলাকার অনেক স্থানে যুবকরা নিজ উদ্যোগে ক্লাবঘর নির্মাণ করে সম্মিলিত ভাবে ইনডোর গেম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে থাকে। পুরসভার

বিভিন্ন এলাকায় ছড়ান খণ্ড খণ্ড জমিতে এই ধরণের যুব হল নির্মাণ করলে যুবকদের শিক্ষা সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের চাহিদা মেটাতে পাববে।

প্রস্তাবিত শিশু উদ্যান সমূহ

কয়েক বছর আগে ড. বি. আর. আম্বেদকরে জন্ম শতবর্ষ পালিত হয়েছে সারা দেশে তাঁর নামাঙ্কিত ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে এবং তারাশঙ্করের জন্ম শতবর্ষে তিনটি শিশু উদ্যান নির্মাণের নির্দিষ্ট প্রস্তাব লেখকের পক্ষ থেকে পুর প্রধানের কাছে পাঠান হয়েছে এবং সেখানে স্থানগুলিরও উল্লেখ আছে।

এই প্রসঙ্গে আরো বলা যায়, যে সমস্ত জমি খণ্ড (I.M.Aর গৃহের দক্ষিণে অবস্থিত জমির খণ্ড সহ) উদ্যান নির্মাণের জন্য পুবতালিকায় বা পুরসভার গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আছে আর যেখানে উদ্যান নির্মাণ বা যুব হল নির্মাণ এখনই সম্ভব নয়, সেই সব স্থানগুলিতে যথাশীঘ্র সীমানা খুঁটি বসান এবং নির্মিত উদ্যানগুলিতে 'নাম ফলক' বসান দরকার।

আরো প্রস্তাব করি, পুরসভার সকল শিশু উদ্যানগুলির রক্ষণাবেক্ষণে ও তদারকির জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারকে সভাপতি কবে ও এলাকার অধিবাসীদেব নিয়ে উপদেষ্টা সমিতি গঠন কবা আবশ্যক। এই সমিতিব আরো কাজ হবে উদ্যানকে ঘিরে শিশু কিশোবদের খেলাধুলায় উৎসাহিত করা।

এককেন্দ্রিক ও বহু কেন্দ্রিক কোন্নগর ঃ সমস্যা ও সমাধান

১৯৪৫/৫০ সাল পর্যন্ত কোন্নগরের যে চেহাবা ছিল তাকে একমুখীন বা এক কেন্দ্রিক বলা চলে, বিশেষ করে তার সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত দিক বিবেচনা করলে। কারণ তখন যা কিছু মানবিক প্রয়াস ও কর্মধারা তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল—কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় (প্রাথমিক), সাধারণ গ্রন্থাগার, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক, পোষ্ট অফিস, ফাঁড়ি, কোন্নগর পুর সভা, এবং সাহিত্য সাধনার একমাত্র প্রতিষ্ঠান পাঠচক্র। আর ছিল গঙ্গার নিকটস্থ জি. টি. রোড ও কয়েকটি প্রধান প্রধান রাস্তা এবং তাকে ঘিরেই কয়েকটি পাড়া, যেমন—হাতীর কুল, বিশালক্ষ্মীসড়ক, মন্দিরা পাড়া,

দেব পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, মণি পাড়া আর ব্যবসার স্থান ছিল কোন্নগব বাজার। আর ছিল মন্দির মসজিস এবং মেলবার স্থানগুলি, যেমন দ্বাদশ মন্দির, রাজজেশ্বরীতলা, চড়কতলা, চণ্ডীতলা, টোল বাড়ির মাঠ প্রভৃতি।

তারপর কালের গতিতে এবং বিশেষ করে দেশ বিভক্ত হওয়ার ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে মানুষের দলে দলে আগমন এবং কিছু নোতুন কলকারখানা স্থাপন ইত্যাদি কারণে কোন্নগরের সর্বত্র জনবসতি গড়ে উঠাব ফলে— ধর্মডাঙা, কালীতলা, মাষ্টারপাড়া, অরবিন্দপল্লী প্রভৃতি গড়ে উঠল, এবং এরই সঙ্গে উদ্বাস্তু সহায়ক সমিতি এবং বাস্তুহারা পরিষদ গড়ে উঠল। আর তার ফলস্বরূপ কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ক্লাব গড়ে উঠল। এই যে বিস্তার ও বিকাশ তার কালপর্ব ধরা যায় ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত অবশ্য এই ধারা প্রবহমান। এই কাল পর্বে বহু নোতুন ধর্মীয়, শিক্ষা, খেলাধূলা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানেব উদ্ভব হযেছে।

এখন এই কেন্দ্রাতিগ (Centiifugal) প্রবণতা ও বৈচিত্র্য-এটা অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু এব সঙ্গে কেন্দ্রাভিগ (Centripetal) প্রবণতার একটা সমন্বয় দরকার। এই বিষয়টি নিয়ে কিছু মানুষ চিন্তাভাবনা করেছে কিছু, চিন্তাভাবনার ফলপ্রসূ হয়েছে এবং এর প্রধান উদ্যোক্তা কোন্নগর পুবসভা। একটা উদাহরণ—১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে কোন্নগর পুরসভা একটি প্রতিনিধিমূলক উৎসব কমিটি তৈরি করে। এই কমিটির পরিচালনায় তিন দিনেব এক ভাবগম্ভীর রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এছাড়া ১৯৮৬-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ২৫শে বৈশাখ দর্শনীয় শোভা করে যাত্রা ও পরে কবিতা আবৃত্তি সঙ্গীত প্রতিযোগিতা হোত এবং এই প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সংখ্যক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ও ক্লাবেব সভ্য-সভ্যারা অংশগ্রহণ করত। এছাড়া পুরসভার উদ্যোগে পুরসভার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে শোভাযাত্রা সহ নানা অনুষ্ঠান, সূর্যসেন শতবর্ষ পালন, নৃসিংহ দাস বসুর জন্ম শতবর্ষ পালন, ৭ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী '৯৫ হুগলী জেলা একাদশ গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠান প্রভৃতি। দ্বিতীয়ত; কোন্নগরের প্রয়াত স্মরণীয় ব্যক্তিত্বদের জীবনী ও কৃতকর্মের চর্চার মধ্য দিয়েও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একটা ভিত্তিভূমি গড়ে উঠার সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়। তৃতীয়ত, অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও নজরুল জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠানাদির

মাধ্যমে সমগ্র কোন্নগরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা গেছে। কারণ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও সমিতি এগুলির সংগঠক।

আজকের ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের কুপ্রভাব এবং মানুষের বিচ্ছিন্নতা বোধ, ভোগবাদ, (Consumerism) মূল্যবোধহীনতাকে প্রভৃতিকে প্রতিরোধ করার জন্য নিরন্তর এই রকম সমবেত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এর মধ্যে দিয়েই একটা সাংস্কৃতিক নবজাগরণের আবির্ভাব ঘটবে। এবং এই নবজাগরণের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার আর একটা উপায়ের কথা এখানে উল্লেখকরা যেতে পারে— মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব সহ ক্ষণজন্মা মানুষের জীবনী অভিনিবেশ সহ অধ্যয়ন ও চর্চা।

বর্তমানে কোন্নগর পুরসভার খেলার মাঠ ও পুষ্করিণীগুলির একটা তালিকা দেওয়া হল। এখানে একটা কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুর এলাকার মধ্যে খেলার মাঠ ও শিশু উদ্যান নির্মাণের জন্য সি, এম, ডি, এ-র পক্ষ থেকে ১৯৭০ সাল থেকেই অর্থ সাহায্য করে আসছে এবং ১৯৮১-৮২ সালে আর , আর ডিপার্টমেণ্ট কোন্নগর পুরসভাকে অরবিন্দ পল্লীতে অবস্থিত তার খেলার মাঠ, পুষ্করিণী প্রভৃতি পুরসভাকে প্রদান করেছে। সেই সময় থেকে মাঠগুলিতে যেমন খেলাধূলার সুযোগ হয়েছে তেমনি পুষ্করিণীগুলিতে মাছ চাষের মাধ্যকে অর্থাগম হয়ে আসছে। অন্যদিকে পুষ্করিণীতে সাঁতার চর্চারও সুযোগ হয়েছে।

কোন্নগর পুরসভার শিশু উদ্যান ও সরোবর সমূহ।।

১৯৭০ ঃ ১।। লেনিন উদ্যান ২।। মিত্র পার্ক ৩।। রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন (প্রাচীর বেষ্টনী)

১৯৭৫ ঃ ১।। সুরত শিশু উদ্যান—উদ্বোধন ২৮. ৬. ১৯৮১

সভাপতি ঃ ড. দর্শন চৌধুরী

প্রধান অতিথি ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়

উদ্বোধক ঃ নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায়

২।। একের পল্লী

৩।। সর্বমঙ্গলা

৪।। নাবায়ণ

৫।। সুকান্ত

৬।। অমৃত—উদ্বোধন ঃ ২২. ১. ১৯৭৭

সভাপতি ঃ অমব নাথ দাস

প্রধান অতিথি ঃ শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(৭) নজরুল কর্ণার

১৯৮৬-৮৭ ঃ ১।। শহীদ শিশু উদ্যান

২।। নেলসন ম্যাণ্ডেলা

৩।। ক্ষুদিবাম

৪।। দেব পাড়া (ডাঃ প্রশান্ত দেবেব বাড়ির উল্টোদিকে অসম্পূর্ণ

১৯৯৪ ঃ ১।। শিবচন্দ দেব উদ্যান (সাংসদ সুদর্শন রায় চৌধুরীর এলাকা উন্নয়ন অর্থে)

১৯৯৫-৯৬ ঃ ১।। সত্যজিৎ রায উদ্যান

২।। কিশলয় বিদ্যালযেব দক্ষিণে

৩।। ১৯নং ওয়ার্ডে

১৯৯৪ ঃ গ্রীণ পার্ক ('এল' পুকুরের দক্ষিণে। বেষ্টনী নির্মিত হয়নি)

মোট ১৬টি শিশু উদ্যান।

এছাড়া খেলার মাঠ রয়েছে ঃ

(১) মাষ্টার পাড়ায় ঃ সাংস্কৃতিক পরিষদ, মাষ্টার পাড়ার তত্ত্বাবধানে।

(২) কালীতলার নিকট ঃ অব্যবহৃত কবর স্থান, এখানে খেলার মাঠ রয়েছে।

বিশেষ উল্লেখ্য যে, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের আর আর বিভাগ ১৯৮২-৮৩ সালে পুরসভার হাতে কোতরং স্কিম নং II এর অন্তর্ভূক্ত যে পুষ্করিণী ও খেলার মাঠ প্রভৃতি প্রদান করে তার মধ্যে ১২টি পুষ্করিণী ও তিনটি খেলার মাঠ আছে।

পুরসভার পুষ্করিণীগুলির তালিকা ঃ

(১) বেড সানের নিকট

(২) প্রথম জল কলের পিছনে ২টি

(৩) শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রিটে ১টি (কোন্নগর সুইমিং ক্লাব)

মোট ৪টি

অরবিন্দ পল্লীতে আর, আর, ডিপার্টমেন্টে প্রদত্ত

১।। নিউ পার্ক

২।। 'এল' পুকুর

৩।। জোড়া পুকুর—২টা

৪।। ডাক্তার পুকুব

৫।। কাঁসারী পুকুর

৬।। দ্বাবিক জঙ্গলে (কদম পুকুব)

৭।। সুকান্ত সরোবর—২টা

৮।। সুভাষ সরোবব

৯।। দ্বাবিক জঙ্গলে (চক্রবর্তী বা প্রাণকৃষ্ণ)

১০।। সত্যজিত রায় সবণির পাশে

মোট ১২টি এবং সর্বমোট ১৬টি

কোতরং স্কিম নং II অধীনে আর, আর দপ্তর পুরসভাকে যে জমি, মাঠ, পুষ্করিণী প্রভৃতি প্রদান তার বিস্তৃত বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হল

(ক) গৃহ নির্মাণের জন্য জমি ৩ কাঠা ১২ ছটাক করে—৬৬৫টা প্লট

(খ) ৩ কাঠা করে —৪৮২টা প্লট

(গ) বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমি (বড় পুকুরের উল্টো দিকে)

(ঘ) জমি ও পার্কের জন্য—৫
(ঙ) ডাক ঘরের জন্য—১
(চ) খেলার মাঠ—১

মোট জমির পরিমাণ ২.১৫০ একর

(ছ) মন্দির—১

(জ) ছুট প্লট—২৮৪

(ঝ) পুষ্করিণী—১১

(ঞ) লেক—১

(ট) হেলথ সেণ্টার—১০.৪৫০ (একর)

সর্বমোট জমির পরিমাণ —আনুমানিক ১৪৫ একর.

পরিশিষ্ট ঃ

উপরে দেওয়া পুরসভার শিশু উদ্যানগুলি ছাড়া Town and Country Planning Act বাবদ প্রাপ্ত আরো বেশ কয়েকখণ্ড যে ভূমিস্বত্ব আছে সেগুলিতে সীমানা খুঁটি বসিয়ে খেলার মাঠ হিসাবে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক এবং অর্থের সংস্থান সাপেক্ষে নূতন নূতন শিশু উদ্যান স্থাপন করা। এ ছাড়া গঙ্গাতীরে বেঙ্গল ডিস্টিলারি কোম্পানী উদ্যান নির্মাণের জন্য যে জমি দান করেছে সেখানেও উদ্যান নির্মাণ করা দরকার।

আরো উল্লেখ্য, প্রথম পুর প্রধান নৃসিংহ দাস বসুর সময়ে যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে সেখানে খেলার মাঠের ব্যবস্থা করা যায়। জমির বিবরণ সি, এস প্লট নং ২৮৯, মৌজা খারদো বেহারা। পরিমান ০.৭০ একর, অর্থাৎ ২ বিঘা। অবস্থান শ্রীদুর্গা মিলের পশ্চিমে খালের ধারে।

সংকলক—বিষ্ণু দত্ত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনারস সমিতি
কোন্নগর পৌর শাখা

এমন দিন ছিল যখন সরকারী কর্মজীবীরা কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর বিশাল জনারণ্যে হারিয়ে গিয়ে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতেন এবং হতাশাজনিত কারণে অনেকেই অকালে প্রয়াত হতেন। আজকের দিনে বয়স্করা সমাজের বোঝা নয়, সম্পদ—এই নতুন ভাবনা-চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রাজ্ঞতাকে উন্নয়নমূলক কাজে লাগানো যায় কিনা বিবেচনা করা হচ্ছে।

শুরুটা হয়েছিল বিগত শতকের '৮৯ সালে। তখন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী সমিতি সমূহের সমন্বয় কমিটি—কো-অর্ডিনেশন কমিটির এক কনভেনসনে অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মীদের আশা-আকাঙ্খাকে ভাষা দেবার জন্য জন্ম নেয় 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনারস্ সমিতি'—যাঁরা অবসর প্রাপ্তদের তথাকথিত কর্মহীন জীবনে এই বার্তা পৌঁছে দেয় যে, সরকারী কর্ম থেকে অবসর নেওয়ার অর্থ কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি নয়, পরন্তু নতুন কর্মজীবনে উত্তরণ। ফলশ্রুতিতে সমিতির বেশ কিছু সদস্য সাংসদ, বিধায়ক, পৌরপিতা এবং পঞ্চায়েত সদস্য হয়ে সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করছেন। আজ বয়সে প্রবীণ কিন্তু মননে নবীন এই মানুষগুলি অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিবেশ-দূষণ রোধ, বৃক্ষ রোপণ, মরনোত্তর দেহ ও চক্ষুদান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সাক্ষরতা অভিযান, দুর্যোগ-দুর্বিপাকে ত্রাণ বন্টন এবং তাঁদের পুনর্বাসন ইত্যাদি কর্মযজ্ঞে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। অবসর প্রাপ্তদের এই সংগঠন মূলতঃ দুটি নীতি মেনে চলে ঃ (এক) অর্থনীতিক দাবী দাওয়া আদায় এবং (দুই) সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন।

পরম শ্লাঘার বিষয় যে, দ্বাদশ বর্ষীয় সমিতির সদস্য সংখ্যা ইতিমধ্যেই অর্ধ লক্ষাধিক অতিক্রান্ত (৫৩৮০০)। ব্যাপ্তি, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুন্দরবন এবং পুরুলিয়া থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত জেলা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত।

কেন্দ্রীয় দপ্তর যথারীতি মহানগর কলকাতায় অবস্থিত। তৃণমূল স্তর অর্থাৎ ইউনিট/পৌর/ব্লক স্তর থেকে মহকুমা, জেলা এবং রাজ্যস্তর পর্যন্ত নির্বাচিত কমিটির মাধ্যমে "ফেডারেটেড" পরিচালন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই সমিতির কর্মযজ্ঞ পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসর প্রাপ্ত সকল শ্রেণীর কর্মীই এ সমিতির সদস্যপদ গ্রহণ করতে পারেন। অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রয়াণে ফ্যামিলি-পেনসন প্রাপক এই সমিতির সদস্য হন।

এই সমিতির কোন্নগর শাখা ইউনিট কমিটি নামে মূল সমিতির সময় কালে প্রয়াত দেবব্রত দাসের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪/৯৫ সালে শাখার নামকরণ হয় পৌর কমিটি। এই শাখা শ্রীরামপুর মহকুমা কমিটির অন্তর্গত। বিগত শতক পর্যন্ত এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৭০। কর্মীদের অবসর গ্রহণের বয়োবৃদ্ধি (৫৮ থেকে ৬০) এই স্বল্পতার অন্যতম কারণ। আশা করা যায়, বর্তমান বর্ষশেষে এই সংখ্যা দ্বিশতাধিক ছাড়াবে।

পনেরো জন নির্বাচিত অফিস বেয়ারারের মাধ্যমে পৌর শাখার কাজ কর্ম পরিচালিত হয়। সভাপতি, সম্পাদক ও দপ্তর সম্পাদক এবং ১২ জন সদস্যসহ এই অফিস বেয়ারার কমিটি। প্রতিমাসে কমিটির নিয়মিত বৈঠক বসে, সাধারণতঃ মাসের তৃতীয় রোববারে। মাসিক অধিবেশন ছাড়া বছরে এক বা একাধিক বিশেষ সাধারণ সভাও করতে হয়। প্রতি দুবছর অন্তর অফিস বেয়ারা নির্বাচিত হয়। দ্বিবার্ষিক সময় ব্যবধানে মহকুমা, জেলা এবং রাজ্যস্তরে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে বিভিন্ন স্তরের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

পৌর শাখার নির্দিষ্ট কোনো অফিস ঘর নেই। আঞ্চলিক অফিস বেয়ারাদের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হয়। পৌর শাখার ইতিবৃত্ত মূল ইতিবৃত্ত।

মূল সংগঠন সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে পেনসনারদের বকেয়া আদায়ের ব্যাপারে সমিতির উদ্যম একবাক্যে প্রশংসনীয়। কলকাতার সদর দপ্তর থেকে 'প্রবীণ কণ্ঠ' নামে একটি ত্রৈমাসিক তথ্যবহুল পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং নামমাত্র বিনিময় মূল্যে বিতরিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে প্রাপ্ত কলকাতার উপকণ্ঠ বেহালার পর্ণশ্রীতে সাড়ে দশ কাঠা জমিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনসনারস্

সমিতি পবিচালিত একটি বৃদ্ধাবাস নির্মাণ কল্পে কোন্নগব পৌব শাখাব সদস্যবা এ যাবত বাইশ হাজাব টাকা প্রদান কবেছেন। আশা আছে, এ বাবদ এই এলাকা থেকে আবও অর্থ সংগৃহীত হবে। তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু ইতিমধ্যে এই বৃদ্ধাবাসেব ভিত্তি প্রস্তব স্থাপন কবেছেন। সাবা ভাবতে এই উদ্যম একান্ত ভাবে তুলনা বিহীন।

একটি কল্যাণকামী বাষ্ট্রেব কাছে দেশেব নাগবিকবৃন্দ এইমূল্যবোধই আশা কবে।

লেখক ঃ নৈমিষাবণ্য মুখোটী

তথ্য ঃ পৌব কমিটিব সভাপতি শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তী
ও বর্তমান মহকুমা সম্পাদক শ্রী ধ্রুবজ্যোতি দাস
প্রদত্ত তথ্য।

কোন্নগর সেন্ট্রাল ট্রেডার্স ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশন

(স্থাপিত ঃ১৯৯২)

সংস্থার কার্যালয় ঃ ১১৫বি/৪, ক্রাইপার রোড (ইন্দিরা গান্ধী রোড) কোন্নগর

এসোসিয়েশনের এলাকা, কোন্নগর-নবগ্রাম-কানাইপুর-কোতরং। এর ২৩টি ইউনিট আছে।

অঞ্চলের ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত কল্যাণ সাধন ও নানা সমস্যার সমাধানে এবং জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি এই সংস্থা আন্তরিক ভাবে গ্রহণ করেছে। সংস্থা খুবই সংগঠিত এবং প্রতি বছর সম্মেলনের মাধ্যমে সবায়ের সাথে মিলিত হয়। সংস্থার বর্তমান কর্মপরিষদ—

সভাপতি ঃ শ্রীসুবল চন্দ্র দাস

সম্পাদক ঃ শ্রীমধুসূদন বন্দ্যাপাধ্যায

কার্যকারী সম্পাদক ঃ শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায

তথ্য সূত্র ঃ শ্রীবেণীমাধব সেনগুপ্ত   লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সর্বভারতীয় চিকিৎসক সমিতি (আই, এম, এ)

(কোন্নগর শাখা)

সর্বভারতীয় চিকিৎসক সমিতি (আই, এম, এ) বিশ্বের এক সর্ববৃহৎ সংগঠন। সমিতির সারা ভারতে মোট সভ্য সংখ্যা এক লক্ষ ত্রিশ হাজার এবং ১৭০০টি শাখা আছে, তার মধ্যে কোন্নগর শাখা একটি। কোন্নগর শাখার জন্ম ১৯৬২ সালে। এবং এই শাখার প্রতিষ্ঠাতা সভ্যেরা হলেন ডাঃ পি, কে, রায়, ডাঃ কানাই লাল রায়, ডাঃ নীলমনি বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রয়াত), ডাঃ গোকুল দত্ত (প্রয়াত), ডাঃ অজিত কুমার দাস (প্রয়াত), ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মিত্র, ডাঃ কে, পি, ভট্টাচার্য, ডাঃ ডি, বি, চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ প্রশান্ত কুমার দেব এবং ডাঃ অমর নাথ হড়।

১৯৮৬ সালে সমিতি আয়োজিত কোন্নগর টাউন হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য উপলক্ষে এক সভায় স্থানীয় এবং কলকাতার বঙ্গীয় শাখার বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ স্বাস্থ্য সচেতনতার উপর বক্তব্য রাখেন, এরই মাধ্যমে কোন্নগর শাখার জন স্বাস্থ্য চেতনার কর্মকাণ্ডের শুরু হয়। এরপর থেকেই প্রতিবছর ৭ এপ্রিল সমিতি আয়োজিত নানা জন স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান সূচিব মাধ্যমে দিনটি পালিত হয়। ১৯৯০ সালে জনগণকে স্বাস্থ্যে সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করতে এক বিশাল পদযাত্রা কোন্নগর-নবগ্রাম পরিক্রমা করে। ১৯৯২ সালের ডিসেম্বর মাসে সমিতির ব্যবস্থ্যাপনায় মাদক দ্রব্য বিরোধী পদযাত্র অনুষ্ঠিত হয়।

এছাড়া মাতৃদুগ্ধ, ম্যালেরিয়া পরিবেশ দূষণ, পরিবার কল্যাণ, ক্যান্সার, এডস, যক্ষ্মা, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়বিটিস ইত্যাদি মানব জীবনের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উপর প্রতি বছরই গণ আলোচনা চক্রের আয়োজন হয়ে থাকে। ১৯৯৮এ কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে দুদিন ব্যাপী এক উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য মেলার মধ্যে এই শাখার ধারাবাহিক জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী পরিপূর্ণতা পেয়েছিল। অসংখ্য মানুষের দীর্ঘপদযাত্র, চিকিৎসক ও তাঁদের পুত্রের রক্তদান

'শিবির, স্বাস্থ্যমেলা এবং গ্রাম বাংলার প্রদর্শনী যথার্থ চিকিৎসক ও জনগণের মধ্যে এক মিলনসূত্র গ্রথিত করেছিল। রাজ্যশাখা ও সর্বভারতীয় বহু চিকিৎসক বক্তব্য রাখেন ও সেমিনারে যোগদান করেন।

১৯৯১র জানুয়ারী মাসে দরিদ্র রোগীদের সুচিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় ও ঔষুধ ব্যাঙ্কের শুভ সূচনা করে এই সমিতি। সমিতির এখন নিজস্ব ঘর না থাকায় সি, এস, মুখার্জী স্ট্রিটের (মাদ্রাজী লাইনে)জন কল্যাণ সমিতিতে এই কাজ অনুষ্ঠিত হোত।

১৯৯৪র জুন মাসে কোন্নগর পুর সভা প্রদত্ত জমিতে (দিঘির মোড়, ৬৯ কিউ, শ্রীঅরবিন্দ রোড) সমিতির নিজস্ব বাড়ি তৈরি হওয়ার পর এখন সমিতির সব কিছু কাজ এখানেই চালিত হয়। বর্তমানে সপ্তাহে সোম, বুধ ও শুক্রবার বিকেলে এই পরিষেবার কাজ সমিতির নিজস্ব ভবনে নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

১৯৯১ সালে স্থানীয় আর একটি সমাজ কল্যাণে ব্রতী সংস্থার সহযোগিতায় এক বৃহৎ হেপাটাইটিস-বি গণটিকাকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। দু'দিনে মোট ১৪০০ জনকে টিকা দেওয়া হয়।

সমিতির বর্তমান সম্পাদক ডাঃ অমর নাথ হড়-এর তথ্য সূত্রে জানা যে, জনগণের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানা কল্যাণমুখী পরিষেবা গ্রহণের কর্মসূচী এই সমিতি গ্রহণ করতে চলেছে।

সূত্র ঃ সমিতির প্রকাশিত স্মরণিকা

লেখক ঃ বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হয়।

এখানে একটা কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হয়, যে, শুরু থেকেই কোন্নগর পুরসভা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে, যেমন—

(১) বিভিন্ন স্থান থেকে বৃক্ষ চারা আনা

(২) বৃক্ষ চারাগুলি সারা বছর সংরক্ষিত করে রাখার জন্যে জল কলের ট্যাঙ্কের মধ্যে একটি ঘেরা তৈরি করে দেওয়া।

(৩) রাস্তার ধারে ও উদ্যান সমূহের মধ্যে ইঁটের ঘের তৈরি করে দেওয়া।

(৪) বিভিন্ন স্থানে চারা নিয়ে যাওয়ার জন্য ভ্যান সরবরাহ করা।

(৫) রোপণ অনুষ্ঠানে সপরিষদ উপস্থিত থাকা।

শুরু থেকে ১৯৯৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রায় ১৪ হাজার বৃক্ষ চারা রোপণ করা হয়েছে এবং চারাগুলি বেশির ভাগই বেশ বড় হয়ে উঠেছে।

১৯৯৯ সাল থেকে পুরসভা বাঁশের ব্যাকারী দিয়ে বেষ্টনী তৈরি করে নিজ উদ্যোগে চারা রোপণে উদ্যোগী হয়েছে। পুরসভার কাছ থেকে সমিতি কিছু চারা সংগ্রহ করেছিল, এবং বর্তমানে সমিতি নিজেই চারা সংগ্রহ করেছে, যেমন দু'হাজার সালে করেছিল।

তাই বর্তমানে বৃক্ষ তথা পরিবেশ সচেতনতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সারা পৃথিবী ব্যাপী এই সচেতনাকে আরো বেশি বৃদ্ধি করতে নানা দিবস পালিত হচ্ছে। যেমন—

১। ৩রা নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গে বন্য প্রাণী সপ্তাহ পালন। যার রণধ্বনি বাঘ বাঁচানো মানে জঙ্গল বাঁচানো, আর জঙ্গল যতদিন বাঁচবে মানুষও ততদিন বাঁচবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। জলাভূমি সংরক্ষণ ও জল সম্পদ রক্ষা।

৩। পশ্চিমবঙ্গে অরণ্য সপ্তাহ পালন।

এক এক বছরে এক এক রণধ্বনি—

যেমন, অরণ্যের সংরক্ষণ জীবনের স্পন্দন

অনটন অপনোদনে অরণ্য ইত্যাদি।

উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি

শ্রী অরবিন্দ রোড।। কোন্নগর

বিগত ৬.৬.১৯৮২ তারখে কোন্নগরের বৃক্ষপ্রেমীদের দক্ষিণপাড়ায় গোপীনন্দ জীউর মন্দির সংলগ্ন নাট মন্দিরে এক সভা হয়। প্রথমে সভার আহ্বায়ক শ্রী বিষ্ণু দত্ত উদ্বোধনী ভাষণে তিনি আগের দিন অর্থাৎ ৫ বছরের বিশ্বপরিবেশ দিবসের গুরুত্ব উল্লেখ করে এক লিখিত ভাষণ পাঠ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর কোন্নগর পুর সভার সভাপতি ও সহ সভাপতি যথাক্রমে বাসুদেব ইন্দ্র ও ভূপেন মজুমদারকে পৃষ্ঠপোষক রূপে মনোনীত ২১ জনের একটি সমিতি গঠিত হয় এবং সমিতির নামকরণ হয় উদ্ভিদরোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি। সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে বিষ্ণু দত্ত ও অনিল মিত্র। শহরেব বিভিন্ন অঞ্চল ও পেশায় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কার্যনির্বাহী সমিতিতে অন্তর্ভুক্ত হন। বৃক্ষরোপণেব গুরুত্ব সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা আনা এবং পুরসভা ও রাজ্য সরকারেব সহযোগিতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি রূপায়িত কবা এই সমিতিব প্রধান কর্তব্যরূপে স্থির হয়।

বছর বছর সমিতি পুরসভা, অন্যান্য বৃক্ষ প্রেমী সংস্থা, বিদ্যালয় সমূহ ও ব্যক্তির সহযোগিতায় বিস্তৃত কার্যসূচী অনুসারে তার কার্যধারা চালিয়ে আসছে। প্রতি বছর ১লা আষাঢ় বৃক্ষ বোপণ কর্মসূচীর শুভ সূচনা হয় এবং ৪।৫ টি অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয। এই অনুষ্ঠানগুলিকে সাধারণত পুরসভার পুর প্রধান ও উপ পুরপ্রধান ও অন্যান্য ব্যক্তিরা সমবেত হন। এইভাবে সারা কোন্নগরে সমিতি তার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হয়েছে।

সাধারণত "মরু বিজয়ের কেতন উড়াও শূণ্যে" এই রবীন্দ্র সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। সমিতি কোন্নগরের বাইরেও তার রোপণ কর্মসূচি পালন করে আসছে, এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সমিতি পূর্বে আশেপাশের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ছাত্রদের মধ্যে এক প্রতিযোগিতা আহ্বান করে— প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল —পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণের ভূমিকা। সফল

বস্তুতঃ বৃক্ষ সুরক্ষা হচ্ছে পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা (ecology trasphere) ভূমিক্ষয় রোধে বৃক্ষের ভূমিকা, ওজন স্তরে ছেদ, পর্বত চূড়ার ও মেরু অঞ্চলের বরফগলা প্রভৃতি শব্দগুলি মানুষের মনে অনুরণন তুলছে আর মানুষ উদ্বিগ্ন হচ্ছে সে সঙ্গে। এই প্রসঙ্গে আরো একটি তথ্য—শিল্প যুগের আরম্ভ থেকে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ২.৫ সেলসিয়াস।

এই প্রসঙ্গে একটা সংবাদের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার। ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রি-ও-ডি জেনিরোতে বসুন্ধরা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানে পৃথিবীর সমস্ত রাষ্ট্রপ্রধান, বিজ্ঞানী ও বেসরকারী স্বেচ্ছামূলক সংগঠন সমূহের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন এবং পরিবেশ সম্পর্কে একট ঘোষণা গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষিতে আমাদের সমিতিরও গুরুত্ব ও দায়িত্ব বেড়ে গেছে।

গত ৯ জুন ২০১০, অধ্যাপক সত্যেন সাহার বাড়িতে সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় অধ্যাপক সত্যেন সাহা সভাপতি, শ্রী বিষ্ণু দত্ত কার্যকরী সভাপতি ও শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক ও ২৬ জন সদস্য নিয়ে এক শক্তিশালী কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সেন্ট্রাল পল্লী উন্নয়ন পরিষদ

৪৯, অরবিন্দ পল্লী, কোন্নগর

১৯৭৫ সালের ২১মে পুরাতন ১৩নং ওয়ার্ডের বর্তমান ৭, ৮, ও ৯নং ওয়ার্ডের পল্লী উন্নয়ন সংগঠনগুলিকে একত্রিত করে এক সভা হয়। ওই সভাতে পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মসূচিকে বিশেষ করে পুরসভা সম্পর্কীয় কর্মসূচিকে রূপায়িত করার জন্য সেন্ট্রাল পল্লী উন্নয়ন পরিষদ গঠিত হয়। তদানীন্তন সি. এম. ডি. এ-র সভাপতি মাননীয় ভোলানাথ সেন-এর কাছে ডেপুটেশন দেয়া হয়।

সংস্থার বর্তমান সভাপতি শ্রী সুব্রত দে এবং সম্পাদক শ্রী প্রসূন বসু। সংস্থার কার্যসূচিতে আছে বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং সংস্কৃতির প্রসারের জন্য নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সুখের বিষয় সেন্ট্রাল পল্লী উন্নয়ন পরিষদ-এর নিজস্ব গৃহ আছে।

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ওয়েষ্ট বেঙ্গল মাস বেনিফিট সোসাইটি

অরবিন্দ পল্লী, কোন্নগর

১৯৮৬-তে অরবিন্দ পল্লী কোন্নগরে, বিবেকানন্দের পাঁচটি বাণীকে অবলম্বন করে এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়। সভাপতি—শ্রীপ্রাণগোপাল চক্রবর্তী ও যুগ্ম সম্পাদক শ্রী অভিজিৎ বিশ্বাস ও শ্রী পরিতোষ গুহ।

প্রতিষ্ঠানের কার্যসূচির মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্য পুস্তক প্রদান, বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী আলোচনা ও বাংলার প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরা, পৌষ পার্বণ উৎসব এই কর্মসূচির অন্যতম।

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য চেতনা
প্রযত্নে শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তীর বাড়ি
নিউ পার্ক। কোন্নগর

১৯৯০ সালের ৫ জুন প্রতিষ্ঠিত হয় পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য চেতনা। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শ্রী সুশীল চক্রবর্তী এবং প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা, তার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য বিধি সম্পর্কে জনগণকে সজাগ করা। নাটক, গান, আবৃত্তি প্রভৃতি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা। এই সংস্থার উদ্যোগে ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে বেঙ্গল ফাইনের কাছে শ্রী অরবিন্দ-র নামে একটি ছোট উদ্যান নির্মিত হয়েছে। মহিলা, পুরুষ ও শিশুদের নিয়ে মোট সভ্যসংখ্যা ৪৭ জন।

সংস্থার বর্তমান সভাপতি শ্রী প্রাণগোপাল চক্রবর্তী ও যুগ্ম সম্পাদক শ্রী পরিতোষ গুহ ও শ্রী সুশীল চক্রবর্তী।

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

কোন্নগরের মসজিদ

১।। করাতি পাড়ার মসজিদ

এই মসজিদটির স্থাপনা প্রায় ২০০ বছর আগে। যখন এই অঞ্চলে মুসলিম জনবসতির সূচনা হয় তখনই এই মসজিদের প্রতিষ্ঠা। মসজিদ পরিচালনা হয় জনসাধারণের চাঁদায় এবং বিবাহাদি উপলক্ষে প্রদত্ত বিশেষ চাঁদায়। পরিচালিত হয় পঞ্চায়েত কর্তৃক ৭-৮ জন সভ্যের দ্বারা গঠিত কর্মপরিষদ দ্বারা। রোজার সময় সন্ধ্যাকালে ১ ঘণ্টা ব্যাপী তারাবী প্রার্থনা হয়। এছাড়া ঈদ, বকবিদ, সবেবরাত, মহরম প্রভৃতির জন্য বিশেষ চাঁদা আদায় হয়।

কিছুদিন পর্বে উত্তরের গেটকে মিনারের আকার দিয়ে সুসজ্জিত ও মসজিদে রঙ করা হয়েছে। বর্তমানে বেশ কিছু অর্থ ব্যয় করে মসজিদের গর্ভগৃহের পূর্বদিকের ছাদটির সম্পূর্ণ সংস্কার ও তার বিস্তার ঘটনা হয়েছে। মসজিদে আর একখানি ঘর সংযুক্ত হওয়ার ফলে মসজিদটি নূতন আকারে দৃষ্টি নন্দন হয়েছে।

এখানে একজন মৌলবী আছেন। তিনি আজান ও অন্যান্য ধর্মীয় কাজ সম্পন্ন করেন। এঁর মাসিক বেতন ধার্য করা আছে এবং প্রতিদিন বিভিন্ন গৃহে এঁর আহারের ব্যবস্থা করা হয়।

২।। ডি ওয়াল্ডি সংলগ্ন মসজিদ

প্রতিষ্ঠা-আনুমানিক ১০০ বছর। প্রতিষ্ঠাতা—হাকিম আসাদুর রহমান। কারখানা হবার আগে কারখানার সীমানার মধ্যেই নামাজের জায়গা ছিল। সেখানে দিনে ২ বার নামাজ পড়া হ'ত। এটার নাম ছিল ইদগা। কারখানা হবার পর ঐ দরগা সরিয়ে আনা হয় বর্তমান স্থানে। কোম্পানীর মুসলমান শ্রমিকরা এখানে প্রার্থনা করেন। কোম্পানী মসজিদের আলো ও জল সরবরাহ করে থাকেন। মৌলবীর মাহিনা চাঁদা তুলে তার থেকে দেওয়া হয়। কাজী

ফজল ইলাহীদের দু'খানা ঘর ভাড়া বাবদ যে টাকা পাওয়া যায় তার থেকে মসজিদের অন্যান্য খরচ চলে।

৩।। কোন্নগর মসজিদ

মুখার্জী বাগান লেন

স্থাপনা—১৯৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দ

পুনঃ সংস্কার—১৯৫৫

প্রতিষ্ঠাতা —স্থানীয় মুসলমান সমাজ।

সূত্র ঃ আমাদের কোন্নগর লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

গোপীনাথ জীওর মন্দির

(এ, এল, ব্যানার্জী স্ট্রিট)

উক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন প্রয়াত রামদাস মিত্র ১০৫৫ বঙ্গাব্দে। এই মন্দিরের বিগ্রহ রাধাকৃষ্ণ। এই মন্দির দক্ষিণ পাড়া মিত্র পরিবারের প্রায় দশ বিঘা নিস্কর জমির মধ্যে অবস্থিত। এই মন্দির ভগ্নপ্রায় হওয়ায় এই বিগ্রহের একজন সেবায়েত প্রয়াত শৈলেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র ১৩৭৪ বঙ্গাব্দে সংস্কারে উদ্যোগী হন। এই মন্দিরে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বহুবার শুভাগমন করেছিলেন, একথা শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে উল্লেখ আছে। এই মন্দিরের বিগ্রহের এখনো দু'বেলা পূজা অর্চনা হয়ে থাকে এবং বছরে ৩/৪ বার উৎসব হয়। প্রায় প্রতি উৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সাধু সন্ন্যাসীদের আগমন হয় এবং সেবাযেত ও ভক্তদের উপস্থিতিতে তাঁরা ধর্মালোচনা করেন।

সূত্র ঃ অন্যতম সেবাযেত শ্রী অনিল কুমার মিত্র। লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরে বিভিন্ন দেব দেবী পূজার্চ্চনা

সার্বজনীন দুর্গাপূজা।।

কোন্নগরে সার্বজনীন দুর্গা পূজার প্রচলন হয় বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। তার পূর্বে জমিদার ও ধনীদের বাড়িতে জাঁক জমকের সাথে দুর্গাপূজা হোত। পাড়ার ও আশে পাশের বাড়ির মহিলা ও পুরুষেরা সেই সকল পূজায় তাদের নিজেদের পূজাজ্ঞানে অংশ নিয়ে পূজার আনন্দ উপভোগ করতেন। বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীরা পূজার ক'দিন এই সব বাড়িতে ঠাকুর দেখে বেড়াত। তারপর যখন জমিদার ও ধনীদের আর্থিক অসংগতির কারণে বাড়ির পূজা ধীরে ধীরে বন্ধ হতে থাকে তখন সার্বজনীন পূজা বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয়— সেটা চল্লিশের দশকের কথা। বর্তমানে একটা দুটো বাড়িতে মাত্র পূজা হয়ে থাকে।

বর্তমানে স্থায়ী পূজা মণ্ডপে যে সকল সার্বজনীন দুর্গাপূজা হয়ে থাকে তার কয়েকটির তালিকা নিচে দেওয়া হল ঃ

১।। হাতির কুল (বাবা ঠাকুর তলা)

২।। ছোট কালীতলা (সি, এস, মুখার্জী স্ট্রিট)

৩।। ১র পল্লী (সি, এস, মুখার্জী স্ট্রিট)

৪।। মধ্য পল্লী (রাজ রাজেশ্বরীতলা)

৫।। বারোয়ারী তলা (অতুল মিত্র লেন)

৬।। চড়কতলা (শ্রী অরবিন্দ রোড)

৭।। মাষ্টার পাড়া (নরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড)

৮।। নিউ পার্ক এসোসিয়েশন (অরবিন্দ পল্লী, উত্তরাঞ্চল)

৯।। অরবিন্দ পল্লী (মধ্যাঞ্চল)

১০।। এল পুকুরের উত্তরে

১১।। নূতন পাড়া (অরবিন্দ পল্লী)

১২।। রায় পাড়া (রায় পাড়া)

১৩।। সাধুর ঘাট (সাধুর ঘাট)

এছাড়া মণ্ডপ তৈরি কর আরো যে সমস্ত সার্বজনীন দুর্গা পূজা হয় তার সংখ্যা প্রায় ৪০-৭০, এই সংখ্যা এখন বৃদ্ধির পথে। অস্থায়ী মণ্ডপে যে সব পূজা হয়, তার মাত্র কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হোল—

১।। ৫-এর পল্লী সার্বজনীন
২।। দেব পাড়া ”
৩।। শক্তি সংঘ ”
৪।। ঐকতান ”
৫।। ৮-এর পল্লী ”
৬।। ছাত্র সমিতি ”
৭।। মিতালী সঙ্ঘ

এই তালিকা অসম্পূর্ণ।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সার্বজনীন কালীপূজা।

১।। হিংলাজ
২।। সম্মিলনী
৩।। সন্তান বাহিনী

তালিকা অসম্পূর্ণ।

এছাড়া কোন্নগরে বহুস্থানে ছোট ছোট নানা দেব দেবীর মন্দির আছে, সেখানে নিয়মিত বা পর্বের সময়ে পূজা অর্চনা হয়ে থাকে। এদের সংখ্যা প্রায় ৫০/৬০র মতো।

কোন্নগরে তিনটি মসজিদ আছে—

(ক) ডি, ওয়ালডি কারখানার ধারে
(খ) মুসলমান পাড়ায়
(গ) মুখার্জী বাগানে

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

শ্রীশ্রীঁরাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা ও মন্দির

কোন্নগরে শ্রীশ্রীঁরাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা সারা পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে অতি প্রাচীন পূজা রূপে স্বীকৃত। ২০০১ সালে (বাংলা ১৪০৭) এই পূজা ৩০১ তম বর্ষ অতিক্রম করেছে। দেবী শ্রীশ্রী ঁরাজরাজেশ্বরী মাতা তন্ত্রমতে ' মহামায়া ত্রিপুরা সুন্দরী। দেশ ও দশের কল্যাণার্থে এই পুণ্যভূমিতে নিজ কৃপায় আবির্ভূতা হন।

শ্রী পঞ্চমী তিথিতে দেবীর কাঠামো পূজা হয় ও দেবী মূর্তি নির্মাণের কাজ শুরু হয়। এবং মাঘী পূর্ণিমার পূণ্য তিথিতে মহাদেবী রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজার্চনা শুরু হয় এবং পরপর চারদিন দেবী আরাধনা হয়ে থাকে।

এই পূজা উপলক্ষে কোন্নগর তথা সারা পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ সমবেত হন। পূজা প্রাঙ্গণে নানা রকম মেলা বসে। স্থানীয় বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি একদিন ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করে। পূজা পরিচালনা করেন শ্রীশ্রী ঁরাজরাজেশ্বরী মাতার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দ এবং সহযোগিতা করেন সারা কোন্নগর তথা আশপাশ এলাকার সুধী ভক্তবৃন্দ।

কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যবৃন্দের সজাগ দৃষ্টি ও ভক্ত বৃন্দের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতায় মন্দিরের নিয়মিত সংস্কার ও নব নব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার ফলে এই মন্দির একটি দর্শনীয় স্থান রূপে খ্যাত হয়েছে।

মন্দিরের পূর্ব গায়ে ১৯২৮ সালে রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতল ভবন আছে এবং দ্বিতলে 'নগেন্দ্র নাথ মেমোরিয়াল হল' এবং একতলায় 'শিবচন্দ্র ব্লক' আছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

শ্রী অরবিন্দ ভবন

১৯৬৫ সালে শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি কোন্নগরে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৮৬ শ্রী অরবিন্দ রোড ও ঋষি বঙ্কিম স্ট্রীটের সংযোগ স্থলে শ্রী অরবিন্দের যে পৈত্রিক ভিটা ছিল সোসাইটির নিরলস চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই জমি অধিগ্রহণ করে। পরবর্তীকালে, পণ্ডিচেরীতে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সোসাইটির আর্থিক অনুদানের ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত অর্থ একত্রিত করে ১৯৯১ সালে ভবনের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপিত হয় এবং তারপর একটি বিস্তৃত ভবন নির্মিত হয়। এখানে সোসাইটির মসলা ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আলাদা স্থানে একখানি কক্ষ আছে।

ভবনে শ্রী অরবিন্দ ও মাদারের জন্মদিন পালিত হয়। তাছাড়া অন্য ধর্ম আলোচনামূলক সভা হয়। মূল ভবনের একটি কক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে সপ্তাহে শিশুদের অঙ্কন শিক্ষা দেয়া হয়।

কিছুদিন পূর্বে শ্রীঅরবিন্দের এক আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে শ্রী সুধীর বন্দ্যোপাধ্যার সভাপতি ও অধ্যাপক সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদক পদে আসীন আছে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরে অষ্টাদশভূজা দুর্গামূর্তির পূজা

কোন্নগর শম্ভুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ঘাটে শ্রীমৎ সূর্যনারায়ণ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত আনন্দ আশ্রমে এই অষ্টাদশভূজা দুর্গাদেবীর পূজা হয়ে থাকে। শোনা যায় শ্রীমৎ সূর্যনারায়ণ সরস্বতী ধ্যানযোগে এই দেবীমূর্তির দর্শন পান এবং তিনি নিজের আশ্রমে ওই মূর্তির পূজার প্রবর্তন করেন। এই অষ্টাদশ ভূজা দুর্গা মূর্তির পূজা সম্বন্ধে আমাদের শাস্ত্রে অনেক কিছু আলোচনা আছে। অষ্টাদশভূজা দেবীর পূজা কোন্নগরে অনেকদিনই প্রচলিত আছে এবং এক বিশিষ্টস্থান অধিকার করে আছে। ভক্তজনের যোগদানে ও উদ্যোগে এই পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

শকুন্তলা রক্ষাকালী মাতা বারোয়ারী

শকুন্তলা রক্ষাকালী মাতার প্রতিষ্ঠা নিয়ে অনেক প্রবাদ ও মতভেদ প্রচলিত আছে। তবে প্রয়াত ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পরিবারের এই বিষয়ে বিশেষ অবদান আছে তা অবশ্যই স্বীকার্য। প্রয়াত ইন্দ্রনাথ চক্রবতীর কাকা প্রয়াত দেবেন্দ্র নাথ চক্রবর্তীকে নাকি দেবী দর্শন দেন, পরে দেবী স্বপ্নেও তাঁকে দর্শন দিয়ে দেবী প্রতিষ্ঠার কথা জানান। তখন বারোয়ারী ছিল না। প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর জীবিত কাল পর্যন্ত শকুন্তলা রক্ষাকালী মাতার পূজক ছিলেন। একথা একখানি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ ছিল। বর্তমানে সেই প্রস্তর ফলক আর দেখা যায় না।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে বর্তমান স্থানে শকুন্তলা কালীমাতার প্রথম পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে ''শকুন্তলা শ্রীশ্রীরক্ষাকালী মাতা বারোয়ারী'' নামে প্রতিষ্ঠানটি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। একটা সংবিধান ও ট্রাষ্ট বোর্ডও আছে। এই পূজা যখন প্রবর্তিত হয় তখন এই স্থান জনবসতিহীন ছিল। বর্তমানে এই পূজা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। মহাপূজার দিন দূর দূরান্ত থেকে বহু লোকের সমাগম হয়। অনেক মেলাও বসে। সূর্যাস্তে দেবীকে মন্দিরে আনা হয় এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে দেবী নিরঞ্জন হয়। বৈশাখ মাসের অন্ধকার পক্ষে শনিবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সকল মানুষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এবং বলি বিরোধী প্রতিবাদ সত্ত্বেও বলি প্রথা প্রচলিত আছে।

মন্দিরের দৃষ্টি নন্দন সুউচ্চ চুড়া ও সামনের প্রশস্ত নাট মন্দির সহজেই দূর হতে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দির ও নাটমন্দিরের সংস্কার ও নির্মাণ কার্য চলেছে বহুদিন ধরে।

পূজার উদ্বৃত্ত অর্থ ও ভক্তদের প্রণামী থেকে সঞ্চিত অর্থ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক সহায়তায় অনেক জনহিতকর বিভাগ চালু হয়েছে। যথা— প্রাথমিক বিদ্যালয়, চক্ষু চিকিৎসা, হোমিওপ্যাথিক ও অ্যালোপাথিক চিকিৎসা,

হৃদ রোগ ও দন্ত চিকিৎসা সমূহ—এর জন্য আলাদা ভবন আছে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এতে উপকৃত হয়।

কিছুদিন পূর্বে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ১৫/১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক উচ্চাকাঙ্খী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে—এর মধ্যে আছে সেবা ভবন ও চিকিৎসার নোতুন বিভাগ।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর রাজরাজেশ্বরী মঠ

(শঙ্করাচার্যের মঠ)

কোন্নগর জি. টি. রোডের পশ্চিম দিকে দ্বাদশ মন্দিরের কাছে ভগৎপরিবার প্রদত্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে এই মঠটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৯৮৪ সালে। এখানে প্রতিষ্ঠিতা আছেন দেবী রাজরাজেশ্বরী। প্রতিষ্ঠার সময় এক সপ্তাহ ব্যাপী মহা আড়ম্বরে পূজার্চনা চলে। জ্যোতীষ্পীঠ ও সারদা পীঠের অধীশ্বর স্বামী স্বরূপানন্দজী মহারাজ এই মঠের উদ্বোধন করেন।

সুউচ্চ চূড়াযুক্ত এই মঠ অতি দৃষ্টিনন্দন। অনেক দূর থেকে মন্দিরের চূড়া দেখা যায়। এই নির্মাণে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। কলকাতাস্থ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সমাজ ও ধনী ব্যক্তিরা মঠ প্রতিষ্ঠায় অর্থ দান করেন।

বিশেষ বিশেষ দিনে ভক্তগণ সমবেত হয়। এখানে নব রাত্রি উৎসব, বৎসরে রাজরাজেশ্বরী মায়ের পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন বিগ্রহের পূজা হয়। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে ৫-১৫ পর্যন্ত মঙ্গলারতি হয়।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা

(স্থাপিত ঃ ১২৭৬ বঙ্গাব্দে)

১৩২ বছরের পুরোনো ও ঐতিহ্যমণ্ডিত এই হরিসভা। এই হরিসভায় কোন এক সময়ে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব পদার্পণ করেছিলেন। ভক্তগণ সাধাবণতঃ প্রতি শনি ও রবিবার এবং ছুটির দিনে সন্ধ্যায় সমবেত হয়ে হরি সংকীর্তন করত। প্রধানতঃ ঘোষালদের নেতৃত্বে সংকীর্তন হোত।

এখন যেখানে হরিসভার মন্দির, প্রথমে সেখানে এক চালাঘরে বিগ্রহ স্থাপিত ছিল। পরে জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থে পাকা মন্দির গৃহ নির্মিত হয় ও তৎসংলগ্ন রান্না ঘর।

সাধারণতঃ দোল, জন্মাষ্টমী ও রাসপূর্ণিমার দিন উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমানে প্রতিদিন সন্ধ্যায় বহু ভক্তজন সমাবেশে হবি সংকীর্তন হয়। এই হরিসভা পরিচালনার জন্য এক কর্মপরিষদ আছে।

সাহিত্য ও ধর্মের বিশিষ্ট বক্তারা হরিসভায় অনেক শ্রোতার উপস্থিতিতে ধর্ম আলোচনা করেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

রামমন্দির

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাম মোহন প্লেস, রাজেন্দ্র নগর-রে রামমন্দির রাজেন্দ্র নগর আবাসন সমিতির চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রতিষ্ঠাতাগণ—প্রয়াত রবীন্দ্র নাথ দত্ত গুপ্ত

” রমেশ চন্দ্র চন্দ

” রোহিনী কুমার দে

শ্রী রমেন্দ্র মোহন সেন

” রাধাগোবিন্দ ভূঁইয়া

বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখে জনসাধারণের আর্থিক সহায়তায় একটি নাট মন্দির নির্মাণ সমাপ্তির পথে। এখানে প্রভাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় নাম কীর্তন ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও আলোচনা হয়ে থাকে। বহু মানুষ এখানে সমবেত হন।

সংকলক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর রবীন্দ্র চর্চার পরম্পরার ইতিবৃত্ত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের যে বহুমুখী সৃষ্টি তা সংক্ষেপে বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বাংলার কবি, ভারতের কবি, আবার বিশ্বের কবি। এই তিনটি রূপ প্রকাশিত তাঁর রচিত সমস্ত কবিতা ও সঙ্গীতে—যেমন "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি", আবার "নমো নমো সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি", তা থেকে 'জনগণ মন অধিনায়ক জয় হে, আবার "হে বিশ্বদেব, মোরে তুমি দেখা দিলে কী বেশে। দেখিনু তোমাকে পূর্ব গগণে, দেখিনু তোমাকে স্বদেশে— আর, হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে", এর পর তাঁর ইতিহাস—শিক্ষা—বিজ্ঞান বিষয়ক ও বিচিত্রধর্মী নানা রচনা এবং বহুধা বিস্তৃত কর্মকাণ্ডের কথা ভাবলে বিস্ময়ে. মন ভরে য়ায়।

রবীন্দ্রনাথের রচনা ও গানের চর্চা ঠিক কবে থেকে কোন্নগরে শুরু হয়েছে সে বিষয়ে বলা বা লেখা খুবই কঠিন।

কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম দশম শ্রেণীর ছাত্ররা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ১৯৩৪/৩৫ সাল থেকে 'শিবাজি উৎসব', 'অহল্যার প্রতি', 'দুই বিঘা জমি', 'শরৎ', '১৪০০সাল', 'হে ভারত আজি নবীন বর্ষে শুন কবির গান"— এই পংক্তি দিয়ে যে কবিতার শুরু এবং 'গুপ্তধন' ছোটগল্প প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই হিসাবে শিক্ষক মহাশয়েরা এইগুলি ব্যাখ্যা করতেন ও ছাত্ররা তা অনুশীলন করত। আর বিদ্যালগুলির বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে ঐ কবিতাগুলি আবৃত্তি হত।

পাঠচক্র ঃ কোন্নগর পাঠচক্রের বিশের দশকের শেষ থেকে ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু হোত এই সমস্ত সঙ্গীত দিয়ে—'হে বীর পূর্ণ কর, অয়ি ভুবন মনোমোহিনী। আবৃত্তি হোত 'আজি হতে শতবর্ষ পরে—। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা আলোচনা ও বিদগ্ধ জনের ভাষণ হোত। যে সমস্ত মনীষী এই অনুষ্ঠানগুলিতে এসেছিলেন তাঁদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ

করছি।—চারণ কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ নাথ বিশী, নীহার রঞ্জন রায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৭১) প্রমুখ। সভার স্থানগুলি ছিল ব্রাহ্ম সমাজ হল, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কক্ষ প্রভৃতি।

শক্তিসঙ্ঘ ঃ ১৯৩৪/৩৫ সালে শক্তিসঙ্ঘের উদ্যোগে চিত্র-প্রবন্ধ-আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হোত। আবৃত্তির বিষয় ছিল—এবার ফিরাও মোরে ও 'মুক্তি' কবিতা। সরস্বতী পূজার অনুষ্ঠানে 'ডাকঘর' নাটক অভিনয় হয় এবং বাৎসরিক উৎসবে রবীন্দ্র নাটক 'শারদোৎসব' মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্র জয়ন্তী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র নৃত্য সঙ্গীত প্রভৃতি পরিবেশিত হয়।

কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষ পালন ঃ ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র নাথের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে সারা পৃথিবী ও ভারতবর্ষে জন্মশতবর্ষ পালনের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়। কোন্নগরেও উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালিত হয়। কবির জন্মদিনে ২৫শে বৈশাখ এই প্রথম এক সুসজ্জিত শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। এবং পুর প্রধান শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়কে সভাপতি করে এক শক্তিশালী উৎসব পরিচালন সমিতি গঠিত হয়, এছাড়া এক অভ্যর্থনা সমিতিও গঠন করা হয় যার সভাপতি হন শ্রীরামপুর মহকুমা শাসক। যুগ্ম সম্পাদক হন শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৯৬১ সালের ৯-১১ ডিসেম্বর এই তিনদিন কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে শতবর্ষের উৎসব পালিত হয়। বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিগণ যথা সাহিত্যিক অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ড. কালিদাস নাগ, ড.জগদীশ ভট্টাচার্য প্রমুখ উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে আসেন, অনুষ্ঠাগুলিতে দেবব্রত বিশ্বাস, শ্যামল মুখোপাধ্যায়, পূরবী দত্ত রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সত্যজিৎ রায়-এর ''রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'' চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। দুখানি নাটক 'নৌকাডুবি ও 'গোরা' মঞ্চস্থ হয়, যথাক্রমে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবেদিতা দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা অভিনেতা অভিনেতৃগণ অংশ নেন। সঙ্গে তাপস সেনের আলোক সম্পাৎ। প্রবেশমূল্য বাবদ মোট ২৪৭৯ টাকা আয় হয়।

এর কিছুদিন পরে ৩৯০নং ক্রইপার রোডে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের যে নিজস্ব ১ বিঘা ১ ছটাক জমি ছিল সেখানে রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের কথাবার্তা শুরু হয় ইউনিয়নের তদানীন্তন অন্যতম অছি সত্যহরি রায় মিত্র ও পুরসভার মধ্যে।

অবশেষে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের অছি ত্রয় সত্যহরি রায় মিত্র, বিশ্বনাথ মিত্রও প্রভাত কুমার রায় মিত্র ৩.৫.১৯৬৬ তারিখে এক রেজিষ্ট্রিকৃত দলিলের মাধ্যমে শর্ত সাপেক্ষে ঐ জমিতে রবীন্দ্র মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের জন্য দান করেন। মঞ্চের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয় ২৫শে বৈশাখ ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে (ইং ৯.৫.১৯৬৬)। স্থাপনা অনুষ্ঠানের সভাপতি হন লব্ধপ্রতিষ্ঠ এ্যাড ভোকেট সুধীর কুমার বসু। তখন পুর প্রধান ছিলেন শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়। এই বৎসরের শেষে মঞ্চের উদ্বোধন হয়। আনুমানিক নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় ১১৫৫১ টাকা ৬৬ পয়সা, এর মধ্যে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষের অনুষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত ২৪৭৯ টাকা, এ. ডব্লিউ. বি হেওয়ার্ড-এর নিকট থেকে ৪৫০০ টাকা, বাঙ্গুর কোম্পানী ২৫০ টাকা এবং বাকী পুর তহবিল থেকে ব্যয় হয়।

এরপর বর্তমান কলোপযোগী আচ্ছাদিত মঞ্চ নির্মাণের এক পরিকল্পনা হয়। আনুমানিক ৪৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুদৃশ্য রবীন্দ্র ভবন কোন্নগরে নির্মিত হল। এর মধ্যে পুরসভার সংরক্ষিত তহবিল থেকে ২০ লক্ষ ব্যয় হয়, বাকি টাকা দেয় রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে ফ্রেণ্ডস ড্রামাটিক ইউনিয়নের প্রদত্ত জমির দক্ষিণে 'মণি বাটীর' কাছ থেকে ১ বিঘা সাড়ে ছ'কাঠা পরিমান জমি পুরসভার পক্ষ থেকে স্বল্প মূল্যে কেনা হয় পুর প্রধান বিষ্ণু দত্তের সময়ে। এই জমির সংলগ্ন এক কাঠা পরিমান জমি প্রয়াতা সত্যবতী চক্রবর্তী পুরসভাকে দান করেন। তাই মোট দু'বিঘা সাড়ে সাত কাঠা জমির উপর এই রবীন্দ্র ভবন একটি দর্শনীয় রবীন্দ্র চর্চা তথা সংস্কৃতি কেন্দ্র রূপে নগরের মধ্যস্থলে আবির্ভূত হল ১৯৯৫ সালের ১৯মে তারিখে। এর আসন সংখ্যা ১২০০। মাননীয় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও অসীম দাশগুপ্ত মন্ত্রীমহোদয়ের উপস্থিতিতে এবং কোন্নগরের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির যোগদানের মাধ্যমে রবীন্দ্রভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন পুরপ্রধান শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ভাবে কোন্নগরের সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের অনেকদিনের আশা পূর্ণ হল।

এর পূর্বে ৪.৪. ১৯৮১ সালে পুর প্রধান বিষ্ণু দত্ত -এর উদ্যোগে ইউনিয়নের জমিদানের শর্ত পূরণ করার জন্য প্রায় ১৭০০ টাকা ব্যয়ে নির্মিত একটি মহলা কক্ষের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতি ও দারোদঘাটক রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে নটশ্রী বিপিন মুখোপাপাধ্যায় ও দেবব্রত শূর চৌধুরী। এই হল রবীন্দ্র

মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চ থেকে রবীন্দ্রভবনের রূপান্তরের সুদীর্ঘ ইতিহাস।

কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ ঃ এর পর থেকে উল্লেখ করতে হয় কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের। বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবন দর্শন ও সাহিত্য কৃতি তথা বঙ্গ সংস্কৃতির নানা দিক সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ১৯৮৪ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম। জন্মলগ্ন থেকেই এই সংস্থা রবীন্দ্র দর্শনের বিভিন্ন দিক নিয়ে নিয়মিত চর্চা করে আসছে। ১৯৯৪ সালের সভ্য সমর্থকদের এক বিশেষ সম্মেলন থেকে সমিতিকে নূতন করে সংগঠিত করে প্রতিনিধি মূলক এক কার্য নির্বাহী সমিতি গঠন করা হয় এবং এক ইস্তেহার (Manifesto) গ্রহণ করা হয়। জন্মকাল থেকেই পরিষদ ২৫শে বৈশাখে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠান নিয়মিত ভাবে করে আসছে। ইতিমধ্যে ১৯৮৬-১৯৯৪ সাল পর্যন্ত কোন্নগর পুরসভার উদ্যোগে যখন ২৫শে বৈশাখ শোভাযাত্রা ও পরে রবীন্দ্র কবিতা, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতিযোগিতা সংগঠিত হোত তখন পরিষদ পুরসভার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করত। পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন ঃ ১৯৮৬ সালে ১২৫ তম রবীন্দ্র জয়ন্তীতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ এতাবৎ প্রচলিত যুব উৎসবকে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে রূপান্তরিত করে এবং রাজ্যব্যাপী ত্রিস্তর প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কোন্নগর পুরসভা এতে সাড়া দিয়ে ২৫শে বৈশাখ প্রাতঃকালে সঙ্গীত আবৃত্তি সহযোগে এক দীর্ঘ সুসজ্জিত শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। এরপর সরকারী কর্মসূচির সূত্র ধরে জুন/জুলাই মাসে রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত প্রভৃতি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কর্মসূচিকে সফল করার জন্য পুরসভার সদস্য ও রবীন্দ্র অনুরাগী ব্যক্তিদের নিয়ে এক শক্তিশালী শাখা সমিতি গঠন করা হয়।

এই বছরেই প্রথম কলকাতা থেকে বিশ্বভারতী পর্যন্ত পদযাত্রার আয়োজন হয়। যে পথ দিয়ে এই পদযাত্রা যায় সেই পথে অবস্থিত পুরসভাগুলি তাদের সংবর্ধনা জানায়। পুরসভা কর্তৃক এই ভাবে ১৯৮৬ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ওবিভিন্ন ক্লাবের সভ্য/সভ্যাদের মধ্যে রবীন্দ্র চর্চা প্রসারিত করে বিপুলভাবে।

১৯৯৫ সাল থেকে পুরসভার উদ্যোগে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন বন্ধ হলে

কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও ক্লাবগুলির অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ২৫শে বৈশাখের প্রাতঃকালে রবীন্দ্র-প্রণাম উৎসব পালন করে আসছে। সুখের কথা ১০বছর ধরে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালন করে পুরসভা যে পরিবেশ সৃষ্টি করে গেছে সেই পথ ধরে আজো কোন্নগরে বিভিন্ন সংস্থাগুলি নিজ নিজ উদ্যোগে ২৫শে বৈশাখের অনেক অনুষ্ঠান এমনকি রবীন্দ্র-কবিতা আবৃত্তি, রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র-নৃত্য প্রতিযোগিতা আয়োজন করে থাকে।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা প্রযোজন। আমাদের দেশে বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তা গড়ে উঠেছে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দ-ডেভিড হেয়ার-আশুতোষ প্রমুখ দেশ বিদেশের মণীষীদের চিন্তাধারা অবলম্বন করে এবং দেশ-বিদেশের নূতন নূতন অগ্রগামী শিক্ষা-চিন্তাকে প্রতিফলিত ও আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আত্মীকরণ করে এবং যা বহুধর্ম-ভাষা-অঞ্চল-জাতি সমন্বিত ভারবর্ষের মত দেশের পক্ষে উপযুক্ত এবং কালোত্তীর্ণ। এই অবস্থায় এই শিক্ষা ব্যবস্থাকে পশ্চাদগামী ও ফেলে আসা যুগে নিয়ে যাওয়ার যে অপচেষ্টা শুরু হয়েছে তাকে প্রতিহত করার উপায় তা রবীন্দ্র নাথের সৃষ্টির মধ্যে নিহিত আছে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত নিবন্ধ আছে সেগুলি বিশেষ ভাবে সহায়ক হবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'ভারততীর্থ' কবিতার কথা এসে পড়ে, যার শেষ স্তবকের আরম্ভ এই ভাবে—"এসো হে আর্য, এসো অনার্য/হিন্দু মুসলমান।/এসো এসে আজ তুমি ইংরাজ/এসো এসো খৃষ্টান।" এবং তাঁর সঙ্গীত যার সম্বন্ধে কেদিন তিনি টমসনকে বলেন—"আমি জানি, আমার সঙ্গীতে নতুন বহু জিনিস ঢুকিয়েছি। পাঁচশ কিংবা তারও বেশী সুর আমি সৃষ্টি করেছি।.... প্রায়ই আমার মনে হয় যদি আমার সমস্ত কবিতাও লোকে ভুলে যায়, অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে এ দেশের লোকের মনে আমার গানগুলে। এবং তাদের আসন নির্দিষ্ট আছে।.... তবু আমার রচনাবলীর একাংশ ধীরে ধীরে যখন বিস্মৃতির গর্ভে লুপ্ত হয়ে যাবে, সেদিনের জন্য রেখে যাব, আমার গানের এই উত্তরাধিকার।.... " (পৃষ্ঠা ১৭১—বিদেশের চোখে রবীন্দ্রনাথ—সংকলন ও অনুবাদ—পৃথীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরে রবীন্দ্র চর্চার পরম্পরার ইতিবৃত্ত

(পরিশিষ্ট)

- আনুমানিক ১৯৬০/৬২ সালে কোন্নগর বাঞ্ছারাম মিত্র লেনে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়-এর বাড়িতে সঙ্গীত শিক্ষক বলদেব মুখোপাধ্যায়-এর পরিচালনায়২০ জন ছাত্রী নিয়ে এক সঙ্গীত শিক্ষা কেন্দ্র চালু ছিল প্রায় ১২/১৩ বছর। এরা বাৎসরিক অনুষ্ঠানও করত।
- কোন্নগরের বিভিন্ন সঙ্গীত নৃত্য আবৃত্তি শিক্ষার স্কুল যথা— অদ্বয়, কোন্নগর স্কুল অব রেসিটেশন, সুরবানী সুর বিথী, বসন্ত বাহার, বোধন, শ্বেত করবী, সুর পঞ্চম প্রভৃতিতে অন্যান্য কবিদের রচনা ছাড়াও রবীন্দ্র কবিতার আবৃত্তি ও রবীন্দ্র নৃত্য ও সঙ্গীত নিয়মিত শিক্ষা দেওযা হয।
- এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক উৎসবে বিশেষ করে রবীন্দ্র জয়ন্তীতে এবং তাদের দ্বারা সংগঠিত নানা প্রতিযোগিতাতে রবীন্দ্র কবিতা, নৃত্য ও সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- একটি সংস্থা পরপর তিন বছর রবীন্দ্র ভবনের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে রবীন্দ্র নৃত্য সঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠান করল।

রবীন্দ্র প্রবর্তিত কয়েকটি অনুষ্ঠান (যা ধর্মাশ্রয়ী নয়)

Gathe did not like to be Concerned with God, the word made him uncomfortable,he felt at home only inhuman matters and this humanuity, this emanwpation of art from the fetter of religion is previcvry whit coastitues Gathe's greatness—Engles.

তাই রবীন্দ্রনাথের গান যেমন তেমনি তাঁর সৃষ্টির আর একটি বৈশিষ্ট্যের

কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। সেটা হচ্ছে, শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির বিশেষ করে সেই সঙ্গীতগুলি ও নৃত্যনাট্য প্রভৃতি যা মানবতাবাদীকলাকে ঈশ্বর, দেবদেবী এবং ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে আপন স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় স্থাপনা করে।

এরই প্রেক্ষিতে উদাহরণ স্বরূপ তাঁর দ্বারা প্রবর্তিত ঋতু উৎসবগুলি—হল কর্ষণ উৎসব, বনমহোৎসব, নববর্ষ উৎসব প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। এই উৎসব গুলিতে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ যোগদান করে অপূর্ব আনন্দের আস্বাদ লাভ করতে পারে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরে নাট্য উৎসব

১৯৫৭-৫৮ সালে উৎপল দত্তের বিখ্যাত লিটল থিয়েটার গ্রুপ কর্তৃক 'অলীক বাবু' নাটক মঞ্চস্থ হয় ললিত মোহন বসু স্ট্রীটে শ্রী শিব শঙ্কর গাঙ্গুলীর বাড়ির পাশে খালি জমিতে। দর্শকগণ এই প্রথম নোতুন ধারার নাটক দেখে মুগ্ধ হয়।

এরপর ভারতীয় গণনাট্য সঙেঘর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য প্রদর্শিত হয়, ঐ স্থানেই 'স্বাধীনতা পত্রিকার, উৎসব উপলক্ষে ১২-৪-১৯৫৭ তারিখে। উৎসব কমিটির সভাপতি হয়েছিলেন তারকদাস চট্টোপাধ্যায় এবং যুগ্ম সম্পাদক রূপে ছিলেন—অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুধাংশ ভট্টাচার্য।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মনোরঞ্জন হাজরা (বিধায়ক)

গণনাট্য সঙ্ঘের দ্বিতীয় পরিবেশনা রবীন্দ্রনাথের "চণ্ডালিকা" নৃত্য নাট্য। ২০. ১১.১৯৬০ তারিখে অলিম্পিক ইনস্টিটিউটের মাঠে অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব কমিটির সভাপতি ছিলেন তারক দাস চট্টোপাধ্যায় এবং যুগ্ম সম্পাদক বলাই বন্ধু বসু ও সুধাংশু ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (বিধায়ক)।

সূত্র ঃ পুরাতন কাগজপত্র　　　　প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষে নানা আলোচনা ও সঙ্গীতানুষ্ঠান

উপরোক্ত কর্মসূচিকে সফল করার জন্য কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে কোন্নগরের বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে "স্বাধীনার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন সমিতি, গঠিত হয়।

উদযাপন সমিতির আহ্বানে প্রথম অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ১ অক্টোবর ১৯৯৭ সাল। স্থান—নূতন পাড়া উন্নয়ন সমিতির পূজা মণ্ডপ।

সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সত্যেন সাহা। প্রধান আলোচক—অধ্যাপক রথিন চক্রবতী। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র।

দু'জন স্বাধীনতা সংগ্রামী শ্রীসুবোধ কুমার মজুমদার ও শ্রীআশুরঞ্জন দে-কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এরপর দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সহযোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। বিভিন্ন শিল্পী নজরুল গীতি, রবীন্দ্র সংগীত, কবিতা আবৃত্তি ও বেহালা বাদন পরিবেশন করেন।

দ্বিতীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় মাষ্টার পাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদের নরেন্দ্র মণ্ডপে। উদ্বোধনী সংগীতের পর শ্রীসঞ্জীব সেন মহাশয় 'রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা'র বিষয় বক্তব্য রাখেন। ভাষণের পর বিভিন্ন শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন।

২০.৬.৯৮ তারিখে নগেন্দ্রনাথ মেমোরিয়াল হলে তৃতীয় অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী সঞ্জীব সেন। শ্রীমতী ঝর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতের পর প্রধান বক্তা অধ্যাপক সত্যন সাহা ভারতের স্বাধীনতার ৫০ বছরে ভারতবাসীর আর্থ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে কিলাভ হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং আত্মানুসন্ধানের উপর বিশেষ জোর দেন।

কবি শঙ্খ ঘোষের দুটি কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীশঙ্কর গাঙ্গুলী। শ্রীমতী বর্ণালী মুখোপাধ্যায়েব নজরুলগীতি পরিবেশনের পর শ্রীসঞ্জীব সেন সংকলিত "মানুষের রবীন্দ্রনাথ" গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণী চক্রবর্তী, সীমা গাঙ্গুলী ও অর্পিতা দে। ভাষ্যপাঠ ও আবৃত্তিতে ছিলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈমিষারণ্য মুখোটী, ইয়াকুব আলী, সুপর্ণা চক্রবর্তী, ভাস্বতী চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

কোন্নগর পুরসভা স্থাপনার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে
বিজ্ঞান দিবস

সাল : ১৯৯৪

স্থান : কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় সম্মুস্থ প্রাঙ্গণ

সভার সঞ্চালক : শ্রী প্রদীপ রায়

ইণ্ডিয়ান স্টাটিস্টিকাল ইনস্টিটিউট-এর ডাইরেক্টর অধ্যাপক বি. এল. এস প্রকাশ রাও-এর ভাষণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হল—

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার অনুসরণই হচ্ছে অর্থনীতি ও সমাজ উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। **** নোবেল পুরস্কার বিজয়ী প্রফেসর বি. চন্দ্রশেখর ইউ. কে থেকে প্রকাশিত 'Nature' পত্রিকায় তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতার মূল বিষয় :

(১) প্রকৃতির স্বরূপ যা কিনা কোন কোন ক্ষেত্রে দুর্জ্ঞেয় (incomprehensible)

(২) লক্ষ সমূহ অর্জনের জন্য মানুষ বিজ্ঞানের অনুসরণ করে।

(৩) অনুসরণই মানুষের পরিতৃপ্তির উৎস।

প্রতিবেদক : বিষ্ণু দত্ত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ ১৩৯৩ (ইং ৭মে ১৯৮৬) ঐদিন কবির জন্মস্থান থেকে কর্মস্থান এক দীর্ঘ পদযাত্রা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত হয়। সেই পদযাত্রাকে কোন্নগর পুর সভার সম্মুখে জি. টি রোডের ধারে পুর প্রধান শ্রীবাসুদেব ইন্দ্র সংবর্ধনা জানান।

পুরসভাও ঐদিন রাস্তায় রাস্তায় ঐ উপলক্ষে আবৃত্তি সঙ্গীত সহযোগে ছাত্র-যুবকদের এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে।

প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর পুরসভা কর্তৃক দক্ষিণ ও উত্তর ভিয়েৎনামের ইউনিয়ন ফেডারেশনের প্রতিনিধিদের নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন

দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রতিনিধিগণ Sri Ngnyen Phue এবং Sri Ngnyn Hoag এবং উত্তর ভিয়েতনামের প্রতিনিধিগণ Sri Doan Vancu এবং Sri Nguyen Vanhung.

স্থান ঃ এন. ডি. বসু মেমোরিয়াল হল (টাউন হল)

তারিখ ঃ ৭. ২. ১৯৭৩

সভার আহ্বায়ক ঃ পুর প্রধান

প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

মহানায়ক মাষ্টারদা সূর্যসেনের স্মৃতিতে নিবেদিত
ছাত্র-যুব উৎসব

এই উপলক্ষে ১৯৯৪ সালে কোন্নগর পুর সভা কর্তৃক সাংস্কৃতিব প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় ভবনে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল আবৃত্তি, স্বরচিত ছোটগল্প ও কবিতা পাঠ, বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, সম্মেলক সঙ্গীত প্রভৃতি। এই উৎসব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত।

প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

একাদশ হুগলী জেলা গ্রন্থমেলা
(১৯৯৪-৯৫)

কোন্নগর পুর সভার সুবর্ণ জয়ন্তীর সমাপ্তি লগ্নে এই গ্রন্থমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

তারিখ : ৭-১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫

স্থান : কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ

সৌজন্যে : কোন্নগর পুরসভা

পরিচালনা : স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, হুগলী

সহযোগিতা : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিম বঙ্গ সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি।

গ্রন্থমেলা উপলক্ষে এক অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, যার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হন যথাক্রমে পুর প্রধান শ্রীসমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীরথিন চক্রবর্তী।

মেলা উদ্বোধন হয় ৭.২.১৯৯৫ তারিখে। সভাপতিত্ব করেন জেলা শাসক শ্রী অমরেন্দ্র কুমার সিং ও উদ্বোধন করেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহিত ভট্টাচার্য।

৮ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী সাক্ষরতা, গ্রন্থাগার, জাতীয় সংহতি, সূর্য সেন, উনবিংশ শতাব্দী ও শিবচন্দ্র দেব, সাংস্কৃতিক ও শিল্পায়ন দিবস রূপে চিহ্নিত হয়। প্রতিদিন পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপরোক্ত বিষয়গুলির উপর ভাষণ দেন।

প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, নাট্যানুষ্ঠান, গীতি আলেখ্য, কবিতা পাঠ, বিতর্ক, রবীন্দ্র সংগীত ও অন্যান্য সংগীত পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক মঞ্চের দায়িত্বে ছিলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঞ্জীব সেন।

অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গ্রন্থ মেলা কমিটি গঠিত হয়। বিভিন্ন কাজের জন্য শাখা সমিতি সমূহ গঠিত হয়।

এই মেলায় ৭১টি বইয়ের স্টল হয়েছিল।

প্রতিবেদক—বিষ্ণু দত্ত

নজরুল ইসলাম স্মরণ সভা

স্থান ঃ কোন্নগর টাউন হল

তারিখ ঃ ১২/৯/১৯৭৬

আহ্বায়ক ঃ পুরপ্রধান বিষ্ণু দত্ত

বিদ্রোহী কবি নজরুলের প্রয়াণে এই স্মরণ সভা আহ্বান করা হয় সভায় বক্তব্য রাখেন ড. দর্শন চৌধুরী ও আরো অনেকে জনাকীর্ণ সভায় নগরবাসীরা কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

প্রতিবেদক ঃ বিষ্ণু দত্ত

মানবেন্দ্র রায় জন্ম শতবর্ষে সেমিনার

স্থান ঃ কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ভবন

তারিখ ঃ ১২ ও ১৩ মার্চ ১৯৮৮

আহ্বায়কগণ ঃ

শ্রীদেবব্রত সুর চৌধুরী ঃ সভাপতি অভ্যর্থনা সমিতি

শ্রীশিশির দে ঃ সম্পাদক ,,

শ্রীস্বরাজ সেনগুপ্ত ঃ সম্পাদক ,,

এছাড়া আবো ১৯ জন ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য হিসাবে।

প্রথম দিন বিপ্লবীর কর্মজীবন নিয়ে আলোক চিত্র প্রদর্শনী ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান সূচি।

মানবেন্দ্রের জীবন ও কর্মের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন

অধ্যাপক গৌতম নিয়োগী

অধ্যাপিকা কল্যাণী কার্লেকার ও

অধ্যাপক অম্লান দত্ত

সভাপতি—ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দিনে (১৩.৩.৮৮) সমবায় অর্থনীতি ও রচনাশৈলী ও দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদের বৈজ্ঞানিক বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন—

ড. বরুণ চক্রবর্তী

অধ্যাপক শিবনারায়ণ রায়

সভাপতি—অধ্যাপক সত্যেন সাহা

প্রতিবেদক—বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল

কোন্নগর বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের অনুমোদিত একটি শাখা কেন্দ্র। স্থানীয় এই কেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৭৫-এর একেবারে গোড়ায় এবং এর কার্যালয় ৭৩নং ক্রাইপার রোডে অবস্থিত। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ক্রমবর্ধমান দেড় শতাধিক শাখা কেন্দ্রের মাধ্যমে আজ প্রায় ৩৩ বছর ধরে মহামণ্ডল কাজ ক'রে চলেছে। মহাণ্ডল সম্পূর্ণভাবে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে চরিত্র গঠনমুখী লোক হিতৈষী সংস্থা। মানুষই হল আসল। তাই মানুষ তৈরীর কাজটি হল আসল কাজ। মানুষ গড়ার সঙ্কল্পে দেশের তরুণ ও যুবকদের উদ্বুদ্ধ করাই মহামণ্ডলের লক্ষ্য। মহামণ্ডলের কাজের মধ্য দিয়ে এই প্রচেষ্টা চলছে এবং এই প্রচেষ্টার নিশ্চিত ফলও ফলেছে। মূলতঃ মহামণ্ডল একটি মানুষ হওয়ার আন্দোলন। এই শাখাকেন্দ্রগুলিতে মহামণ্ডলের কর্মধারা অনুযায়ী জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, যুব মানসের নৈতিক ভিত্তি এবং মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তার জন্য বহু রকমের সেবা মূলক কাছের ব্যবস্থাও আছে। যেমন—ছাত্র সহায়ক কেন্দ্র, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র, শিশু বিভাগ (বিবেক বাহিনী), বয়স্ক শিক্ষণ কেন্দ্র, পাঠাগার, পাঠচক্র, আলোচনা সভা, স্বাস্থ্য চর্চা ইত্যাদি। এই উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন সময়ে আঞ্চলিক ও সর্বভারতীয় যুব প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা করা হয়। মহামণ্ডল একটি দ্বিভাষিক (ইংরাজী ও বাংলা) মাসিক মুখপত্র 'বিবেক জীবন'—এই আদর্শ ও সংস্থার সংবাদাদি প্রচারের জন্যে প্রকাশ করে থাকে।

সম্প্রতি ৭৭/এইচ, ক্রাইপার রোডে অখিল ভারত বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের অসম্পূর্ণ ভবনের একতলাটি নির্মিত হওয়ায় সেখানে নানাবিধ সভা, সাংগঠনিক কাজ ও অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে। কোন্নগর মহামণ্ডলের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৪৫ জন। প্রসঙ্গতঃ এই শাখা কেন্দ্রের দুজন অনুপ্রাণিত সদস্য রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসী রূপে যোগদান করেছে।

লেখক ঃ দেবকুমার মুখোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রম সিনেমা

নটশ্রী বিপিন মুখোপাধ্যায় যখন নাট্যজীবনে কৃতিত্বের শীর্ষে সেই সময়ে অভিনয় করার সময়ে মাইল্ড হার্ট স্ট্রোক হয়। সেই কারণে অভিনয় জীবন থেকে অবসর নিয়ে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন এবং কোন্নগর স্টেশনেব কাছে ১.১.১৯৬৩ তারিখে 'চলচ্চিত্রম সিনেমা হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন স্বউপার্জিত অর্থে। সেই সময়ে এখানে ভাল ভাল ছবি দেখে কোন্নগরের মানুষ খুবই খুশি হয়।

কয়েক বছর 'চলচ্চিত্রম'কে ভালভাবে পরিচালনা করার পর শারীরিক কারণে ১৯৮০-তে এই সিনেমা হল তিনি হস্তান্তর করেন কৃষ্ণলাল জয়শোয়ালকে। বর্তমানে জয়শোয়ালের প্রয়াণে তাঁর স্ত্রী সুজাতা এক্সিবিটার নামে চলচ্চিত্রম পরিচালনা করছেন। বর্তমানে দূরদর্শনের জনপ্রিয়তার ফলে সিনেমা হাউসগুলিতে দর্শকের সংখ্যা কমে গেছে। তবে হাউস চলছে কম দর্শক নিয়ে এবং মাঝে মাঝে ভাল বাংলা ছবিও দেখান হয়। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে দর্শকের সংখ্যা বাড়বে এবং আরো বেশি সংখ্যক বাংলা ছবিও প্রদর্শিত হবে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সূত্র ঃ হাউসের ম্যানেজারের সাথে কথোপকথন।

নজরুল জন্মশতবর্ষ উদযাপন সমিতি, কোন্নগর

কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ-এর উদ্যোগে কোন্নগরের বিভিন্ন এলাকার কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাব্রতী, নাট্যব্যক্তিত্ব, শিল্পী ও একাধিক সংস্থার সভ্যদের নিয়ে গঠিত হয় নজরুল জন্মশত বর্ষ উদ্‌যাপন কর্মসমিতি। কর্মসমিতির প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক সত্যেন সাহা, সভাপতি সঞ্জীব সেন, যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দত্ত ও বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কোষাধ্যক্ষ শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া আরো ২৫ জন সভ্য ও ৩টি সংস্থার প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয় শক্তিশালী কর্মসমিতি।

কর্মসমিতি একাধিক অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং এরই প্রেক্ষিতে প্রথম অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ৮ আগষ্ট '৯৮ শনিবার, রামেন্দ্র পাঠ ভবন কক্ষে। কুমারী নীলা বণিকের উদ্বোধনী সংগীতে এই দিনের অনুষ্ঠান শুরু হয়। সভাপতি সঞ্জীব সেনের আনুষ্ঠানিক ভাষণের পর যুগ্ম সম্পাদক বিষ্ণু দত্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। এদিনের মুখ্য আলোচক কবি জিয়াদ আলী নজরুল-জীবনের নানা দিক নিয়ে মনোজ্ঞ ভাষণে সভাস্থ সকলকে মুগ্ধ করেন। নজরুল গীতি পরিবেশন করেন দীপান্বিতা গাঙ্গুলী, সুতপা দাস, পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যাশ্রী মুখোপাধ্যায়, প্রাভদা ও অনামিকা গোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ। আবৃত্তিতে ছিলেন শ্বেতকরবী ও রঞ্জিতা ঘোষ।

সমিতির দ্বিতীয় অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৩ জুলাই '৯৯ শনিবার, স্থানীয় নগেন্দ্র নাথ মেমোরিয়াল হলে। সভাপতি সঞ্জীব সেনের আনুষ্ঠানিক ভাষণের পর এদিনের সভার মুখ্য আলোচক অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায় নজরুল বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য রাখেন। সংগীত পরিবেশনে ছিলেন নীলা বণিক, আবিরা গুহ, সুস্মিতা সেনগুপ্ত, সুজিত তরফদার, সন্ধ্যাশ্রী মুখোপাধ্যায়। আবৃত্তিতে ভাস্বতী চক্রবর্তী, শঙ্কর গাঙ্গুলী। এদিনের সভায় বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সূর্যকে পেলাম খুঁজে'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন অধ্যাপক স্বপন চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান দুটির সঞ্চালক ছিলেন বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

কোন্নগরের ইতিহাসে নজরুল সম্পর্কে এমন পরিচ্ছন্ন সর্বাঙ্গ সুন্দর অনুষ্ঠান অবশ্যই প্রশংসার যোগ্য।

লেখক : বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুচ্ছেদ—৬

(ক) প্রাচীন বাড়ি ঃ

(খ) প্রাচীন দেবালয় ঃ

(গ) এলাকার প্রাচীন বাড়ি, ছবি, দেবালয় ও গঙ্গার ঘাট ঃ

বেলতলা বাড়ি

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের পৈত্রিক বাড়ি ছিল সম্ভবতঃ রাজহাট নামক স্থানের আশে পাশে প্রসাদ পুর গ্রামে। তাঁর পিতামহ কালিদাস মুখোপাধ্যায় অকালে প্রয়াত হলে তাঁর মাতামহী পঞ্চাননী দেবী তাঁর ভাইয়ের আহ্বানে দুই নাবালক ছেলে ঠাকুরদাস ও হরপ্রসাদকে নিয়ে কোন্নগরে পিতৃগৃহে চলে আসেন। সেই সময়ে কোন্নগর দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলে কথিত ছিল, এজন্য কোন্নগরে বহু সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের আগমন হত। চন্দ্রশেখরের পিতা ঠাকুরদাস ন্যায়রত্ন। মামা ও মাতামহরা পণ্ডিতি ও যজমানী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মামা অপুত্রক হওয়ায় মামার সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন পঞ্চাননী দেবী। পঞ্চাননী দেবী প্রয়াত হলে তাঁর দুই ছেলে ঠাকুরদাস ও হরপ্রসাদ সম্পত্তির অধিকারী হন।

ঠাকুরদাসের চার ছেলে—শ্যামাচরণ, দীনবন্ধু, চন্দ্রশেখর ও পূর্ণচন্দ্র। এঁদের মধ্যে চন্দ্রশেখর ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন। তিনি সরকারী শুল্ক বিভাগের মুৎসুদ্দির কাজ করতেন। এই কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে নিজস্ব কিছু অর্থ লগ্নি করে বর্মা ও জাপানের ব্যবসাদারদের সঙ্গে কাঠ ও তিসির ব্যবসার কাজ করতেন। এই বাবদ কিছু অর্থ সঞ্চয় হয়। তারপর তিনি জমিদারী খাজনা সূর্যাস্তের মধ্যে জমা দেবার যে পদ্ধতি ছিল তার সুযোগ নিয়ে নিলামে খুলনা জেলায় অবস্থিত সুন্দর বনের কাছে খড়িয়া ও পাইকনাছা অঞ্চলের জমিদারী কেনেন ও সুনামের সঙ্গে তা পরিচালনা করেন। তিনি পিতার মামার চালাঘরের জায়গায় পাকা ইঁটের প্রশস্ত অট্টালিকা তৈরি করে আত্মীয়স্বজন সহ সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। এই হোল চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়-এর সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী। 'চন্দ্র শেখর মুখার্জী স্ট্রিট' এঁর নামে কোন্নগরে একটি রাস্তা আছে।

স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে চন্দ্র শেখর মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত বাড়ির নাম 'বেলতলা বাড়ি' হোল কেন? ঐ বাড়িতে বসবাসকারীরা এ বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু বলতে পারেন না। তবে তাঁরা অনুমান করেন যে, কোন্নগরের অন্যত্র

বকুলতলা, সাতবকুলতলা, আমতলা প্রভৃতি যেমন নামকরণ চলিত আছে, তেমনি অনুমান হয় যে, এখানে অনেক বেলগাছ থাকার জন্য এই বাড়িকে 'বেলতলা বাড়ি' বলা হয়।

এই বাড়িতে এককালে মহা সমারোহে দুর্গোৎসব হোত। যাত্রা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ছিল। তারই ফলে এ বাড়ির অনেক মেয়ের সঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠিত ঘরের ছেলের বিবাহ হয়েছে। যেমন চন্দ্রশেখরের এক মেয়ের সঙ্গে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলের বিয়ে হল ইত্যাদি।

বর্তমানে শরিকরা সম্মিলিত ভাবে প্রায় আট/দশ বছর ধরে দুর্গোৎসব করে আসছেন এবং দুর্গা মণ্ডপটির কিছু সংস্কারও হয়েছে।

এই বাড়ির উল্লেখযোগ্য পুরুষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল ঃ

(ক) রাধিকা চরণ মুখোপাধ্যায় একজন খ্যাতিমান অভিনেতা ছিলেন। তখনকার দিনে যাত্রা-গানের খুব চল ছিল, তাই তিনি নিজ ব্যয়ে একটি যাত্রার দল গঠন করেন। তাঁর এই দলকে লোকে 'রাধিকা চরণের দল' বলত। গঙ্গার দুই পাড়ে ও কলকাতা অঞ্চলে তাঁর খুব প্রসিদ্ধ ছিল।

(খ) অবনী মোহন মুখোপাধ্যায়—রাধিকাচরণের তৃতীয় পুত্র। ইনি কোন্নগর নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কর্ম পরিষদে ছিলেন। এছাড়া ১৯৪০-৪৪ সাল পর্যন্ত কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। ১-৪-৩৬ থেকে ৩.৩.৩৭ এবং ১.৪.৩১ থেকে ৩১.৪.৩২ যথাক্রমে কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের সহ-সম্পাদক ও সম্পাদক ছিলেন।

(গ) পূর্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চন্দ্র শেখরের ছোট ভাই। এক সময়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। পি,সি, মুখার্জী স্ট্রিট নামে এঁর নামে একটি রাস্তা আছে। এঁর পুত্র বধুর নামে একটি রাস্তা আছে, নাম—প্রসাদময়ী দেবী লেন।

(ঘ) জ্যোর্তিময় মুখোপাধ্যায়— চন্দ্রশেখরের বড় দাদা, ও শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র ছিলেন। এঁর পিতার নাম মতিলাল মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৬ সালে ইনি রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৪-১৯৫৮ পর্যন্ত কোন্নগর পুর সভার সদস্য ছিলেন। ১.৪.২৮ থেকে ৩১.৭.২৯ কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের সম্পাদক এবং ১.৪.২৭-থেকে ৩১.৩.৩১ পর্যন্ত ডাইরেক্টর ছিলেন।

সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

দেব ভিলা (জি, টি, রোড)

অন্নদা ভবনের ড. যতীন্দ্র নাথ বসুর স্ত্রী অন্নদাময়ী বসুর ভায়েরা হচ্ছেন রামধন দেব ও রামদুলাল দেব।

১।। **রামধন দেব**—ইনি ১৮৮৮ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এক সময় কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভ্য হিসাবে শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা দান করেন। ছেলে নির্মল দেব পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগে উচ্চপদে চাকরী করতেন। ইনি জি, টি, রোডের পূর্ব দিকে 'উদয়াচল' ভবনটি নির্মাণ করেন। ইনি সাহিত্য চর্চায় ব্রতী ছিলেন। তাঁর রচিত কয়েকখানি পুস্তকের মধ্যে 'ঝড়ের ফুল' উপন্যাসখানি বিশেষভাবে প্রশংসা অর্জন করে। ইনি কোন্নগর পাঠচক্রের সাথে যুক্ত ছিলেন।

২।। **রামদুলাল দেব**—১৮৯১ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রথম হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি জেলা জজ হিসাবে বিভিন্ন জেলায় চাকরী করেন। এঁরা জি, টি, রোডের পূর্বে গঙ্গার ধারে বৃহৎ অট্টলিকা নির্মাণ করেছিলেন। পুত্র মলয় দেব চাটার্ড একাউণ্টটেণ্ট ছিলেন। এঁর কলকাতায় অডিট অফিস ছিল। ইনি ১৯৪০-৪৪ এবং ১৯৪৪-৪৮ হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির সহ-সভাপতি এবং ১৯৩৬-৪০ সম্পাদক পদে ছিলেন। ১৯৩৬-৩৯ সাল পর্যন্ত রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার সদস্য ছিলেন। কোন্নগর মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে এবং হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে অর্থ প্রদান করেছিলেন।

এঁদের বাড়িটি পরবর্তী কালে প্রয়াত রতনলাল পচিসিয়া ক্রয় করেন।

সূত্র ঃ নরেন্দ্র নাথ বসুর পুত্র
শ্রী নিশীথ বসুর সাথে আলোচনা

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

দেবেদের বাড়ি

এস, সি, দেব লেন অর্থাৎ শ্যামাচরণ দেব লেন। শ্যামাচরণ দেব, দেব বাড়ির একজন পূর্ব পুরুষ।

এই পরিবারের এক পূর্বপুরুষ প্রায় ১৭৫ বছর আগে ব্যারাকপুরের কাছে গ্রামের থেকে কোন্নগরে এসে বসবাস শুরু করেন। এই পরিবার ও শিবচন্দ্র দেবের পরিবার একই পরিবারের দুই শাখা। এবং 'দেবভিলা' ও 'উদয়াচলের' দেবেরা একই বংশের।

দেবপাড়ার এই দেব বাড়িতে অনেক গুণী ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯৩৫ সালে এই বংশের ললিত মোহন দেবের স্মরণে কোন্নগর গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগের উদ্বোধন হয়। এই বাড়ির ডাঃ শরৎ কুমার দেব ১৯০০ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি শুধু যে একজন হৃদয়বান ডাক্তার ছিলেন তাই নয়, তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে দু'দফায় এবং কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের ১৯২৭-৩৬ সাল পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন। এই পরিবারের প্রফুল্ল কুমার দেব কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্কের পরিচালনায় দীর্ঘদিন জড়িত ছিলেন। তাঁর ভাই অতুল্য দেব ১৯৪৫ সালে কোন্নগর পুরসভার পুরসদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন। এই বাড়ির ছেলেরা সুশীল দেব ও সুনীল দেব খেলাধূলায় পারদর্শী ছিলেন। ডাঃ প্রশান্ত কুমার দেব নানা জন কল্যাণমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর মধ্যম ভাই প্রণব কুমার দেব কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার ও শ্রীরামপুর কলেজের গ্রন্থাগারিক ছিলেন এবং সেই পদে থাকাকালীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে জড়িত থাকতেন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

গৌর ধাম ঃ শিবচন্দ্র দেবের বাড়ি

(৭, শিবচন্দ্র দেব স্ট্রীট))

শিবচন্দ্র দেবের পিতা নিধিরাম দেবের ৪/৫ বিঘা জমি শিবচন্দ্র দেবকে দেন। এই জমিতে দীর্ঘ ৪ বছর ধরে বাড়ির নির্মাণ কাজ চলে। ১৮৫০ সালে তিনি গৃহ প্রবেশ করেন।

১৮৬৩ সালে শিবচন্দ্র নিজ বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহায়তায় ব্রাহ্ম সমাজের শাখা প্রতিষ্ঠা করেন এবং উপাসনাদি হোত। পরে শিবচন্দ্র দেব জমি দান করলে সেই জমিতে মন্দির নির্মিত হয় ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (১৮০২ শকাব্দে)। এই নির্মাণকার্যে দেবেন্দ্র নাথ যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য করেন। দেবেন্দ্র নাথ প্রায়ই সামাজের কাজে কোন্নগরে আসতেন, বালক ববীন্দ্রনাথও পিতাব সঙ্গে আসতেন।

১৯২১ সালে শিবচন্দ্র দেবের বাড়ি বিক্রি করেন তাঁর ছেলে সত্যপ্রিয় দেব, বিক্রি করেন শরৎ চন্দ্র বসুকে, কন্যা লীলাবতীকে। তিনি ছিলেন ঘোষপাড়া (বর্তমানে ঋষি বঙ্কিম স্ট্রীট) নিবাসী যোগেন্দ্র নাথ ঘোষের কন্যা। সত্যপ্রিয় দেবের স্ত্রী শরৎকুমারী দেব (১৮৬১-১৯৪১) "আমার সংসারে" পুস্তকের লেখিকা। সত্যপ্রিয়ের পুত্র ছিলেন শান্তিপ্রিয় দেব আর দুই কন্যা অমলা ও নির্মলা। অমলার পুত্র উমেশ দত্ত ব্রাহ্মনেতা ছিলেন। এঁর নাতি শিবচন্দ্র দেবের স্ত্রীর ছবি পরবর্তী কালে দান করেন। আর নির্মলা মিত্রের পুত্র ডাঃ দেব প্রসাদ মিত্র ব্রাহ্ম সমাজের এবং কংগ্রেসেরও নেতা ছিলেন।

শিবচন্দ্র দেবের ভাইপো গিরিশ চন্দ্র দেব এম. এ এবং হেয়ার স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৮৫৪-৯১ এই দীর্ঘ ৩৭ বছর কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। তিনি শিবচন্দ্রের যোগ্য সহযোগী ছিলেন। তাঁর আরো যাঁরা অনুরাগী/সহকর্মী ছিলেন দয়াল শিরোমণি, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (উত্তর পাড়া) প্রমুখ।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বসু সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক। শরৎচন্দ্র বসু নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া কলাপের সাথে যুক্ত ছিলেন। 'গৌর ধাম' তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামে কোন্নগরের এই বাড়িতে নানা গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মিলন স্থান ছিল। ইনি ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাবের সাথেও যুক্ত ছিলেন। 'গৌর ধামে' প্রতিষ্ঠিত 'হলিডে ক্লাবে'র বিবরণ অন্য জায়গায় দেওয়া হয়েছে।

তিনি চন্দননগরের গোঁন্দল পাড়ার বসু পরিবারের বংশধর। পিতামহ রামচন্দ্র বসু, প্রপিতামহ গোলক চন্দ্র বসু চন্দননগর থেকে উত্তর ভারতে চাকরী সূত্রে গমন করেন। শরৎ চন্দ্র প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ মিলিটারী হাসপাতালে চাকরী করতেন। এবং কাজের সূত্রে মেসোপোটেমিয়ায় গমন করেন। ১৯৩১ সাল পর্যন্ত চাকরীতে বহাল ছিলেন। যুদ্ধের সময় গ্যালিপলিতে বুলেটের আঘাত পেয়ে চাকরী থেকে অবসর নেন এবং ১৯৩১ সালে কোন্নগরে ফিরে আসেন। শরৎ চন্দ্রের জন্ম আগ্রায় এবং কৈশোর কাটে লখনৌ।

শিবচন্দ্র দেবের নানা কর্মকাণ্ডের কথায আসা যাক। স্ত্রী শিক্ষাদানের নানা রূপ নিষেধ থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর স্ত্রীকে বাড়িতে লেখা পড়া শেখান। বাড়িতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। পরে নিজের দান করা জমিতে গৃহ নির্মাণ করলে সেখানে বিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয়। তাঁর বাড়িতে বিশিষ্ট ইংরেজ শিক্ষাবিদ মেরী কারপেণ্টার আসেন এবং তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করেন ও স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করেন। এই বাড়িতেই প্রথমে গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়, পরে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়র ঘরে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯২৮ সালে গ্রন্থাগারের নিজস্ব ভবন নির্মাণ হলে গ্রন্থাগার সেখানেই স্থানান্তরিত হয়।

এখন শরৎচন্দ্র বসু এবং গৌরধাম সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। শরৎচন্দ্র বসুর আমলে এই বাড়িতে সঙ্গীত চর্চা, সামাজিক মেলামেশা প্রভৃতিতে মুখরিত থাকত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সমর বিভাগ কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বাড়ি দখল করলে বিদ্যালয় এই বাড়িতে স্থানান্তরিত হয়। এক সময়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক প্রয়াত রমণীকান্ত চক্রবর্তী এই বাড়ির দক্ষিণের অংশে ভাড়া থাকতেন। সেই সময়ে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য এখানে কিছুদিন ছিলেন। দক্ষিণের পুকুরে বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল

ঘোষ ও ইলা ঘোষ সাঁতার কাটেন। এখানে এক প্রাথমিক বিদ্যালয় কিছু দিনের জন্য চালু ছিল, বিদ্যালয়ের পরিচালক মণ্ডলীতে ছিলেন—সমীর গাঙ্গুলী, রথিন চক্রবর্তী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ও দেবব্রত সেন প্রমুখ।

এই বাড়ির উঠোনে এককালে বিখ্যাত সংগীত শিল্পী সত্যেন ঘোষাল, রবিন ঘোষ, গিরিজা চক্রবর্তী, যশোদা মণ্ডল প্রমুখের উপস্থিতিতে অনেক সংগীতানুষ্ঠান হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, এই বাড়িটি কোন্নগরের নানা সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও শিক্ষাকাণ্ডের পীঠস্থান ছিল।

পরিশেষে উল্লেখ করতে হয় শরৎ চন্দ্র বসুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু ও কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত অজয় বসু এই বাড়িতে বাস করেন। ডাঃ জ্যোতির্ময় বসু এন, আর, এস মেডিক্যাল কলেজে চক্ষু বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। ডাঃ বসু বিভাগীয় প্রধান থাকাকালে অবসর নেন। বর্নান্ধতা নিয়ে তাঁর গবেষণা আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃতি পেয়েছে। তাঁর এক কন্যা ডাঃ নন্দিতা ঘোষ, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ। ছোট ভাই অজয় বসু ছোটখাট ব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন।

সূত্র ঃ ডাঃ জ্যোতির্ময় বসুর সাথে সাক্ষাতকারে   লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরের কয়েকটি প্রাচীন বাড়ি

ঘোষাল বাড়ি

সে প্রায় ৩০০ বছর আগের কথা। এই বাড়ির পূর্ব পুরুষেরা বাইরে থেকে কোন্নগরে এসে বাড়ি তৈরি করে বসবাস শুরু করেণ। এককালে এই বাড়ির দুর্গা মণ্ডপে জাঁকজমকের সাথে পারিবারিক দুর্গা পূজা হোত।

এই পরিবারে অনেক কৃতবিদ্য ও স্বনামধন্য পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় নিচে দেওয়া হল ঃ

১।। কিশোরী মোহন ঘোষাল—ইনি ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন রাধিকা বসু, নৃসিংহ দাস বসু প্রভৃতি। ইনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ আইন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং সাহিত্য কর্মে এঁর আগ্রহ ছিল।

২।। ডাঃ চণ্ডী চরণ ঘোষাল— খ্যাতিমান ডাক্তার ছিলেন। এককালে ইনি রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার সভাপতি ছিলেন। ইনি ১৯০৪-১৬ এবং ১৯২৭-৩০ এই কালপর্বে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। এঁর নামে কোন্নগরে একটি রাস্তার নাম করণ করা হয়েছে।

৩।। রামচন্দ্র ঘোষাল—ইনি একসময়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন। কোন্নগরে এঁর নামে একটি রাস্তার নাম করণ করা হয়েছে—আর, সি, ঘোষাল লেন।

৪।। ডাঃ মলিনী ঘোষাল—ইনি চণ্ডীচরণ ঘোষাল মহাশয়ের পুত্র। ইনি একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ছিলেন।

৫।। দুর্গাপদ ঘোষাল—এম, এ, বি, এল। ১৯২৪ সালে ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে এক সঙ্গে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহী সমিতির সদসদ্য ছিলেন। বিশিষ্ট আইনজীবী এবং এককালে সরকারের উচ্চপদে আসীন ছিলেন।

৬।। ডাঃ নীলকণ্ঠ ঘোষাল—ইনি ডাক্তারী পাশ করে কলকাতায় চাকরী জীবন যাপন করেন। এঁর পুত্রও ডাক্তার।

৭।। উমাচরণ ঘোষাল—ঘোষাল বাড়ির আর একজন বংশধর। ইউ, সি, ঘোষাল নামে একটি রাস্তা আছে।

শিক্ষা ও সমাজ জীবনে এই ঘোষাল বাড়ির এক বিশেষ ভূমিকা আছে।

সূত্র ঃ পুরাতন কাগজ পত্র   সংগ্রাহক ঃ বিষ্ণু দত্ত

দাস বাড়ি

নবীন মুখার্জী লেন

প্রায় দুশো বছরের পুরোনো বাড়ি এই দাস বাড়ি। নির্মাণে কর্তা সার্থক দাস (?) তাঁর দুই ছেলে বৃন্দাবন দাস, উমেশ দাস। বৃন্দাবন দাসের পৌত্র রজনী কান্ত দাসের এককালে ভদ্রকালী শিবতলাতে ইঁটের খোলা ছিল।

বৃন্দাবন দাস এদেশে প্রথম টালি খোলার পত্তন করেন। কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে টালি নির্মিত হোত। আর ইঁট ছিল উপজাত দ্রব্য।

অন্য ভাই উমেশ দাসের দুই ছেলে শশীভূষণ ও আশুতোষ, এঁদের কোতরং-এ ইঁট খোলা ছিল, আর এক ছেলে বিপিন দাসের গোলা ছিল পঞ্চু দত্তের ঘাটের দক্ষিণে। প্রায় ৩০/৪০ বছর আগে ইঁট খোলাগুলি হস্তান্তর হয়ে যায়।

দাসেদের পূর্ব পুরুষদের বিরাট বাড়ি নানা শরিকের অংশে ভাগ হয়ে যায়। এঁদের তৈবি পূজা মণ্ডপটি বহু পুরাতন। এই পূজা মণ্ডপে ও পশ্চিমের উঠোনে দোল পূর্ণিমা, দুর্গোৎসব, যাত্রা থিয়েটার ও সঙ্গীতে মুখরিত হোত। এখন সে গৌবব অস্তমিত। দাসবাড়ির দক্ষিণের খোলা জায়গায় সার্বজনীন দুর্গাপূজা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

এই বাড়ির আশুতোষ দাসের ছেলে পঞ্চানন দাস তবলা ও সেতার বাদনে পারদর্শী ছিলেন। প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হিরু গাঙ্গুলীর গুরু ভাই ছিলেন। আর সারা ভারত খ্যাত ওস্তাদ বাদল খাঁর শিষ্য ছিলেন। তিনি বঙ্গদেশের বহু সঙ্গীত আসরে যোগ দিতেন।

শশীভূষণ দাসের পৌত্র সলিল দাস এবং বিপিন দাসের পৌত্রী ও কালিপদ দাসের কন্যা চায়না দাস কণ্ঠসঙ্গীতের বিশেষ পারদর্শী ও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৭৩ সালে এঁদেরই স্থাপনা সুর পঞ্চম সঙ্গীত বিদ্যালয়।

বিপিন দাসের পৌত্র ও হরিহর দাসের পুত্র যোগেশ দাস এককালে নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন।

গিরীশ দাসের পৌত্র ও রজনী কান্ত দাসের পুত্র অমর দাস ১৯৪০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এঁর সতীর্থ পরেশ চৌবঙ্গী প্রথম হন আর এক সতীর্থ কোন্নগর পুর সভার প্রাক্তন পুর প্রধান অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। অমর নাথ দাস যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ইনি বিধান চন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থ রায়, অজয় মুখোপাধ্যায় ও জ্যোতি বসু এই ৫ জন মুখ্যমন্ত্রীর আমলে কাজ করেন। সরকারী বাস্তুকার, ইলেকট্রিক্যাল ইনস্টলেশন ও মেনটেনেন্স-এর ভারপ্রাপ্ত বাস্তুকার হিসাবে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম ও যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গন প্রভৃতিতে কাজ করেন। ১৯৬২ সালে সর্বভারতীয় এগ্রিকালচারাল মেলার ও ১৯৭২ সালে দিল্লীতে এশিয়া ট্রেড ফেয়ার প্রভৃতিতে যোগ্যতার সাথে কাজ করেন। এবং ১৯৮২ সালে ডেপুটি ডাইরেক্টার, ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং বোর্ড থেকে অবসর নেন। চাকরীতে যোগ দেবার আগে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হিসাবে কাজ করেন।

সূত্র : অমর নাথ দাস লেখক : বিষ্ণু দত্ত

মনি বাড়ি

প্রায় তিন'শ বছরের বৃহৎ বাড়ি শ্রী অরবিন্দ রোডে বসুমণিদের। এই পরিবারের নামে ক্রাইপার রোডের সংযোগস্থল থেকে চড়কতলা পর্যন্ত আগে মণি পাড়া বলা হোত। এই পরিবারের বংশধররা বাংলা ও ভারতের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা তিন মহলা বাড়ি ছিল—বাইরের বাড়ি, পূজা মণ্ডপ ও বাসগৃহ। পিছনে বাগান ও সান বাঁধান ঘাট সহ বিরাট পুকুর। বাড়িটির চৌহদ্দি ছিল দক্ষিণে শ্রীঅরবিন্দ রোড থেকে উত্তরে রবীন্দ্র ভবন পর্যন্ত। ১৯৮০ সালে মণি বাড়ির কিছু জমি পুরসভা কিনেছিল যে জমির $\frac{৩}{৪}$ অংশে রবীন্দ্র ভবন নির্মিত হয়েছে।

১৯৯৬-৯৭ সালে জনৈক প্রোমোটার এই বাড়ির সত্ত্বাধিকারীদের কাছ থেকে দফায় দফায় চুক্তি করে এই বৃহৎ বসতবাড়ি ও পুকুরটি কেনে, পুকুর বুজিয়ে বাড়িটি ধূলিসাৎ করে দেয়—মাত্র সিং দরজা সহ দেওড়িটি দাঁড়িয়ে আছে পুরাতনের সাক্ষী রূপে। এই সিং দরজার দু'পাশে পাথরের শিলায় লেখা ছিল যা থেকে জানা যায় যে, এই বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা বিনোদমোহন (এলায়াস)বিনোদ রাম বসু (মণি) এবং কমল লোচন বসু (মণি)। এর পর যাঁরা পর পর বাস করতেন তাঁরা হলেন—

- ক্ষেত্রনাথ বসু (মণি)
- সাগর নাথ বসু (P.W.D Accountant)
- মহেন্দ্র নাথ বসু (সাব জজ কলকাতা হাই কোর্ট, কিছুদিনের জন্য)।
- নরেন্দ্র চন্দ্র বসু

(নামগুলি ইংরাজী হরফে লেখা ছিল)

আর যে পূজা মণ্ডপ ছিল তার ভেতরে প্রবেশের দরজা দু পাশের দেওয়ালে লেখা ছিল—

গোপাল চন্দ্র বসু District & Session Judge.

গোপাল চন্দ্র বসু ১৯৩০-৩৩ সাল পর্যন্ত কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলেন। এঁর নামে পুরসভার একটি রাস্তা আছে নাম, গোপাল চন্দ্র বসু সরণি। এঁর তিন ছেলে সরোজ বসু, ইঞ্জিনিয়ার, পঙ্কজ বসু এডভোকেট, ও নীরজ বসু; বড় চাকুরে। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত গোঁপাল চন্দ্র বসু স্ত্রী পুত্র কন্যা সহ এই বাড়িতে বাস করতেন। এই বাড়িতে তাঁদের নারায়ণ শিলা ছিল, নিত্য তার পূজা হোত, এছাড়া দোল উৎসব ও অন্যান্য পূজাও হোত।

লেখক বিষ্ণু দত্ত

যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ি

একজালে শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তাঁর বৃহৎ বাড়ি ছিল। 'পদাপাঠের' লেখক হিসাবে তাঁর নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী হয়ে আছে। তাঁর একটি ছাপাখানাও ছিল। তিনি এক সময়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্য ছিলেন।

১৯১০ সালে তাঁর দুই পুত্রের কাছ থেকে বরদা মোহন, কিশোরী মোহন ও কুঞ্জ বিহারী বন্দোপাধ্যায় এই বাড়ি কিনে নেন। এই বংশের মহাদেব চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় বি এস সি বি এল ছিলেন।

বাড়িটির আশু সংস্কার প্রয়োজন।

লেখক : বিষ্ণু দত্ত

অন্নদা ভবন-যতীন্দ্র ভবন

(শিবচন্দ্র দেব স্ট্রীট)

প্রায় ৭০ বছর আগে রাধিকা বসু ও তাঁর ভায়েরা শিবচন্দ্র দেবের ভাইপো গিরীশ চন্দ্র দেবের মেয়ের কাছ থেকে এই বাড়ি কেনেন। এঁদের বাবা বর্মা প্রত্যাগত ডাঃ যতীন্দ্র বসু ও মা অন্নদা বসু এঁদের আগে বাড়ি ছিল বর্ধমানের আকাল পৌষে। ভায়েরা হলেন বিজলী বসু, হরেন্দ্র বসু ও নরেন্দ্র নাথ বসু।

রাধিকা বসু ঃ ইনি পাবনার (অধুনা বাংলা দেশ) এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিখ্যাত কলেজ পাঠ্যপুস্তক রেটরিক ও প্রসডির লেখক।বইখানি কলেজেব ইনটারমিডিয়েট স্তরের বহুদিন যাবৎ পাঠ্যপুস্তক ছিল। ইনি ১৯০০ সালে কোন্নগব উচ্চ বিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন প্রথম হয়ে। এঁর সতীর্থ ছিলেন শবৎ কুমার দেব, কিশোরী মোহন ঘোযাল, কালীচবণ মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহ দাস বসু, হবিদাস মিত্র, প্রাণতোষ লাহা, প্রকাশ চন্দ্র মুস্তাফি প্রমুখ। ইনি ১৯১৫ সালে রিষড়া—কোন্নগর পুরসভার সদস্য ছিলেন।

বিজলী বসু ঃ ইনি ন্যাশনাল সিটি ব্যাঙ্কে উচ্চ পদে আসীন ছিলেন। এঁর পুত্রগণেব মধ্যে একজন ডক্টরেট অন্যজন ডাক্তাব। ইনি একদা কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের পবিচালক সমিতিব সদস্য ছিলেন। এব বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন হরিসত্য ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নরেন্দ্র নাথ বসু ঃ চাটার্ড ব্যাঙ্কের উচ্চপদে চাকরী করতেন। ইনি ১৯৪০-৪৪ পর্যন্ত হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের সহ-সম্পাদক এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। এঁর বন্ধুদের মধ্যে ননী গোপাল বসু, অনিল ঘোষ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। ইনি ফ্রেণ্ডস সোসাইটির সাথে যুক্ত ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠান সাহিত্য চর্চা করা ছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে পাঠ্যসূচির নানা বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে ছাত্রদের মধ্যে

বিদ্যাশিক্ষায় উৎসাহের সঞ্চার করতেন। এছাড়া তিনি কোন্নগর পাঠচক্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। একবার দেবভিলাতে নজরুল-এর উপস্থিতিতে যে সভা হয় ইনি তার অন্যতম সংগঠক ছিলেন।

হরেন্দ্র বসু ঃ বেঙ্গল ইমিউনিটিতে উচ্চ পদে চাকরী করতেন। এঁর দৌহিত্র কার্তিক কর সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত এবং খেলাধূলায় উৎসাহী।

এই অন্নদা ভবনে এককালে নিখিল বঙ্গ নব বর্ষ উৎসব সমিতির অনুষ্ঠান হোত। তাছাড়া ১৯৯২-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এখানে সূচীশিল্প ও হাতের কাজের প্রদর্শনী হোত।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়—রাধিকা নাথ বসু, নরেন্দ্রনাথ বসু ও মলয় দেব এক সময়ে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের অছি ছিলেন।

সূত্র ঃ নরেন্দ্র নাথ বসুর পুত্র নিশীথ বসু লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির

প্রতিষ্ঠা ঃ ২৫ ফাল্গুন, ১৮০০ শকাব্দ

ইংরাজী ৮ মার্চ ১৮৭৯

নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনার জন্য কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপিত হয়। এই ব্রাহ্ম সমাজে বছরে একদিন উপাসনা হয়। ব্রহ্ম সঙ্গীত পরিবেশন হয়। অনেক মানুষ এই অনুষ্ঠানে আসেন এবং খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে দিনটি পালিত হয়।

লেখক ঃ সঞ্জীব সেন

জয়কালী মন্দির

(রায়পাড়া লেন)

মন্দির গায়ের প্রস্তর ফলক অনুযায়ী এই মন্দির আনুমানিক ৪০০ বছরের পূর্বে নির্মিত।

মন্দিরের মায়ের কক্ষে কালীমূর্তি, দু'পাশে আলাদা আলাদা ঘরে শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরের আমূল সংস্কার হয় ১৯৯২ সালে।

দক্ষিণে বৃক্ষ শোভিত প্রাঙ্গণ আছে।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় নিয়মিত পূজা হয়।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

মুখার্জী বাড়ির পূজা মণ্ডপ

(বকুলতলা লেন)

১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিবারের নবম পুরুষ রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বিক্রমপুর থেকে এদেশে আসেন। এঁদের বংশের গঙ্গাশঙ্কর বুয়র যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সহায়তা করায় জমিদারি লাভ করেন—একথা প্রচলিত আছে। দুশো বছর ধরে, প্রায় ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এবাড়িতে দুর্গা পূজা হোত।

এই বংশের একটা শাখা শম্ভু চ্যাটার্জী স্ট্রিটস্থ বিপিন বিহারী মুখোপাধ্যায় ও কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়-এর পিতা রাজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। হরি মুখোপাধ্যায়-এর পিতা হীরালাল মুখোপাধ্যায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর বড় ভাই শ্যামাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর কন্যাকে বিবাহ করেন।

উত্তর পাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের (ঘড়িবাড়ি) সঙ্গে এই পরিবারের যোগাযোগ ছিল।

১৯৫০ সালের কাছাকাছি এই বাড়ির শেষ দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই বাড়ির দুর্গোৎসব এককালে খুবই জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন হোত।

এই পরিবারে অনেক কৃতি ডাক্তার ও ইন্‌জিনিয়ার জন্ম গ্রহণ করেন।

ডাঃ দীনবন্ধুর মাতার প্রদত্ত জমিতে তাঁদের অকাল মৃত পুত্র সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে কোন্নগর পুর সভা ১৯৭৫-৭৬ সালে 'সুব্রত শিশু উদ্যান' নির্মাণ করে। পুসভার ট্রেঞ্চিং গ্রাউণ্ড অঞ্চলে এবং তদানীন্তন বাগদী পাড়ায় ৫০ বছর আগে এঁদের অনেক জমি পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষ কিনে নেন। সেই সময়ে যে কাঁচা রাস্তাগুলি তৈরি হয় সেগুলিকে কোন্নগর পুর সভাকে অর্পণ করে এই পরিবারের করদাতারা। এঁদের বংশের পুরুষদের নামে এই সব রাস্তার নামকরণ হয় যেমন মতিলাল গার্ডেন লেন, হরিদাস

এভিনিউ, হীরালাল মুখার্জী সরণি, এবং একটি প্রধান রাস্তা রামমোহন প্রেস। এঁদের বিক্রয় কবা জমিতে যে সব বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে সেগুলি হোল রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়, কোন্নগর কল্যাণ পরিষদেব প্রাথমিক, নিম্নবুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলি, এবং হরি মন্দির ও শিশুচক্র ক্লাব প্রভৃতি। (রাজেন্দ্র স্মৃতি কো-অপারেটিভের জমিতে)

অন্য এক ভাই মতিলাল মুখোপাধ্যায়ের দান করা জমিতে তরুণ সঙেঘর নৈশ বিদ্যালয় নির্মিত হয।

সূত্র ঃ ডাঃ দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

কোন্নগরের স্নানের ঘাট

১।। হাতির কুলের ঘাট

২।। বিশালক্ষ্মী ঘাট

৩।। দ্বাদশ মন্দির ঘাট

৪।। শম্ভু চ্যাটার্জীর ঘাট

৫।। ব্রাহ্মসমাজ ঘাট

৬।। শিবচন্দ্র সাধুখাঁ ঘাট

৭।। বাজার ঘাট— তৎসহ আধুনিক যুগোপযোগী ভাসমান জেটি সহ কোন্নগর-পানিহাটী ফেরী ঘাট

৮।। পঞ্চু দত্তের ঘাট

৯।। পুরাতন বাজার ঘাট

দ্বাদশ মন্দির ঘাট

প্রায় দু'শ বছর আগে তৈরি কোন্নগরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও বহু ঐতিহাসিক স্মৃতি সমন্বিত এবং বৃহত্তম এই ঘাটটি গঙ্গার গর্ভে বিলুপ্ত হবার উপক্রম হয়েছিল। এই ঘাটের সত্ত্বাধিকারী কলকাতার হাট খোলায় প্রয়াত হর সুন্দর দত্তের বংশধরগণ। ঘাটটি নির্মিত হয় ১৮২১ সালে। কিন্তু হরসুন্দর দত্তের বংশধরগণ ঘাটটি সংরক্ষণে উদ্যোগী না হওয়ায় কোন্নগরের পরলোকগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যথা—হরি সাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল কুমার মুখোপাধ্যায়, শিশির কুমার ঘোষ (ছোট), প্রমুখের চেষ্টায় ঘাট সংরক্ষণ সমিতি গঠিত হয়। সমিতি প্রয়াত হরসুন্দর দত্ত-র পরিবারের সংগে যোগাযোগ করেন। তাঁরা সমিতি নিযুক্ত অছি বৃন্দের তত্ত্বাবধানে মন্দিরের সম্পত্তি হস্তান্তর করেন। তখন কোন্নগর পুরসভা প্রদত্ত ৫০০০ টাকা ও কোন্নগর বাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে ঘাট ও ঘাটের তীর বাঁধান

হয়, সঙ্গে সঙ্গে চন্দাতপটিবও সংস্কার করা হয়। এছাড়া বিড়লা জন কল্যাণ ট্রাস্ট ১৯৬৭ সালে এই ঘাটের সংস্কার বাবদ ৫০০০০ টাকা দান করে।

এই ঘাটের মাঝখানে ৩৫ ফুট চওড়া সুপ্রশস্ত সুন্দর সিঁড়ি। সিঁড়ির দুধারে সুদৃঢ় রানা। ঘাটের ওপর সুদৃশ্য পাকা চাঁদনি। দু'ধারে উত্তর দক্ষিণে শ্রেণী বদ্ধভাবে প্রসারিত ৬টি করে ১২টি শিবের মন্দির।

বিশালক্ষ্মীর ঘাট

বিশালক্ষ্মীব ঘাটটি দীর্ঘদিন কাঁচারূপে ব্যবহৃত হলেও ১৩০৮ বঙ্গাব্দে প্রযাত কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায-এর পত্নী কামিনী দেবী পাকা ঘাট ও ঘাট সংলগ্ন শিবমন্দিরটি নির্মাণ করেন। ঘাটেব উপর বিরাট বটগাছের মূলে বিশালক্ষ্মীর শিলা ও পঞ্চাননেব মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে ঘাটটি সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত।

শম্ভু চ্যাটার্জীর ঘাট

ঘাটটি ১২৭১ সালে প্রযাত শম্ভু চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নির্মিত। দক্ষিণ দিকেব শ্মশান ঘাটটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ায় বর্তমানে ঘাটের উত্তরে স্বত্ত্বাধিকাবীদেব সম্মতিতে শ্মশান ঘাটটি নির্মিত হয। সঙ্গে শ্মশান যাত্রীদের বিশ্রামের জন্য একখানি কক্ষ এবং শ্মশানের চুল্লির উপর আচ্ছাদন হয়েছে। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে ঘাটেব ওপব দক্ষিণ দিকের জমিতে প্রয়াত সূর্য নারায়ণ সবস্বতী কর্তৃক আনন্দময়ী কালী মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।

পুরাতন বাজার ঘাট (সিংহীঘাট)

একটি অতি প্রাচীন ঘাট, বলা যেতে পারে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ঘাট। জনশ্রুতি অনুসারে প্রায় ৩০০ বছর ধরে ঘাটটি স্নানের ঘাটরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। আগে কাঁচা ঘাট হিসেবে এই ঘাট ব্যবহার হোত রায় পাড়ার রায়বংশীয় জমিদারগণ কর্তৃক ১২৫ বছর আগে চাঁদনি সহ ঘাটটি পাকা করে গাঁথা হয়। চাঁদনিটি এখনো টিকে থাকলেও ঘাটটি সম্পূর্ণরূপে নদীগর্ভে লুপ্ত হয়েছে।

কোন্নগর বাজার ঘাট (ফেরী ঘাট)

এই ঘাটটিও অতি প্রাচীন ঘাটগুলির মধ্যে অন্যতম। ঘাটের দক্ষিণ দিকে কোন্নগরের বৃহত্তম শ্মশান ঘাট। শ্মশান ঘাটটি ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলে ডাঃ শরৎ কুমার দেব প্রমুখের চেষ্টায় প্রায় ২০ বছর আগে ঘাটটি সংস্কার হয় ও শ্মশান যাত্রীদের জন্য ঘরটি নির্মাণ হয়। পরবর্তী কালে চুল্লির উপর আচ্ছাদন ও ঘাটের ধারে ভাঙন রোধে রক্ষা দেওয়াল দেয়া হয়। প্রশস্ত উন্মুক্ত চাতাল সমেত ঘাট ও ছোট শিব মন্দিরটি প্রায় ১০০ বছর আগে দয়াল শিরোমণি লেনের চক্রবর্তী বংশীয়গণের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক নির্মিত।

অন্যান্য স্নানের ঘাট

১।। মাধবানন্দ আশ্রমের নিজস্ব ঘাট

২।। প্রয়াত ডাঃ শচীন্দ্র নাথ সর্বাধিকারীর নিজস্ব ঘাট

৩।। অক্ষয় নন্দীর বাগানের নিজস্ব ঘাট

৪।। গাবতলার ঘাট (ভাঙনে অবলুপ্ত)

সাহায্য গ্রন্থ ঃ আমাদের কোন্নগর তথ্য সংগ্রাহক ঃ বিযুত দত্ত

ব্রাহ্ম সমাজ ঘাট

প্রতিষ্ঠা ঃ ১৮০২ শকাব্দ

ইংরাজী ঃ ১৫ মার্চ ১৮৮১

"অম্বিকা দেব জায়া তদীয়া পিতা বৈদ্যনাথ ঘোষ, স্মরণার্থে কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ ঘাট প্রতিষ্ঠিত হল"

কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ও ব্রাহ্ম সমাজ ঘাটে যথাক্রমে উপরের লেখাগুলি লিখিত আছে।

একথা উল্লেখ্য যে, গৌরধাম তথা শিবচন্দ্র দেবের বাড়ি শীর্ষক লেখায় কোন্নগর ব্রাহ্ম সমাজ মন্দির ও ঘাট স্থাপনা নিয়ে বিস্তারিত লেখা আছে।

বেশ কয়েক বছর যাবৎ মন্দিরের সভা কক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুকূল্যে ব্রাহ্ম সমাজ কোন্নগর মহিলা শাখার উদ্যোগ লেডি ব্রেবোর্ণ নিডিল ওয়ার্কের ডিপ্লোমা, কাটিং, এমব্রডারি প্রভৃতি হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় কয়েকজন শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

অনুচ্ছেদ—৭

বিবিধ ঃ

(ক) নৃসিংহদাস বসু মেমোরিয়াল হল ঃ

(খ) কোন্নগর থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা ঃ

নৃসিংহ দাস বসু মেমোরিয়াল হল

(কোন্নগর টাউন হল)

প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কোন্নগর পুরসভা ১৯৪৪ সালের ১৬ জানুয়ারী স্থাপিত হয়। এই পুরসভার প্রথম পুরপ্রধান নৃসিংহ দাস বসু। তাঁর জন্মদিন ১৫-৯-১৮৮২ ও মৃত্যুদিন ১৮-৮-১৯৬০ (যখন তাঁর বয়স ৭৮ বৎসর)।

তাঁর দীর্ঘ ও ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল—

তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজীবী হয়েও আইনের ব্যবসায় তেমন ব্যাপৃত থাকেননি। তবে তিনি আইন সম্পর্কীয় অনেক মূল্যবান পুস্তকের সংকলন ও সম্পাদনা করেন যথা The Indian succession Act, The Indian Evidence Act প্রভৃতি। এগুলি আইনের ছাত্রও আইন ব্যবসায়ীদের খুবই সহায়ক হয়েছে।

কোন্নগরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতিতে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি যুক্ত ছিলেন কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার এবং দীর্ঘকাল ধরে উচ্চ বিদ্যালয় ও অন্যান্য এডেড্ বিদ্যালয়গুলির সহিত। সর্বোপরি কোন্নগর পুরসভার জন্মকাল থেকে তার প্রধান হিসাবে— '১৯৪৪ থেকে ১৯৫৪ সাল এই দীর্ঘ দশ বৎসর তার সঙ্গে যুক্ত থেকে নানা উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমে ও সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রশাসন দ্বারা পারদর্শিতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে, কি উচ্চ বিদ্যালয়ের, কি পুরসভার কর্ম যজ্ঞে কোন্নগরের আর এক সুসন্তান ননীগোপাল বসু সব সময়ে তাঁর পাশে থেকেছেন ও তাঁর বাহুতে বল যুগিয়েছেন। এক কথায় বলা চলে যে, এই দুই বসুর অবদান কোন্নগরের মানুষ কখনও ভুলবেনা।

কোন্নগর পুরসভার জন্মের পূর্বে যখন রিষড়া-কোন্নগর পুরসভা ছিল তখন নৃসিংহ দাস বসু বিভিন্ন টার্মে পুরসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন কোন্নগরের অন্তর্ভূক্ত ওয়ার্ড থেকে এবং রিষড়ার ওয়ার্ড থেকে ও

তিনি ১৯২০-২১ সালে উক্ত পুরসভার সভাপতি পদে বৃত হন।

বঙ্গদেশের পুরসভাগুলির প্রতিনিধিমূলক সংস্থা অল বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন বহুদিন। ১৯৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে বীরেন রায়, ডি, এস্ সি, প্রাক্তন সাংসদ ও বেহালা পুরসভার প্রাক্তন প্রধান-এর সহিত নৃসিংহ দাস বসুর পরিচয় হয় এবং তিনি এসোসিয়েসনের সংবিধান রচনায় সাহায্য করেন বীরেন রায়কে। ৬/৭ মার্চ ১৯৩৫ সালে হাওড়া টাউন হলের সম্মেলনে এসোসিয়েসন গঠিত হয়। ১৯৪৯ সালে এসোসিয়েসনের নূতন নাম হয় ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন। তখন তিনি ইহার সহ সভাপতি হন কলিকাতা সম্মেলনে এবং ইহার সভাপতি নির্বাচিত হন ১৯৫২র কলিকাতা সম্মেলনেই।

কোন্নগরের পুরসভা গঠনে তাঁর এবং ননীগোপাল বসুর বিশেষ অবদান ছিল অন্যেরাও সাহায্য করেন।

.কোন্নগরের সামাজিক ও নাগরিক জীবনের বিশেষ সংকটের সময় তিনি প্রথম নাগরিক (City father) হিসাবে কর্তব্য পালন থেকে কখনও পরাঙ্মুখ হননি। ১৯৪৩ সালে বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষের সময় এবং 1946 ও 1950 সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তাঁর ভূমিকা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

ছাত্রাবস্থায় ও যৌবনে সতীর্থ ও বন্ধুগণ ছিলেন— কিশোরী মোহন ঘোষাল, রাধিকানাথ বসু প্রাণতোষ লাহা (রিষড়া বাসী) শরৎ কুমাব দেব (পরে ডাক্তার) হরিদাস মিত্র (পরে ডাক্তার) প্রকাশ চন্দ্র মুস্তাফি, জোতিন্দ্র চন্দ্র গাঙ্গুলী প্রভৃতি।

ছাত্রাবস্থায় ও যৌবনের প্রারম্ভে কিশোরী মোহন ঘোষালের সহিত মিলিত হয়ে কবিতা রচনা ও সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। এছাড়া শিবচন্দ্র দেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সমাজ সেবার কাজ শুরু করেন (শিব চন্দ্র দেব যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স মাত্র আট বৎসর)। এই বয়সেই গুরুজনদের নিকট থেকে শিবচন্দ্র দেবের গুণাবলীর কথা শুনে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হন। পরে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নিত্যকৃষ্ণ বসুর প্রেরণায় সহপাঠী ও বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে ফ্রেন্ডস্ সোসাইটি নামক এক হিতৈষী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। পরবর্তী সময়ে ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যা চর্চাকে উৎসাহ দানের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা গৃহীত

হত তাঁদের উদ্যোগে। সফল ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হত।

রাজনৈতিক মতবাদে তিনি প্রধানতঃ গান্ধীজীর অনুসারী ছিলেন না। যৌবনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র পাল, আনন্দ মোহন বসু, চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখ নেতৃবর্গের আদর্শের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এক সময়ে সিরাজগঞ্জে চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক অধিবেশনে তিনি হুগলী জেলার কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করেন। শ্রী অরবিন্দের মতবাদও তাঁকে প্রভাবিত করে। এক কথায় বলা চলে যে, এই সকল মহাপুরুষের প্রভাবে তাঁর অন্তরের মধ্যে যেমন দেশপ্রেমের আবেগ ছিল তেমনি সমাজের শিক্ষা প্রসারে ও গঠনমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গীকৃত করেছিলেন। যখন উচ্চবিদ্যালয়ের পুরাতন জীর্ণ ভবনটির সংস্কার ও পুনর্নির্মাণের কাজটি একান্ত জরুরী রূপে দেখা দেয় তখন ১৯১৭ সালে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভ্যগণ অর্থসংগ্রহে অবতীর্ণ হন। এর পূর্বে ১৯১৬ সালে বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির নির্বাচনে নবীন দলের রামধন দেব ও পীতাম্বর চ্যাটার্জী যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদকের পদে আসীন হন। তাই দেখা গেল এদের সঙ্গে অন্যতম সদস্য নৃসিংহদাস বসুও অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগী হয়েছেন। এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয় যে, কোন্নগরের অন্যতম সুসন্তান বর্ধমানবাসী তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় তহবিলে এককালীন ১২,০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর ফলে সেই অর্থ প্রাপ্তিতে বাধার সৃষ্টি হলে পরিচালক সমিতির পক্ষে নৃসিংহ দাস বর্ধমানে গিয়ে তারাপ্রসন্নের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। ফলে সে বাধা দূর হয় এবং ঐ দান সংগৃহীত হয়। অবশেষে ১৯১৯ সালে প্রশস্ত ও সুন্দর বিদ্যালয়ভবনের নির্মাণ কার্য সমাধা হয়। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে ইহার পূর্বে ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। নৃসিংহ দাস বসু উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্পাদক পদে ছিলেন—১৯১৮-১৯২৫।

.১৯৫৪ সালে যখন তাঁর চার বৎসরের কার্যকাল শেষ হল তখন শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন পুরসভার নির্বাচনে আর প্রার্থী হলেন না এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পুরসভার নূতন কর্ণধারদেব নানা সময়ে মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। এক কথায় বলা চলে যে, প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি পরিচালিত বোর্ড তাঁর স্নেহধন্য হয়েছিল। সমিতির পুরপ্রধান তারক দাস চ্যাটার্জী ও উপপ্রধান অমিতাভ মুখার্জী প্রায়শঃই আইন ও প্রশাসন বিষয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন।

নৃসিংহ দাস বসুরই কার্যকালে রচিত মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের প্রকল্প রূপায়নে যখন প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি পরিচালিত বোর্ড ব্রতী হল তিনি সর্বান্তকরণে সেই প্রচেষ্টাকে সমর্থন করেন। তাই দেখা যায় ১৯৫৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী যখন হাতীবকুলের নন্দ দুলাল ব্যানার্জীর বাড়ীর একতলায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ অমূল্য ধন মুখার্জী মাতৃসদনের দ্বারোদঘাটন করেন ও সি. এস. মুখার্জী ষ্ট্রীটে পীতাম্বর চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত জমির উপর মাতৃসদনের নিজস্ব ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন তখন বসু মহাশয় ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জীর হাতে হাসপাতাল তহবিলের ৫,০০০ টাকা প্রেরণ করেন। আবার ১৯৬০ সালের ১২ জুন ভবন দ্বারোদঘাটন অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনাথবন্ধু রায় এব উদ্বোধন করেন।

সততা নিষ্ঠা এবং আজীবন গ্রামের মানুষের সেবা—এজন্যই কোন্নগরের মানুষ চিরকাল তাঁকে স্মরণ করবে এবং এই কারণেই কোন্নগরের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এইরূপ মানুষের স্মরণে পুরসভবনের দ্বিতলে টাউন হল (নগর সভাকক্ষ) নির্মাণ এক উপযুক্ত ও যোগ্য কাজ। টাউন হলের প্রয়োজনীয়তা কোন্নগরের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অনুভব করে আসছিল।

১৯৬৮ সালের ১৯ ডিসেম্বর নৃসিংহ দাস বসু মেমোরিয়াল হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় দুর্গাদাস বসু, এম.এ.এল.এল.বি.।

হল নির্মাণের প্রেরণা মিলেছিল যখন বসু মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীসুধীর কুমার বসু এম.এ.বি.এল. সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট ১৯৬১ সালে জুনে তদানীন্তন পুরপ্রধান শ্রী অমিতাভ মুখার্জীর কাছে তাঁর প্রয়াত পিতার স্মরণে একটি টাউন হল নির্মাণার্থে ১২,০০০ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন।

তখন থেকেই নির্মাণের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। তবে ইতিমধ্যে চীন ভারত সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে পুরসভাকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে বাতিল করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এডমিনিস্ট্রেটর নিযুক্ত করে দেয়। তখন হল স্থাপনার প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৬৫ সালের পুরনির্বাচনে প্রগতিশীল নাগরিক সমিতি আবার পুরসভায় বিপুল ভাবে জয়ী হয়ে ফিরে এলে হল নির্মাণের কাজে নূতন উদ্যমে আরম্ভ হয়। ৪৪,০০০ টাকার এক পরিকল্পনা তৈয়ারী করেন পুরসভার কলসাল্টিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সরোজ মুখার্জী বি.ই. এবং এটি পাঠান রাজ্য সরকারের কাছে ২/৩ ১/৩ ভিত্তিতে সরকারী সাহায্যের আবেদন জানিয়ে। সরকার সরাসরি আবেদন নাকচ করলে পুরসভা তার অর্থসঙ্কট জনিত অসুবিধার মধ্যে হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা করে ২৯-১২-১৯৬৮ তারিখে প্রথম দফায় ১৪,৮০০ টাকার পরিকল্পনা অনুযায়ী। অবশেষে ২০জুন ১৯৬৯ তারিখে হলের উদ্বোধন হল এবং মোট নির্মাণ ব্যয় ২৮,৯২৫ টাকা ৬৬ পয়সা দাঁড়াল। উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিজয় কুমার ব্যানার্জী। পরবর্তী কালে পশ্চিমদিকে হলের সম্প্রসারণ করা হয় আর অন্যান্য সংস্কার কাজ হয়। এঁর অনেক পরে ১৯৯০—সালে পুরপ্রধান শ্রী সমীর ব্যানার্জীর আমলে শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত সিলিং ও পরে এক মঞ্চ নির্মাণ করা হয়।

একথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, একটা সময়ে সেই ১৯৬৯ সালে-নৃসিংহ দাস বসু হল কোন্নগরের যাবতীয় সভা, সম্মেলন ও নৃত্য-সঙ্গীত অনুষ্ঠানের একমাত্র প্রশস্ত হল ছিল। আর এই ২৭ বৎসর ধরে হল অতি অল্প ভাড়ার বিনিময়ে কোন্নগরবাসীর অতি প্রয়োজনীয় সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশ ও মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক ও মৌলিক অধিকার রক্ষায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে আসছে।

বিষ্ণু দত্ত

বিঃদ্রঃ এই রচনা লেখার সময়ে নৃসিংহ দাস বসুর জন্মশত বার্ষিক উৎসবে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থের (১১ এবং ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৪) এবং ২৯-১২-১৯৬৮ তারিখে স্মৃতি হলের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনা উপলক্ষে পুরপ্রধান শ্রী অমিতাভ মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।.

কোন্নগর থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকা

কোন্নগর প্রকাশিকা।

কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে 'প্রকাশিকা' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ (১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ) বৈশাখ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দের চৈত্রমাস পর্যন্ত এই ছ'বছর নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ছ'খানি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন শ্রী অধীর মুখোপাধ্যায় এবং ৭ম থেকে শেষ সংখ্যা পর্যন্ত সম্পাদনা করেছেন শ্রী গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

পত্রিকাটিতে কোন্নগরের ও বিশ্বের নানা বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। লেখকদের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখনে উল্লেখ করা হলো। ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায়, নৃসিংহ দাস বসু, ননীগোপাল বসু, নির্মল দেব, ডাঃ বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র চন্দ্র, নরেন্দ্র নাথ দেব, সুনীল বসু, মুরারি মিত্র, কানন বিহারী মুখোপাধ্যায়, যতীন্দ্র নাথ রায়, বিষ্ণু দত্ত প্রমুখ।

নবারুণ ।।

কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক মুখপত্র।

সমন্বয়ে ।।

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক— শ্রী বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। এপ্রিল' ০১ পর্যন্ত ৫১ খানি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। অনেক প্রতিষ্ঠিত প্রবীন লেখক লেখিকাদের রচনায় সমৃদ্ধ এই পত্রিকা। এই সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকাখানি প্রকাশিত। সমন্বয়ে সাহিত্যগোষ্ঠীর পত্রিকা সমন্বয়ে। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক অঞ্চল থেকে লেখক শিল্পীরা নিয়মিত ভাবে সহযোগিতা ও আসরে অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকায় 'সমন্বয়ে' পত্রিকা সম্বন্ধে উচ্ছাসিত প্রশংসা করেন।

অভিমুখ ।।

পাক্ষিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১৫-৮-১৯৯৬। সম্পাদক শ্রী দেবু গোস্বামী পত্রিকাখানি ইতিমধ্যে জনসমাদৃত হয়েছে।

অনুবেদন ।।

পাক্ষিক পত্রিকা। প্রকাশ কালে নাম ছিল নব সমাচার দর্পণ। শ্রী অসীম ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত। অবৈতনিক কার্যনির্বাহী সম্পাদক কাজী ইলাহী, অবৈতনিক সহ-সম্পাদক তরুণ মুখোপাধ্যায়। নির্ভীক সংবাদ পরিবেশনে 'অনুবেদন' এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

পৌরবাণী ।।

কোন্নগর পৌরসভার মাসিক পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ অক্টোবর'০১। সম্পাদক শ্রী প্রভাসলাল দাস।

প্রকাশকালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংগে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক ডঃ সুধীর কুমার নন্দী।

অধুনালুপ্ত কয়েকখানি পত্রিকা ।।

(ক) তিথিভোর— সম্পাদক শ্রী প্রভাসলাল দাস

(খ) কৃষ্টিদীপ— ছাত্রসংগঠন কর্তৃক প্রকাশিত

(গ) প্রেক্ষণ— ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন রথিন চক্রবর্তী, অমিতাভ মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব সেন। ১৯৭৭, '৭৮, '৭৯ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

(ঘ) মনন— সাহিত্য পত্রিকা। সম্পাদক দেবু গোস্বামী ১৯৮১, '৮২ সাল পর্যন্ত চলেছিল।

সংগ্রাহক—বিষ্ণু দত্ত

অনুচ্ছেদ—৮ (পরিশিষ্ট)

(ক) কোন্নগরের শিল্প উদ্যোগ ঃ

(খ) কোন্নগরের রাজনৈতিক ও স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ

(গ) অন্যান্য আন্দোলন ঃ

কোন্নগরের শিল্প উদ্যোগ

কোন্নগরে বর্তমানে নিম্নলিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি চালু আছে ঃ—

১। আলক্রোম কেমিক্যাল ইণ্ড্রাস্ট্রিস, ২/২, জি,. টি. রোড (পূর্ব)।

২। ভুতুড়িয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ১৭, জি. টি. রোড (পূর্ব)।

৩। অন্নপূর্ণা কস্ট লিঃ, ১৮/এ, জি. টি. রোড (পূর্ব)।

৪। ফোর্ট উইলিয়াম কোম্পানী লিঃ, ৫ এবং ৬/এ, জি. টি. রোড (পশ্চিম) ও ১ এবং ৩৫, জওহরলাল নেহেরু সরণি।

৫। মাধো প্রসাদ মহাবীর প্রসাদ, ১৯/এ, ২৬ ও ২৭, এন. ডি. বসু লেন।

৬। ন্যাশনাল টেক্স্টাইল করপোরেশন লিঃ (বেঙ্গল ফাইন), ৬১, হারানচন্দ্র ব্যানার্জী লেন।

৭। রিলাক্সন কয়র এণ্ড ফেল্ট ডিভিসন, শ্রী দিগ্বিজয় সিমেণ্ট কোং লিঃ, ৬/২, জি. টি. রোড (পশ্চিম)।

৮। শ্রী ক্রোমাইট ইণ্ড্রাষ্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ, ২/৩, জি. টি. রোড (পূর্ব)।

৯। ওয়ালডিস লিমিটেড, ৪২, জি. টি. রোড (পূর্ব) ও ২, পঞ্চু দত্ত ঘাট লেন।

যে সমস্ত কারখানা বর্তমানে বন্ধ ঃ

১। লছ্মী নারায়ণ জুট মিল।

২। শ্রীদুর্গা স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিমিটেড।

৩। বেন্জার ল্যাবরেটারিস (র‍্যালিস ইণ্ডিয়া)।

৪। হিউম পাইপ।

৫। ট্যাক এণ্ড নেল।

৬। মার্টিন হ্যারিস।

৭। জিঙ্ক অক্সাইড লিমিটেড।

৮। ক্যানাল অয়েল মিল।

উপরোক্ত কারখানা গুলির মধ্যে কতকগুলি কিছু পূর্বে ও কিছু সম্প্রতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে স্থানীয় অর্থনীতির উপর উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব পড়েছে।

বিঃ দ্রঃ—ওয়ালডিস্ কারখানার সীমানার উত্তর-পূর্ব অংশে ই, হেওয়ার্ড-এর মালিকানায় বেঙ্গল ডিস্টিলারিস কারখানা যা বিলাতী মদ উৎপাদন করে তা ১৯৪৮ সালে ভদ্রকালীতে স্থানান্তরিত হয়।

আরো কিছু কিছু ছোট কারখানা যা প্রধানতঃ হাজী বঙ্কু লেনে অবস্থিত তা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হল না।

সূত্র ঃ কোন্নগর পুরসভা থেকে প্রাপ্ত তথ্য।   লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত।

যুব সংগঠন-ষ্টুডেণ্ট ফেডারেশন

১৯৪৮ সালে কোন্নগর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে ছাত্র-মাহিনা বৃদ্ধি ঘোষণা হয়। সেই সময়ে কোন্নগরে রথিন চক্রবর্ত্তী, গোবিন্দ চ্যাটার্জী, শ্যামল মিত্র প্রভৃতির নেতৃত্বে ছাত্র ফেডারেশনের এক ইউনিট গঠিত হয়। মাহিনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে ছাত্র ফেডারেশন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারা ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দেয়। সেই সময় স্থানীয় কংগ্রেস ধর্মঘটের বিরোধীতা করায় সংঘর্ষ বাধে, ফলে কয়েকজন ছাত্র কর্মী আহত হয়। এরই প্রতিবাদে ফেডারেশন কোন্নগরের রাস্তায় আহত ছাত্র কর্মীদের নিয়ে শোভাযাত্রা করে, নেতৃত্ব দেন জেলা নেতা কালিপদ সেনগুপ্ত ও মঞ্জু ঘোষ এবং প্রাদেশিক নেতা সুখেন্দু বিকাশ মজুমদার ও তপন পিপলাই। ধর্মঘটের সমর্থনে কোন্নগর দ্বাদশ মন্দির চত্বরে এক জনসভা হয়। সভাপতিত্ব করেন বিষ্ণু দত্ত। কিছু অছাত্র দর্শক সভায় এসে গোলমালের চেষ্টা করে, তাদের বক্তব্য মাহিনা বৃদ্ধি অভিভাবকদের বিষয়, ছাত্রদের এ সম্পর্কে কোন বক্তব্য থাকতে পারেনা। সভায় এই বক্তব্য পরিত্যক্ত হয় এবং মাহিনা বৃদ্ধির প্রতিবাদ করে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এরপরে যুবকদের সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। রবীন্দ্র, নজরুল, সুকান্ত প্রভৃতি কবিদের কবিতা আবৃত্তি এবং বাংলা সাহিত্য নিয়ে চর্চা শুরু হয়। বেশ কিছুদিন এই সংগঠন সক্রিয় ছিল। এক কথায় বলা চলা যে, এই সংগঠন কোন্নগরে প্রগতি সাহিত্য চর্চার পথিকৃত।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিশ বছর উদযাপন উপলক্ষে পাটনা শহরে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

ভূমিকা ঃ ফ্যাসিবাদের উত্থান ১৯২২ সালে ইতালীতে ফ্যাসিষ্ট রাজত্ব কায়েম হয় মুসোলিনির নেতৃত্বে এবং ১৯৩৩ সালে জানুয়ারীতে জার্মানীতে হিটলারের নেতৃত্বে নাৎসিবাদ। এরপর জাপান এদের সঙ্গে যোগ দিলে ত্রিশক্তির জন্ম হয়।

১৯৭৫ সালের ৪-৭ ডিসেম্বর ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের ত্রিশ বছর উদযাপন উপলক্ষে পাটনা শহরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে ভারত সহ সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সমবেত হয়। কোন্নগর থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি পাটনা শহরে গমন করেন।

উল্লেখ করতে হয় যে, সম্মেলনের পূর্বে কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে ফ্যাসিবাদের পরাজয়ে ১০, ২০ এবং ২৫ বছর উপলক্ষে কোন্নগর থেকে অনেকে যোগদান করেছিলেন। এবার ছিল ৩০ বছর উদযাপনের আন্তর্জাতিক সম্মেলন। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কংগ্রেস সভাপতি হেমকান্ত বড়ুয়া। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ জগন্নাথ মিশ্র। আর মূল আহ্বায়ক ছিলেন বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্র।

কোন্নগর থেকে যেসব প্রতিনিধি গিয়েছিলেন তাঁরা হলেন গোলাম মহীউদ্দীন, দীপক চক্রবর্তী, বিষ্ণু দত্ত, রেখা দত্ত প্রমুখ।

এখন ফ্যাসিবাদ বা নাৎসিবাদ সম্বন্ধে কিছু পূর্ব কথা এখানে বলা আবশ্যক, যাতে ফ্যাসিবাদ নবরূপে পৃথিবীর কোথাও পুনরায় আবির্ভূত হতে না পারে।

হিটলার ঘোষণা করেছিল যে, জার্মান জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি এবং সে সকলের উপর আধিপত্য করবে। ইহুদি জাতির উপর প্রথমেই উৎপীড়ন নেমে আসে

এবং ভিন্ন মত পোষণকারী ও যারা হিটলারের নাজি-পার্টির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে তারা জার্মানি থেকে বিতাড়িত হতে লাগল, এদের মধ্যে অনেক বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক যেমন, আইনস্টাইন, রেমার্কে প্রভৃতি। বার্লিনের প্রকাশ্য রাস্তায় পুস্তকের বহ্ন্যোৎসব হল। শতশত ইহুদি কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল।

এরপর একে একে আবিসিনিয়া স্পেন, তারপর অস্ট্রিয়া চেকোশ্লেভাকিয়া প্রভৃতির উপর আক্রমণ সংগঠিত হল ইতালী ও জার্মানীর দ্বারা। অবশেষে ১৯৩৯ সালে পয়লা সেপ্টেম্বর হিটলার কর্তৃক পোলাণ্ড আক্রান্ত হলে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এরপর অতি দ্রুত ঘটনা ঘটল। ফ্রান্সের বৃহত্তর অংশ সহ সমগ্র ইউরোপ দখল করল জার্মানি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

১৯৪১ সালে ২২ জুন হাজার হাজার ট্যাঙ্ক, রোমারু বিমান সহযোগে লক্ষ লক্ষ জার্মান সৈন্য সোভিয়েৎ ভূমিকে আক্রমণ করল। তখন সোভিয়েৎ রাশিয়া, ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং আমেরিকার মধ্যে চর্তুশক্তি চুক্তি হল। দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে কোটি কোটি মানুষের প্রাণের বিনিময়ে, শতশত নগর ক্ষেতখামার ও কলকারখানার ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে ফ্যাসিবাদের পরাজয় হল। ১৯৪৫ সালের ৭ মে রাইসস্টারের শীর্ষে লাল পতাকা উড়ল। এই যুদ্ধে সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষ জড়িত হয় আর ২ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে আহুতি দিতে হয়। (যার মধ্যে সোভিয়েতের নাগরিকদের সংখ্যা ২ কোটির মত)। হিটলার ব্যাঙ্কারে আত্মহত্যা করে। এই ভাবে ইউরোপে মানবতার পরম শত্রু ফ্যাসিবাদের/ন্যাৎসিবাদের পরাজয় ঘটল। আর ওই বছর আগষ্ট মাসে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকির শহর দু'টির উপর আনবিক বোমা নিক্ষেপের মধ্যে দিয়ে পূর্ব রণাঙ্গনে যুদ্ধ শেষ হোল।

একটা কথা এখানে অবশ্যই স্মরণ করতে হবে যে, হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রভৃতির প্রতিটি আগ্রাসনের ক্ষেত্রে যথা, আবিসনিয়া আক্রমণ, ইতালী কর্তৃক স্পেনের রিপাবলিকান সরকারকে আক্রমণ, জার্মানি-কর্তৃক চেকোস্লোভাকিয়া আক্রমণ প্রতিটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ বজ্র নির্ঘোষ করেছিল, এবং জাপানের চীন আক্রমণের সময়ে নেগুচিকে লেখা স্মরণে রাখার মত।

২০০০ সালের শেষে ফ্যাসিবাদের উত্থান-পতনের ইতিহাসকে স্মরণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক এই কারণে যে, ফ্যাসিবাদ নানারূপে ভারতসহ পৃথিবীর নানাস্থানে প্রকাশিত হচ্ছে, তাই এ সম্পর্কে সদা জাগ্রত থাকতে হবে। আর সেই কারণেই ১৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত পাটনা সম্মেলন সম্পর্কে এই বিস্তৃত বিবরণ।

সূত্র ঃ পুরাতন কাগজপত্র

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী আন্দোলন-১৯৫৬
ঃ কোন্নগর বাসীর ভূমিকা ঃ

ভূমিকা ঃ— যখন বিহারের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গে অন্তর্ভূক্তির জন্য বিভিন্ন মহল থেকে কথা বার্তা আন্দোলনের পর্যায়ে উন্নীত হল ঠিক সেই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ডা: বিধান রায় এবং বিহারের প্রধান মন্ত্রী ডা: শ্রীকৃষ্ণ সিংহ (তখন মুখ্য মন্ত্রী শব্দ চালু হয়নি) হঠাৎ বাংলা-বিহার সংযুক্তি করণের প্রস্তাব উত্থাপন করে। কিন্তু কেন তাঁরা এই প্রস্তাব করলেন তা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হল না। কারণ এর আগে শ্রী রামালুর আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে মাদ্রাজ প্রদেশকে বিভক্ত করে তেলেগু ভাষীদের জন্য আলাদা অন্ধ্রপ্রদেশ গঠন করা হয়ে গেছে। তাই এই সংযুক্তি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গে এক উত্তাল আন্দোলনের ঢেউ উত্থিত হয়।

এই প্রেক্ষিতে কোন্নগর পুরসভায় ২২.২.১৯৫৬ তারিখের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উত্থিত প্রস্তাবটি অনুরূপ —"Proposed by Ramendra Nath Mitra and Seconded by Bishnu Pada Dutta M C that where as contiguity" এর পূর্ণ অনুবাদ —"যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার এই দুটি রাজ্যের সংযুক্তির রায় সিংহপ্রস্তাব সরাসরি পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সাংস্কৃতিক সত্ত্বার উপর আঘাত এবং ভাষা সংস্কৃতি, ও সংলগ্নতা যা ভাষাভিত্তিক রাজ গঠনের মূলসুর এবং যা ভারতের মানুষ বিগত ৩০ বৎসর ধরে দাবি করে আসছে তার সম্পূর্ণ অস্বীকারের কারণ, যেহেতু রায় সিংহ প্রস্তাব দুই রাজ্যের জনগণের মধ্যে চিরস্থায়ী বিশৃঙ্খলা মতবিরোধ ও অনৈক্য সৃষ্টি করবে যার ফলে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য গঠনের পথে বিঘ্ন ঘটবে সেই হেতু কোন্নগর পুরসভার সদস্যগণ রায়-সিংহ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করছে এবং ভারত সরকারের কাছে দাবি করছে, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করা হউক ভাষা, সংস্কৃতি ও সংলগ্নতার ভিত্তিতে।'

প্রস্তাবের পক্ষে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন রমেন্দ্র মিত্র ও বিষ্ণু দত্ত। ও বিপক্ষে ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী, নগেন্দ্র নাথ মুখার্জী, ফণীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, সমর মিত্র, ও জ্যোতির্ময় মুখার্জী লিখিত নোটদেন। প্রস্তাব থেকে নিজেদের বিরত রাখেন ও প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তারপর পুরপ্রধান তারক দাস চ্যাটার্জী নানা যুক্তি দিয়ে প্রস্তাবকে সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে বিহারে জনসভায় খোলাখুলি বলা হচ্ছে এক ইঞ্চি পরিমান জমি পশ্চিমবঙ্গকে দেওয়া হবে না বিনা রক্তপাতে এবং সরকারী প্রশাসনকে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেখানে বাংলা ভাষাকে অবদমিত করা হচ্ছে এমন কি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে দেওয়া হচ্ছে না। তিনি আরো বলেন আলোচ্য প্রস্তাবটি পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অতুল্য ঘোষের খসড়া প্রস্তাবের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে। তৎসহ তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে বিগত ১২.১.৫৫ তারিখে এই পুরসভার বিশেষ সভায় প্রায় সর্বম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তা অনুরূপ ছিল। তাই তিনি সকলের নিকট আবেদন করেন যে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে।

এরপর প্রস্তাবের উপর ভোট লওয়া হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদেন রমেন্দ্রনাথ মিত্র, তারক দাস চ্যাটার্জী পুর প্রধান/অমিতাভ মুখার্জী উপপ্রধান, বিষ্ণুপদ দত্ত সদস্য/বলরাম পালিত বিপক্ষে ভোট দেন। ফণীন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী নগেন্দ্রনাথ মুখার্জী/ ডাঃ নীলমণি ব্যানার্জী, সমর মিত্র, জ্যোতির্ময় মুখার্জী (৫জন) পক্ষে ও বিপক্ষে ভোট সমান সমান হওয়ায় পুরপ্রধান প্রস্তাবেরপক্ষে কাষ্টিং ভোট দেন ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব গ্রহণের পুর্বে ও পরে সারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কোন্নগরও এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন হতে থাকে। কোন্নগরে এই আন্দোলনকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য শ্রী শিবশঙ্কর গাঙ্গুলী কে সভাপতি ও শ্রী শ্যামল মিত্রকে সম্পাদক করে দলমত নির্বিশেষে এক প্রতিনিধি মূলক কমিটি গঠন করা হয়। অঞ্চলে অঞ্চলে সভা হয়, শোভাযাত্রা হয়। এছাড়া এই উপলক্ষে যে নাটিকা লেখা হয় তা মঞ্চস্থ করা হয়। শ্রী বনমালী মুখার্জী 'নির্বান' রায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

এর পর পুরুলিয়া থেকে জননেতা অতুল ঘোষের নেতৃত্বে এক বিরাট

অভিযাত্রী দলের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা পথে কোন্নগর কালীতলা কলোনীর মাঠে এক বৃহৎ শিবির তৈরী করা হয়। তাদের রাত্রি বাস ও যথাযথ আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বিকালে 'চালকল মাঠে' (মনসা তলার নিকট) এক বিরাট জনসভা হয়। সভায় অভিযাত্রায় অংশ গ্রহণ কারী বিধায়ক প্রভৃতি নেতারা বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও জননেতা শ্রী গোপাল হালদার। সভায় প্রচুর লোক সমাগম হয়। যেখানে উদ্বোধন সঙ্গীত— "মোদের গরব মোদের আশা আমরি বাংলা ভাষা গাওয়া হয়।

এরপর অভিযাত্রী দল কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। সমিতির কর্মীরা বেলুড় পর্যন্ত তাদের সঙ্গে গমন করে। অভিযাত্রী দলকে সম্বর্ধনা জানানর জন্য ময়দানে যে ঐতিহাসিক সমাবেশ হয় তাতে লক্ষ লোক জমায়েত হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রী রামপুর আর এম ময়দানে যে সংযুক্তি বিরোধী সভা হয় তা থেকে নবগ্রামের নামদেক করের নেতৃত্বে এগারজন সত্যাগ্রহী কারাবরণ করেন তাঁদের হুগলী জেলে কারারুদ্ধ করা হয়। R.S.P নেতা শ্রী ননী মজুমদারও হুগলী জেলে বন্দী হয়েছিলেন।

অবশেষে এই আন্দোলন সফল হয় এবং রায় সিংহ প্রস্তাব বাতিল হয়। পুরুলিয়া জেলা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে সীমা সংলগ্ন কিষাণগঞ্জ সহ বাংলা ভাষী অনেক অঞ্চল যা ন্যায়ত পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হবার কথা তা বিহারে রয়ে গেল। তার কারণ ডা: বিধানরায়ের বৃহৎ ভূল। এছাড়া শোনা যায় রাষ্ট্রপতি শ্রী রাজেন্দ্র প্রসাদের অঙ্গলী লেহন ও।

প্রাক কথন ।। পূর্বকথা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমকালে ভারতের ঐক্য ও সংহতি অতি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় রূপে প্রতিভাত হয় এবং ঐ দুটি যে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তা স্বাধীনতা সংগ্রামীরা বুঝলেন। আর যেহেতু কংগ্রেস এই আন্দোলনের পুরোধা তাই ভারতে ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন অন্যতম কর্মসূচী রূপে গৃহীত হয়। এজন্য এক কমিটি গঠিত হয় পন্ডিত নেহেরু বল্লভভাই প্যাটেল, পট্টভি সীতারামাইয়া এঁদের নিয়ে তাঁরা রিপোর্ট পেশ করেন যা জে.ভি. পি রিপোর্ট নামে কথিত অবশ্য কংগ্রেস নিজস্ব

সংগঠনের কাজের জন্য আগেই প্রদেশ গুলিকে ভাষা ভিত্তিতে গঠন করে।

কিন্তু স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এই কাজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ফলে এই প্রশ্নে অসন্তোষ ধূমায়িত হতে থাকে এবং অবিভক্ত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এক দুর্বার আন্দোলন শুরু হয়ে যায় প্রখ্যাত গান্ধীবাদী নেতা শ্রীরামালু আমরণ অনসন শুরু করেন এবং প্রাণ বলি দেন। তখন পন্ডিত নেহেরু বাধ্য হন পৃথক মাদ্রাজ ও অন্ধ্রপ্রদেশ মেনে নিতে অন্যান্য প্রদেশে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। তখন ফজল আলী (সুপ্রিম কোর্টের বিচার পতি) হৃদয়নাথ কুন্তুরু ও সর্দার কে এম পানিকারকে নিয়ে তিন সদস্যের এক কমিশন গঠিত হয়।

অনেক টালবাহানার পর অখন্ড বোম্বাইকে ভেঙে দুটি প্রদেশ মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের সৃষ্টি হয়। পরে হরিয়ানা এবং পাঞ্জাব (যুক্ত রাজধানী চন্ডীগড়-এর অন্তিম সিদ্ধান্ত স্থগিত আছে)

এর পর আসে বিহারের বাংলা ভাষা ভাষী অঞ্চলকে পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত করার প্রশ্ন। রাজ্য পূর্ণ গঠন কমিশনের কাছে জোরাল দাবি উত্থাপন করা হয় যথা বিহিত ভাবে। এই আন্দোলনে অনেক গুলি যুক্তির মধ্যে একটা অতিরিক্ত যুক্তি ছিল দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে অনেক কম এলাকা আসে তার উপর পূর্ব বঙ্গথেকে দলে দলে উদ্বাস্তু আগমন অবস্থাকে জটিল করে তুলে এই সমস্যার কিছুটা এর ফলে লাঘব হবার সম্ভাবনা হবে।

কিন্তু এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ পশ্চিমবঙ্গের ডাঃ বিধান রায় এবং বিহারের ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ প্রধান মন্ত্রীদ্বয় (তখন মুখ্যমন্ত্রী শব্দের প্রচলন হয়নি) বাংলা বিহার সংযুক্তির এক অদ্ভূত প্রস্তাব ঘোষণা করলেন— (তাঁদের নিজেদের মধ্যে কিন্তু পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস বজায় রেখেই) আশঙ্কা হয় এই সর্বনাশা সংযুক্তি প্রস্তাবের ফলে বহু গৌরবে গরীয়ান বাংলা বিহারের জাতি সত্ত্বার বিলোপ সাধন করবে, অন্যদিকে বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে সহযোগী প্রতিবেশী মূলক সম্পর্কের পরিবর্তে চিরন্তন বিভেদের বীজ

জিইয়ে রাখবে। বাঙালী ও বিহারীদের মধ্যে নিরন্তর আত্মকলহ সৃষ্টির ফলে উভয় জাতির আর্থিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে।

কিন্তু মানুষ এই প্রস্তাব মেনে নিল না। তার পূর্ণ বিবরণ ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। তবে এই প্রস্তাব ডাঃ বিধান রায়ের মত বিচক্ষণ মানুষ কেন পেশ করলেন সেটা এখনও কি রহস্য ঘেরা থেকে যাবে! কেউ এর উপর আলোক পাত করবে না। এটা একট বড় প্রশ্ন।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

সূত্র — (১) বাংলা-বিহার সংযুক্তি বিরোধী

শ্রমিক সমাবেশ স্থান ঃ- শ্রীরামপুর

(২) কোন্নগর পুরসভার ১২.১.৫৫ ও ২২.২.৫৬ দুইটি তারিখের অধিবেশনের কার্য্যাবলী

(৩) ১২ জুলাই দেশ পত্রিকার শঙ্কর ঘোষের প্রবন্ধ

কোন্নগরে স্বাধীনতা আন্দোলন

(সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত, সমাজকল্যাণমূলক অভিঘাত/প্রভাব জীবনবোধ ও জীবন জিজ্ঞাসা)

ঊনবিংশ শতাব্দীর মণীষীগণ যথা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, শিবচন্দ্র প্রভৃতি এবং রাজনৈতিক নেতা যথা সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, বিপিন পাল এবং পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর দুয়ের দশকে মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রমুখের আদর্শ ও কর্মধারা কোন্নগরের যুবকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল—ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো।

সেই কাবণে তখন যারা স্কুলে-কলেজের ছাত্র বা যারা কর্মক্ষেত্রে সবে মাত্র প্রবেশ করেছে—তারা অভিঘাতে নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়। এঁরা শিক্ষা প্রচার, সমাজ কল্যাণমূলক কাজ ও সাহিত্য সেবায় নিজেদের ব্যাপৃত করেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নৃসিংহদাস বসু, ডাঃ চন্ডী চরণ ঘোষাল, হরিচরণ চ্যাটার্জী, অতুল চন্দ্র গাঙ্গুলী, নিবারণ চন্দ্র মিত্র, মলয় দেব প্রভৃতি রিষড়া-কোন্নগর পুরসভার মাধ্যমে নাগরিক জীবনের নানা সমস্যা সমাধানে ব্যাপৃত ; আবার রামধন দেব, শরৎকুমার দেব, রামদুলাল দেব, রাধিকা নাথ বসু, কিশোরীমোহন ঘোষাল, জ্যোতিষ চন্দ্র গাঙ্গুলী, বিপিন বিহারী চন্দ্র, নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, ননীগোপাল বসু, ললিত মোহন ঘোষাল, বিজলী বসু, পীতাম্বর চ্যাটার্জী, গোপাল বসু, সত্যচরণ মুখার্জী, হরিসত্য ভট্টাচার্য প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার বা খেলাধূলা প্রতিষ্ঠান বা সমবায় ব্যাঙ্ক বা সাহিত্যসেবায় নিজেদের নিয়োজিত করেন। উপরে উল্লিখিত ব্যক্তিগণ যাঁদের জন্ম ১৮৮৪ সালের আগে-পরে তাঁরাই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নানা কর্মযজ্ঞে জড়িত হন। এঁদের পরে যারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁরা এঁদের অনুগামী হন। এই ভাবে স্রোতধারা অব্যাহত থাকে—নূতন নূতন যুবগোষ্ঠী এঁদের অনুগামী হন এবং সারা বিংশ শতাব্দী জুড়ে এরাই কোন্নগরের কর্মী ও নেতা হন। এঁদের সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় বর্তমান কোন্নগর গড়ে উঠে। এই সঙ্গে আরো

একটা প্রসঙ্গ এসে পড়ে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেক মানুষ কোন্নগরে আগমন করেন। তাঁদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি কোন্নগরের নানা অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন এবং কোন্নগর জনজীবনে তাঁদের অবদান রাখেন।

এর পর বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যে সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা ঘটে যথা—

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন

১৯১৯ সালে জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকান্ড (এই ঘটনার পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক নাইটহুড পদবী ত্যাগ)

১৯২০-২১ অসহযোগ আন্দোলন

১৯২৯ সালে সাইমন কমিশন হয়

১৯৩০ সালে সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল

১৯২৯ সালে ভগৎ সিংয়ের ফাঁসী

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলন ও লবন আইন ভঙ্গ ও ২৬শে জানুয়ারী পূর্ণ স্বাধীনতার সংকল্প ঘোষণা—

এই রাজনৈতিক ঘোষণা সমূহ তার সুদূর প্রসারী প্রভাব পড়ে কোন্নগরের জনজীবনে বিশেষ করে যুবকদের উপরে।

এই সকলের মিলিত প্রভাবে নানা অঞ্চলে ব্যায়াম সমিতিগুলি গড়ে উঠে ; নৈশবিদ্যালয়গুলি গড়ে উঠে, উত্তরবঙ্গে (১৯২৪ সালে) বন্যার্তদরে জন্য সাহায্য সংগ্রহ ; তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সহায়তা প্রদান ; চরকা কাটা ও খদ্দর পরিধান, মদের দোকানে পিকেটিং করে গ্রেপ্তারবরণ ; কাঁথিতে সমুদ্রতীরে লবন আইন ভঙ্গ করে গ্রেপ্তারবরণ ও কারাবাস ; তৈয়ারী লবন বিক্রয়ার্থে যে শোভাযাত্রা হয় সেখানে রণধ্বনি উঠে— "লাল টুপি আর খাঁকির কোর্তা—জুজুর ভয় কি আর চলে" ; বিদ্যালয়ে পিকেটিং ও ক্লাস বর্জন। এই সময়ে অনেক বেআইনী পুস্তক পাঠ করত যুবকগণ এবং নানা অঞ্চলে গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজ হয় ; ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে বৃটিশ কর্তৃক কৃষকদের উপর অসহনীয় ঋণের বোঝার কথা প্রচার হত।

এর কিছু পূর্বে সাহিত্য চর্চা শুরু হয় নানা অঞ্চলে—কবিতা লেখা, প্রবন্ধ রচনা, বিতর্ক সভা প্রভৃতি—এই সাহিত্যসভাগুলির কর্মসূচী ছিল এবং হাতে

লেখা পত্রিকারও উদ্ভব হয়—

এই ধরণের চর্চার জন্য ও পঠনপাঠন (বিদ্যালয় বহির্ভূত) এর জন্য নানা পাঠগার স্থাপনা হয়েছিল—যথা দক্ষিণ পাড়ায় বয়েস লাইব্রেরী, এস সি চ্যাটার্জী স্ট্রীটে সরস্বতী লাইব্রেরী। সেই সমস্ত লাইব্রেরীতে রাখা হত বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধাদের ও বিপ্লবীদের কাহিনী—যথা ডি ভ্যালেরা, ম্যাকসুইলী, ট্রটস্কী, লেলিন, সান-ইয়াৎ সেন, কামাল পাশা, জগলুল পাশা, নিগ্রোজাতির কর্মবীর (বুকারটি ওয়াশিংটন) স্বাধীনতার সপ্তসূর্য, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডী—এর সঙ্গে থাকত গোর্কির মা অনুবাদ (নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষিপ্ত অনুবাদ)।

বিশের দশকে নিবারণ মিত্র ও ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে কংগ্রেস গড়ে উঠে এবং অনেক যুবক সমবেত হয়। সেই সময়ে কোন্নগরে স্বদেশী আন্দোলন মারফৎ এই কংগ্রেস গড়ে উঠে। তার কার্যক্রম—চরকা কাটা, খদ্দর পরিধান, বিদেশী দ্রব্যাদি বয়কট। মদের দোকানে পিকেটিং করে প্রবোধ রায় (ভোলা) গ্রেপ্তার বরণ করে। কাঁথিতে লবন আইন ভঙ্গে অংশ গ্রহণ করে কারারুদ্ধ হয় বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ননীগোপাল চট্টোপাধ্যায় (পচা) এবং রাধা রমণ মুখার্জী (ট্যারা) এঁরা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যখন কোন্নগর স্টেশনে অবতরণ করেন তখন স্টেশনে এঁদের মালা দেন বহু যুবক (এটা লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা)

জাতীয় পতাকা উত্তোলনের দ্বারা আইন ভঙ্গ ও অন্যান্য বেআইনী কার্যকলাপের জন্য গ্রেপ্তার বরণ করেন রাজকৃষ্ণ মিত্র, বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ (বেচা) শম্ভুনাথ মল্লিক। দেশ স্বাধীন হলে এঁদের তাম্রপত্র দ্বারা ভূষিত করা হয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম সতীশ দাস নানা বেআইনী ও স্বদেশী কার্যের জন্য দীর্ঘ কারাবাস করেন। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম উল্লেখ করা দরকার—তিনি হচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ রায় (পচা) ইনি গোপন কার্যকলাপের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

এছাড়া স্বদেশী প্রচারের জন্য ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে নানা কার্যসূচীও পালিত হত। আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৩২-৩৩ সালে যতীনদাশের দীর্ঘ অনশনে জেলখানায় মৃত্যু বরণের ঘটনায় কোন্নগরে ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে আলোড়ন উঠে। বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদ্যালয়ের গেটে পিকেটিং করে।

১৯৪২ সালে ভারতছাড়ো আন্দোলনে ঢেউ কোন্নগরে এসে লাগে। নানা ভাবে প্রতিবাদ সংঘটিত হয়।

পূর্বে যেকথা বলা হয়েছে সেটা ভাল করে ব্যাখ্যা করা দরকার (পুনরাবৃত্তি হচ্ছে স্বীকার করে নিয়েও)

কোন্নগরে যে সমস্ত বিশিষ্ট (প্রাতঃস্মরণীয়) ব্যক্তিদের জন্ম ১৮৮৪ থেকে ১৯৮৪-এর মধ্যে এবং যাঁরা কোন্নগর উচ্চবিদ্যালয় ও হিন্দু বালিকা উচ্চ-বিদ্যালয় ছাড়া আরো অন্যান্য ৫টি বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন অথবা অন্য স্থান থেকে কোন্নগরে এসে বসবাস করেছেন—তাঁরা সকলেই কোন্নগরের শিক্ষা-সংস্কৃতি-খেলাধূলাসহ জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন ও অবদান রেখে গেছেন ও এখনও রাখছেন সেই বিরাট সংখ্যক মানুষের সমবেত আত্মনিয়োগে আধুনিক বিংশ শতাব্দীর কোন্নগর গড়ে উঠেছে এবং যাঁরা কোন্নগরের অধিবাসী না হয়েও কোন্নগরকে তাঁদের কর্মক্ষেত্র রূপে বেছে নিয়েছেন। (আবার অনেকে কোন্নগরে শিক্ষা গ্রহণ করে কোন্নগরের বাহিরে ও ভারতের নানা স্থানে আপন কর্মধারা প্রসারিত করেছেন)। কোন্নগরের অধিবাসী নন এমন অনেক রাজনৈতিক নেতা যথা, অধ্যাপক নৃপেন্দ্র ব্যানার্জী, বিষ্ণু ব্যানার্জী, হৃষিকেশ চ্যাটার্জী, পাঁচু ভাদুড়ী, অজিত বসু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ কোন্নগরের যুবকদের রাজনীতিতে দীক্ষিত করেছেন।

বহু বিশিষ্ট ও প্রখ্যাত কবি, সাহিত্যিক, বিদ্বৎজন, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতা কোন্নগরে পদার্পণ করেছেন (এ তালিকা খুবই দীর্ঘ)।

বিষ্ণু দত্ত

———————

বিশ্বশান্তি ও সংহতি আন্দোলনে কোন্নগরের অবদানের

বিশ্ব মণীষী রম্যাঁ রলাঁ তাঁর "শিল্পীর নবজন্ম" গ্রন্থে লেখা আরম্ভ করেছেন এই ভাবে— "যুদ্ধ শেষ হল কিন্তু শান্তি আসিল না আমার"। একথা লেখার কি কারণ? প্রথমতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে যে ভার্সাই সন্ধি হয়েছিল সেই সন্ধির মধ্যেই নিহীত ছিল আর একটা যুদ্ধের বীজ। যার প্রমাণ পাওয়া গেল মাত্র ২০ বছরের মধ্যেই। ১৯৩৯ সালের পয়লা সেপ্টম্বর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। আর ১৯৪৫ সালের মে মাসে বার্লিনে রাইখস্টারের শীর্ষে রেড আর্মি কর্তৃক লাল পতাকা উত্তোলন আর ঐ বৎসরেরই ৬ ও ৯ আগষ্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আমেরিকার বোমারু বিমান থেকে পরমানবিক বোমা বর্ষণেরে মধ্যে দিয়ে যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু ইউরোপের রণাঙ্গনে যে সৈন্য ও নাগরিকরা নিহত হয় ও ক্ষেতখামার, কলকারখানা, বিদ্যালয় প্রভৃতি ধ্বংস হয় তার সংখ্যা অভূতপূর্ব ও নজীরবিহীন ; আর জাপানে মুহূর্তের মধ্যে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু হল। এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পরমানবিক বোমার একচ্ছত্র অধীশ্বর হল—সেই সময়ে শান্তিকামী পৃথিবীর কাছে এক মহা বিপদ উপস্থিত হল।

এই পরিস্থিতিতে যারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, কবি প্রভৃতির পক্ষ থেকে কয়েকজন ১৯৪৯ সালে প্যারিসে মিলিত হন—এদের পুরোধা ছিলেন জালিওকুরি, জে ডি বার্নাল, ভারতের রমেশ চন্দর প্রভৃতি। তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন যে, আনবিক বোম নির্মাণ নিষিদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর কোটিকোটি মানুষের সই সংগ্রহ করা হবে। আর জালিও কুরিকে সভাপতি করে বিশ্ব শান্তি সংসদ গঠিত হল। শান্তি প্রতীক শ্বেত পারাবত আঁকলেন বিখ্যাত শিল্পী পিকাসো। দেশে দেশে শান্তিকামী মানুষদের সম্মেলন থেকে জাতীয় শান্তি কমিটিগুলি গড়ে উঠল।

এই সময়ে ২৪-২৭ নভেম্বর ১৯৪৯ সালে কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে

সারাভারত শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। সেখানে কোন্নগরের শান্তি কমিটির প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। প্রথম দিনের অধিবেশনে বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা চক্করাই চেট্টিয়ার সভাপতিত্ব করেন। অধিবেশন শেষে ময়দানে বিরাট সমাবেশ হয়। এই সম্মেলনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে শান্তি আন্দোলনের পক্ষে বিরাট সাড়া পাওয়া যায়।

১৯৫১ সালের এপ্রিলে দ্বাদশ মন্দিরে শান্তি কমিটির ডাকে প্রথম জনসভা হয়। সভাপতি হন বিখ্যাত সাহিত্যিক গোপাল হালদার। আবৃত্তি সঙ্গীত পরিবেশন করেন—উৎপল দত্ত, পরেশ ধর, আর অরুণ প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকেন।

কিছুদিন পারে এই দ্বাদশ মন্দিরেই একসভায় বিখ্যাত জার্মান শান্তি নেতা ম্যাক্সমিলিয়ান সিয়ার বক্তৃতা করেন ও উদ্বোধনি সঙ্গীত হয়—"তোমার দুয়ার খোলার ধ্বনি ঐ গো বাজে" পরিবেশন করেন রেখা দত্ত।

এর পর মে ১১—১৩.১৯৫১. সালে বোম্বাই শহরে সারা ভারত শান্তি কনভেনসন অনুষ্ঠিত হয়। কোন্নগর থেকে প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দেন গোলাম মহীউদ্দীন। সেখানে ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ যথা— ডাঃ এম. অটল, ডাঃ সফীউদ্দীন কিচলু, পৃথ্বীরাজ কাপুর, পন্ডিত সুন্দরলাল, অনিল বিশ্বাস, অধ্যাপক ডি ভি কোশাম্বী, ডাঃ মুলক রাজ আনন্দ, বাবা সোহন সিং ভাকনা প্রভৃতি সভাপতি মন্ডলীর সদস্য হন। সাধারণ সম্পাদক হন কৃষণ চন্দর।

ইতিমধ্যে ১৯৫২ সালে কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গণে শান্তি কমিটির ডাকে এক সভা হয়। সেখানে অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখার্জী শান্তি আন্দোলনের গুরুত্বের উপর বক্তব্য রাখেন। সেখানে আনবিক বোমা নিষিদ্ধ করণের আবেদনে অধিক সই সংগ্রহের জন্য গঙ্গানারায়ণ চ্যাটার্জীকে পুরস্কার প্রদান করেন সভাপতি তারকদাস চট্টোপাধ্যায়।

৯-৯-১৯৬২ সালে কোন্নগর হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ে শান্তি কমিটির সভাপতি অমিতাভ মুখার্জী ও যুগ্ম সম্পাদক গঙ্গানারায়ণ চ্যাটার্জী ও বলাই বন্ধু বসুর আহ্বানে যে সভা হয় তাতে সভাপতিত্ব করেন বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৯-৯-১৯৬৩ তারিখে বলাইবন্ধুর বাড়ীতে শান্তি সংসদের কনভেনসন

হয়। সভাপতি হন দুর্গা বসু। বক্তা পশ্চিমবঙ্গ শান্তি সংসদের নেতা অধ্যাপক কল্যাণ দত্ত।

১৯৬৯ নভেম্বরে অমৃতসহরে সারা ভারত শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে নাট্যকার মন্মথ রায়, দিলীপ বসু প্রভৃতি ও কোন্নগর থেকে বিষ্ণু দত্ত, গোলাম মহীউদ্দীন, রেখা দত্ত, সমীর চ্যাটার্জী, প্রদীপ দাশগুপ্ত প্রভৃতি যোগদান করেন। অনেক বিদেশী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শান্তি আন্দোলনের নেতাদের সামনে রেখে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহর পবিক্রমা করে। জালিয়ানওয়ালাবাগে শহীদ স্মারকে মাল্য অর্পন করা হয়।

১৯৭৩ অক্টোবর মস্কো সহরে World Congress of Peace forces অনুষ্ঠিত হয়। বিষয়গুলি ছিল—আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, নিরস্ত্রীকরণ, জাতীয় স্বাধীনতা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও শান্তি।

সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বশান্তি সংসদের মহাসচিব রমেশ চন্দ্র। ভারত থেকে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন চিত্ত বিশ্বাস, পেরিন রমেশচন্দ্র, অম্বিকা সোনী, সুচিত্রা মিত্র, সুপ্রভাত মুখার্জী, ধীরেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে। হল অব কংগ্রেসে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৪টি কমিশনে ভাগ হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আলোচনা হয়। অবশেষ ঐগুলির রিপোর্ট প্লেনারি সেসনে উপস্থাপিত হয় এবং একটি ঘোষণা গৃহীত হয়—**বিশ্বের মানুষের কাছে আবেদন**।

কোন্নগর থেকে প্রতিনিধি ছিলেন বিষ্ণু দত্ত। মস্কো সম্মেলন থেকে প্রত্যাগত বিষ্ণু দত্ত সহ অন্যান্য প্রতিনিধিদের ২৫-১১-১৯৭৩ তারিখে সংবর্ধনা জানানো হয় কোন্নগর টাউন হলে। আহ্বায়ক শান্তি ও সংহতি সংসদের সম্পাদক কালি প্রসাদ ব্যানার্জী ও বিমান মাঝি। সভায় মস্কো সম্মেলনের বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করেন অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে, হরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণু দত্ত।

১৯৭৫ সালে যে স্টকহোম আবেদন প্রচার করা হয় এবং যাতে স্বাক্ষর সংগ্রহের আবেদন করা হয় তাতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ছয়টি দাবি রাখা হয়।

পরিশিষ্টতে বক্তব্য হচ্ছে—শান্তি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সালে আনবিক বোমা নিষিদ্ধকরণের জন্য সাক্ষর সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। সেই সময়ে একটা প্রশ্ন উঠেছিল একটা সাক্ষর করে যুদ্ধবাজদের হাতে মজুদ বোমার হাত

থেকে কি মানুষকে রক্ষা করা যাবে? তখন তার জবাবে শান্তি সৈনিকদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল একটা সাক্ষর—শান্তির দৃঢ় সমর্থন ও যুদ্ধের প্রতি ধিক্কার এবং পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যখন একটা আবেদনে সাক্ষর করে তখন যে প্রচন্ড শক্তির উন্মেষ হয় তাকে সহজে স্তব্ধ করা যায় না। এটা ত আরম্ভ মাত্র এর পর দেশে দেশে আর্ন্তজাতিক স্তরে প্রথিতযশা লেখক কবি বিজ্ঞানীদের উদ্যোগে শতশত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণ প্রভৃতি বিষয়কে কেন্দ্র করে তখন ধ্বংসের শক্তি নিরস্ত হয়। আর এর ফলশ্রুতি হিসাবে প্রতীয়মান হল—১৯৪৫ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত কোন বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। (যদিও অনেক আঞ্চলিক যুদ্ধ হয়েছে) আর এখনও বহু রাষ্ট্রের হাতে বহু সংখ্যক মারণাস্ত্র—হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি—জমা রয়েছে এবং তা দিয়ে কয়েকবার পৃথিবীকে ধ্বংস করা যায় (সেগুলিকে ধ্বংস করার জন্য C T B T তে সকলে মিলে সই করার কথা চলছে।

এই হচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী শান্তির জন্য সংগ্রামের কাহিনী ও তাৎপর্য। এই সঙ্গে কোন্নগরে অনুষ্ঠিত শান্তি আন্দোলনের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হল।

বিষ্ণু দত্ত

সূত্র ঃ বিভিন্ন ইস্তেহার, আবেদন ও রিপোর্ট।

———————

গ্রন্থাগার আন্দোলনে পুস্তক মেলার ভূমিকা

প্রখ্যাত প্রবন্ধকার গিইকী 'Reading of Books' এ বলেছেন—একজন পণ্ডিত ব্যক্তি যখন বক্তৃতা করেন তখন তাতে অনেক শিক্ষণীয় সারবস্তু থাকতে পারে। কিন্তু যখন তিনি পুস্তক রচনা করেন তখন তিনি লেখার পূর্বে গভীর ভাবে চিন্তা করে নেন, আর বিষয়গুলিকে সাজিয়ে নেন। তাই তাঁর পুস্তকে যা লেখা থাকে তা অধিক বিন্যস্ত ও শিক্ষণীয় হয়, আর তার মধ্যে গভীরতা থাকে। তাই লেখকের বক্তৃতা শোনার থেকে ঐ বিষয়ে তাঁর লেখা পুস্তক পাঠ অধিকতর উপযোগী যা অন্তরের গভীরে স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। দ্বিতীয়তঃ পাঠক তা বার বার পাঠ করতে পারে—বিষয়টি তার সামনে অক্ষরে বন্দী হয়ে রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ "লাইব্রেরী" প্রবন্ধে লিখেছেন—"শঙ্খের মধ্যে। যেমন সমুদ্রের স্বাদ শুনা যায়, তেমনি লাইব্রেরীর মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শব্দ শুনিতেছি। এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও প্রতিবাদ এখানে দুই ভাইয়ের মতো একসঙ্গে থাকে। সংশয় ও বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিষ্কার এখানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।

"কত নদী সমুদ্র পর্বত উল্লঘন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে—কত শত বৎসরের প্রান্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।"—১১৯২ পৌষ—

প্রাচীন যুগে যখন অক্ষরের তথা পুস্তকের সৃষ্টি হয়নি তখন জ্ঞান বিদ্যা কণ্ঠ দ্বারা শ্রুতির মাধ্যমে বিতরিত হ'ত। তারপর অক্ষর সৃষ্টি হলে হাতে লেখা পুঁথিতে সেই সমস্ত সম্পদ আহৃত থাকত ; আর মানুষ পাঠ দ্বারা তাকে অর্জন করত। কিন্তু ব্যাপক-সংখ্যক মানুষের কাছে তা পৌছতে পারত না। আর পুঁথি নকল করার সময় লিপিকার তাতে নিজস্ব মত প্রক্ষিপ্ত করে দিত। তখন (Copy right) ছিল না। তারপর একদিন ছাপাখানার আবির্ভাব ঘটল, আর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান পুস্তকের মাধ্যমে দুরন্ত বেগে ছড়িয়ে পড়ল।

বর্তমান পৃথিবীর নানা দেশে গ্রন্থাগারগুলিতে কোটি কোটি পুস্তক আহৃত রয়েছে। (আর পুস্তক সংরক্ষণে স্থান সঙ্কুলনের জন্য মাইক্রো ফিল্মের ব্যবহার শুরু হয়েছে)।

অনেক পরে বেতার যন্ত্রের আবিষ্কারের ফলে ইহা জ্ঞান বিতরণের এক মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হল। কিন্তু পুস্তক পাঠের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারল না। আর তখন বেতার যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। কিন্তু সম্প্রতি আর একটি শক্তিশালী মাধ্যম, ইলেকট্রনিক মাধ্যম, দূরদর্শনের আবির্ভাবের পর পুস্তকের এক ক্ষমতাবান প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঘটল। আর এখন দূরদর্শন ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। ফলে এই প্রশ্ন উঠেছে—দূরদর্শন কি পুস্তককে হটিয়ে দেবে; দূরদর্শন কি গ্রন্থের বিকল্প ! এ সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও বিতর্ক চলছে বিদ্বাৎ সমাজে। লেখকের মনে পড়েছে গত বর্ষের আগের বর্ষে কলকাতার বই মেলার একটা বিতর্ক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে নানা খ্যাতনামা পণ্ডিত এই বিষয়ের উপর বক্তৃতা দেন। ঐ সভার একজন বিদগ্ধ বক্তা, সম্ভবতঃ কোন কলেজের অধ্যাপক, জোরের সঙ্গে বলেছিলেন—দূরদর্শন পুস্তক পাঠের বিকল্প কোন ভাবেই হবে না। সভায় অন্য বক্তা অবশ্য বলেছিলেন—পুস্তক পাঠ বা গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনেক কমবে।

এখন বঙ্গদেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের কিছু ইতিহাস দেওয়া হচ্ছে—

১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়।

১৮৩৫ সালে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী স্থাপনা (যা পরে জাতীয় গ্রন্থাগারে পরিণত)।।

আরো কয়েকটি প্রাচীন ও নামী গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে—

রামমোহন লাইব্রেরী

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার।

কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগার।

উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক গ্রন্থাগার

বাঁশবেড়িয়া পাবলিক লাইব্রেরী

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কয়েকজন মণীষী রামমোহন—ডিরোজিও—বিদ্যাসাগর, শিবচন্দ্র প্রমুখ বাংলার নবজাগরণের নেতৃগণ জ্ঞান-

বিজ্ঞান ক্ষেত্রে যে আলোড়নের সৃষ্টি করেন তার ফলে নূতন নূতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারসমূহ গড়ে উঠতে থাকে। বাংলাদেশ জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে ও ধীরে ধীরে জাতির জীবনে সর্বক্ষেত্রে—সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনীতির ক্ষেত্রে নব নব প্রচেষ্টার শুরু হয়। শিক্ষা বিস্তারের এই প্রচেষ্টার মেলবন্ধন ঘটে।

তারপর আমরা যদি এই শতাব্দীর বিশের দশকে উপনীত হই তাহলে দেখতে পাব জাতীয় আন্দোলনের নূতন জোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আর তারই পাশাপাশি শহরে গ্রামে গ্রন্থাগারের জন্ম। বস্তুতঃ বলা চলে জাতীয় জাগরণ ও গ্রন্থাগারকে ঘিরে পঠন-পাঠন একে অপরকে প্রভাবিত করে। সেই সময়ের গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলির নাম দেখলেই একথার সত্যতা প্রমানিত হয়—ডি ভ্যালেরা নিগ্রোজাতির কর্মবীর (বুকারটি ওয়াশিংটন) গ্যারিবল্ডী, ম্যাটসিনি, কামাল পাশা, সান ইয়াৎ সেন, ফাঁসীর সত্যেন, লেনিন, ট্রটস্কি, জগলুল পাশা প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থ এবং আঙ্কল টম্‌স্ কেবিন, ম্যাক্সিম্ গোর্কীর মা প্রভৃতি উপন্যাস। এরপর ত্রিশের দশকে যখন জাতীয় কংগ্রেসের আহ্বানে দিকে দিকে আইন অমান্য ও অন্যদিকে শ্রমিক তথা কমিউনিষ্ট আন্দোলন—তখন নূতন নূতন গ্রন্থাগারও সাহিত্য তথা সংস্কৃতি কর্ম্মকান্ডের উত্তাল তরঙ্গ। এর পর যদি একেবারে সাম্প্রতিক কালে আসি তাহলে দেখতে পাব যে, সরকার স্বীকৃত টাউন লাইব্রেরী ও এরপর সরকার পোষিত শহর ও গ্রামাঞ্চলের বহু নূতন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই পরিবেশে যদি ঠিকমত সরকারী শাসন যন্ত্র সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলে এই গতি অব্যাহত থাকবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। দূরদর্শনের প্রচারের অভিঘাত বা প্রভাব নির্বিশেষে কিন্তু এখন পঠন পাঠন নিম্নগতি। তার কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে অনেক দিক উল্লেখ করতে হয়। দেশের আর্থসামাজিক পরিবেশে বর্তমানে পঠন-পাঠন ও বিদ্যাচর্চা এখন নিম্নগামী—অন্ততঃ গভীরতার দিক দিয়ে। শিক্ষায়তন গুলিতে নিবিড় ভাবে বিদ্যা সংস্কৃতি চর্চা বিশেষ করে পাঠ্য পুস্তক বহির্ভূত বিদ্যাচর্চার উৎসাহ ক্ষীয়মান, লিটারারী সোসাইটিগুলির কার্যকলাপ স্তিমিত। অন্যদিকে যার যার বিদ্যার ক্ষেত্র তাতে সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা এবং বিচিত্র জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিচরণে অনীহা। উদাহরণ, সাধারণভাবে

একজন ডাক্তার নিজ পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জগতের বাইরে যেতে চান না ইত্যাদি ইত্যাদি। এই অবস্থায় পরিবর্তন করতে হলে সাধারণ গ্রন্থাগার বিদ্যায়তন সংলগ্ন গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকদের সক্রিয় হতে হবে, গা ভাসিয়ে স্রোতের সঙ্গে চললে হবে না। আর সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত লিটারারী সোসাইটি আছে তাদের কোমর বেঁধে লাগতে হবে। যুগপত শিক্ষক সমাজকেও উদ্যোগী হতে হবে। যেমন তাঁরা হয়েছিলেন এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে। তবেই সাধারণ মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করা যাবে।

এই প্রসঙ্গে আবার রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করছি "লাইব্রেরীকে ব্যবহার করতে গেলে লাইব্রেরীর পরিচয় সুস্পষ্ট ও সর্বাঙ্গ সুন্দর হওয়া চাই। নইলে তার মধ্যে প্রবেশ চলে না। সে এমন একটা শহরের মত হয়ে ওঠে যার বাড়ী ঘর বিস্তর কিন্তু পথ ঘাট নেই।

" কিন্তু লাইব্রেরীর নিজের একটা ছায়া আছে। আর সে তার সম্পদের ছায়া। যেহেতু তার বই আছে, সেইহেতু বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে সে যে ডাক দিতে পারে। কেননা, অন্নষ্টং যন্নদীয়তে।"—১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

কি বই পড়তে হবে সে সম্বন্ধে লেখকের ৬০ বৎসরের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলা হচ্ছে। এ কথা ঠিক যে বেশীর ভাগ পাঠক গল্প উপন্যাস (গোয়েন্দা কাহিনী-সহ) পড়েন। অল্প সংখ্যক পাঠক সিরিয়াস বিষয় বস্তু—যথা প্রবন্ধ, জীবনী, সমালোচনা প্রভৃতির পুস্তক পাঠ করেন। আর একটা কথা চালু আছে-সেটা হচ্ছে—পাঠকের রুচি। এই পাঠকের রুচির নাম করে হালকা ধরণের পুস্তকসমূহ ক্রয় করা হয়। কিন্তু দেখা গেছে গ্রন্থাগারের সংগঠকগণ ও সাহিত্য সভাগুলি চেষ্টা করলে কিছু সংখ্যক পাঠকের রুচিকে পরিবর্তিত করতে পারে। তবে সে চেষ্টা নিরবিচ্ছন্ন হতে হবে। এ প্রসঙ্গে 'রবীন্দ্রনাথে'র উক্তি খুবই প্রাসঙ্গিক।

এখন গ্রন্থমেলার ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বেসরকারী রাজ্য গ্রন্থমেলার শুরু ১৯৭৪সাল নাগাদ কলকাতায়, আর সরকারী গ্রন্থমেলা শুরু হয়েছিল ১৯৮১ সালে—এখন তার বদলে জেলা গ্রন্থমেলাগুলি শুরু হয়েছে—যেমন ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারী ৭-১৩ একাদশ হুগলী জেলার গ্রন্থমেলা শুরু হতে চলেছে। গ্রন্থমেলাগুলি বর্তমানে শিক্ষা সংস্কৃতি তথা সারস্বত

জগতে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে আসছে ও বাঙালীর জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। গ্রন্থমেলাগুলি লেখক-পাঠক-প্রকাশক-গ্রন্থাগারের মিলনক্ষেত্র রূপে কাজ করে—বিশেষ করে জেলা বই মেলাগুলি। এর ফলে গ্রাম বাংলার নবসাক্ষররা, গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলির পরিচালকরা, গ্রন্থাগার কর্মীরা তথা গ্রামবাসীরা বিদ্যাচর্চার মহোৎসবে শরিক। নূতন নূতন নানা ধরণের পুস্তক পাঠে মানুষ ব্রতী হচ্ছে—এবং বলা চলে পাঠক রুচিরও পরিবর্তন ঘটেছে—পূর্ব অনুচ্ছেদে যে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থমেলাগুলি নবসাক্ষরদের সাক্ষরোত্তর পঠন-পাঠনেও উদ্বুদ্ধ করবে—গ্রন্থমেলার বাড়তি উপযোগিতা। আর সাক্ষরতা আন্দোলনের গুরুত্বের কথাও বলে শেষ করা যায় না। সমাজের বৃহৎ সংখ্যক মানুষ যদি নিরক্ষর থাকে তাহলে এই মানুষরা জাতীয় জীবনে যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে না বরং এরা সমাজকে নিচুর দিকে টেনে নিয়ে যায়। সাক্ষর মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি মানে গ্রন্থাগারের পাঠক সংখ্যার আরো বৃদ্ধি ; আর জাতীয় উন্নতির পথ আরোও সুগম। আমাদের সামনে এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে—যার ফলে দেশের সর্বতোমুখীন বিকাশ ত্বরান্বিত হবে—সকলের সমবেত চেষ্টায়। সে চেষ্টার শরিক—লিটারারী সোসাইটি, গ্রন্থাগারের পরিচালক ও কর্মী, বিদ্যালয়-কলেজ তথা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক ও কর্মী, সরকারী আধিকারিক—সকলকে হতে হবে।

তাই প্রারম্ভে যে কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ ইলেকট্রনিক মাধ্যম কখনও গ্রন্থাগারের বিকল্প হতে পারে না এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হবে এবং সারস্বৎ জগতে এক জোয়ারের সৃষ্টি হবে। কবি সাদে-র সেই অমর বাণীর সঙ্গে গলা মিলিয়ি যেন বলতে পারি—

.... around me I behold
Where'er these casual eyes are cast
The mighty minds of old ....".

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

বিঃ দ্রঃ একাদশ হুগলী জেলা গ্রন্থমেলা ১৯৯৪-৯৫ উপলক্ষে স্মরনিকায় প্রকাশিত হয়।

কোন্নগরে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন

১৯৪৬ সালে ২৯ জুলাই ডাক ও তার শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয়, বিশেষ করে বঙ্গদেশে। ১৯৪৫ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দীনেতাদের মুক্তির জন্য আন্দোলন, VIN ব্যাটিংদের বিদ্রোহের সমর্থনে আন্দোলন, বিহারে পুলিশ বাহিনীর বিদ্রোহ—এক কথায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উত্তাল জাগরণ। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মেহনতী মানুষ তথা শ্রমিক কর্মচারীদের আন্দোলনমুখীনতা তারই স্বরূপ কলকাতায় মার্কেনটাইল ফেডারেশনের নেতৃত্বে কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন গড়ে উঠে।

এই পরিবেশে কোন্নগরে অবস্থিত বেঙ্গল ডিস্ট্রিলারিস ও ডি, ওয়ালডি এই দুই কোম্পানীতে শ্রমিক কর্মচারীরা নিজেদের জীবনের আথিক উন্নতির কথা ভাবছিল। ঠিক সেই সময়ে উত্তরপাড়া নিবাসী বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায় তিনি শ্রমিক নেতাও বটে এঁর সভাপতিত্বে দুই কারখানার দুটি ইউনিয়ন গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ইউনিয়ন দুটি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। বিষ্ণু দত্ত ও নৃপেন্দ্র মুখার্জী যথাক্রমে সম্পাদক নিযুক্ত হন। অনেক আলাপ আলোচনার পর দাবি সমূহের মীমাংসা হয়।

এই দুইটি ইউনিয়ন শুধু নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়েই লড়াই করেনি বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত দাঙ্গার সময়ে তার বিরুদ্ধে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে—এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া দুটি ইউনিয়ন বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের সংগ্রামের পাশে দাঁড়ায়। আরো একটা ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৫১ সালে বেঙ্গল ডিষ্টিলারিস ইউনিয়নের বাৎসরিক অনুষ্ঠানে ভদ্রকালীর নাট্যচক্র কর্তৃক দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মশাল' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির বিষয়বস্তু দাঙ্গা বিরোধী। এছাড়া ইউনিয়ন দুটির উদ্যোগে দীর্ঘদিন ধরে নাটকের উৎসব হত।

এর কিছুকাল পরে এই কারখানারই পাশে এইচ জি রিফাইনারী, র‍্যালিস ইণ্ডিয়া লিঃ প্রভৃতি কারখানা গুলিতে হৃষিকেশ চট্টোপাধ্যায়-এর সভাপতিত্বে ইউনিয়নগুলি গঠিত হয়, এবং ওয়াটারবুশনের ও ট্যাক এণ্ড নেলেও ইউনিয়ন গঠিত হয়। বর্তমানে এই সমস্ত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে।

এই সময়ের কিছু পূর্বে চল্লিশের দশকে লছমী নারায়ণ জুট মিলে শ্রমিক নেতা বিষ্ণু ব্যানার্জীর নেতৃত্বে এক কংগ্রেসী ইউনিয়ন গঠিত হয়। এর পরে ১৯৫২/৫৩ সাল নাগাদ এখানে বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নের (এ আই টি ইউ সি) এক শাখা গঠিত হয় শশীবাবুর টালির ঘরে। নিকটস্থ খোলা মাঠে শ্রমিক সমাবেশ হত। এখানে সম্মিলিত ভাবে ট্রেড ইউনিয়নের মে দিবস প্রভৃতি সমাবেশ হত। এই টালির ঘরে সদ্য প্রয়াত বিখ্যাত শ্রমিক ও কমিউনিস্ট নেতা ইন্দ্রজিত গুপ্ত বসে শ্রমিকদের সংগে বৈঠক করে গেছেন। জুটমিলের শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে অনেক সংগ্রাম হয়েছে।

এর পরে আসে শ্রীদুর্গা সূতাকলে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের কথা। ১৯৪৭ সালে ১৫ই আগষ্ট শ্রীদুর্গা কারখানায় জাতীয়পতাকা উত্তোলনের সময় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটে তার ফলশ্রুতি হিসাবে মনোরঞ্জন হাজরার নেতৃত্বে ঐ কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়। শ্রমিকদের দাবি দাওয়া নিয়ে অবশেষে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হল। তারপর কোন্নগর বাজারের কাছে শ্রমিকদের শোভাযাত্রর উপর হামলা হয় এবং সার্জেন্টের রিভলবার থেকে গুলি ছোঁড়া হয়। এই ঘটনাকে নিয়ে কোন্নগরের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে শ্রীদুর্গার শ্রমিকদের ধর্মঘটের সমর্থনে কোন্নগর বাজারের কাছে গণেশ ঘোষ, গিরিজা মুখার্জী, সুহাসিনী গাঙ্গুলী প্রভৃতি বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ জন সভায় বক্তৃতা করেন। উপস্থিত থাকেন বিষ্ণু দত্ত, গোলাম মহীউদ্দিন ও সমর মিত্র। অনেক শ্রমিক জেলে আবদ্ধ হয়। তাদের মুক্তির জন্য কোন্নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (মহিলারা সহ) ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের কাছে আবেদন করেন। অবশেষে BPTUC -র সম্পাদক আব্দুল সামিলের নেতৃত্বে ধর্মঘটের মীমাংসা হয়। শ্রীদুর্গার এই শ্রমিক আন্দোলন কোন্নগরের শ্রমিক শ্রেণীর উপর এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে।

এর পর রেললাইনের পশ্চিম পাড়ে হয়েলস্ পেইণ্টস কারখানায়

BPTUC-র ইঠনিয়ন গঠিত হয় এর আগে ওপরে দশ বছরের মধ্যে ফোর্ট উলিয়াম, কয়রফেন্ট, সেরাই কেল্লা, বার্ক মায়ার বেল্টিং, B.C. Nam spinning & weatuing Mill (বর্তমানে N.T.C-র অন্তর্গত) ভুতুড়িয়া। শ্ররাম সিল্ক, কানোরিয়া সুতাকল প্রভৃতি কারখানাগুলিতে ইউনিয়ান গড়ে উঠে—সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, ১৯৭০ সালে C P I ও C P I (M) প্রভাবিত বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক সংগঠনগুলি AITUC ও CITU -তে বিভক্ত হয়ে যায়। এই ভাবে কোন কোন কারখানাতে I.N.T.U.C হ হয়। শ্রীদুর্গাতে UTUC -র ইউনিয়ন গঠিত হয়। তবে অনেক সময়ে শ্রমিক স্বার্থে ইউনিয়নগুলি এক সাথে আন্দোলন করে।

বেশ কিছু দিন হলো শ্রীদুর্গা, লছমীনারায়ণ, হয়েলস্ পেইন্টস্। শ্রীরাম সিল্ক, ক্যানোরিয়া সুতাকল প্রভৃতি কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে গেছে, অবশ্যই মালিকরে নিজেদের অসামর্থের কারণে। (সেরাইকেল্লা কোন রকমে চলছে)।

যে সমস্ত শ্রমিক নেতা (প্রয়াত ও জীবিত) চল্লিশের দশকের শেষ থেকে সক্রিয় ছিলেন ও আছেন তাঁদের নাম—ব্যোমকেশ মজুমদার, বিষ্ণু ব্যানার্জী শিবদাস ঘোষ, শক্তি মুখার্জী, দেবেন ব্যানার্জী, অনন্ত কুমার দেব, মনোরঞ্জন হাজরা, গোলম মহীউদ্দীন, মনোরঞ্জন দে, যদুগোপাল সেন, কালিপদ ভৌমিক, গোপী ব্যানার্জী, ভূদেব মজুমদার, গোবিন্দ চ্যাটার্জী, বিষ্ণু দত্ত, শ্যামসুন্দর বসু, অম্বিকা চক্রবর্তী, ননীপদ চৌধুরী, মহম্মদ কামলে, রাম অযোধ্যাসিং, দীনেন ভট্টাচার্য, কমল ভট্টাচার্য, শান্তশ্রী চাটার্জী, অশোক ব্যানার্জী, শিশির চক্রবর্তী, সাজেদার রহমান, শ্যামল মিত্র, নিরঞ্জন সাহা, নিরঞ্জন বারিক, উপেন সাহা, গোবিন্দ বন্ধু, অমূল্য গাঙ্গুলী, আজারিয়া, গঙ্গানারায়ণ চ্যাটার্জী, সমর মিত্র, রামকুমার মাহাতো প্রভৃতি।

এখানে দু'একটি কথা সংক্ষেপে বর্ণিত হল— ১৯৪৯ সালে বোম্বাই শহরে AITUC-র সম্মেলনের প্রস্তুতিতে গেটে গেটে সভা হয়েছিল।

১৯৬১ সালে পাওনা PF -র টাকা আদায়ের দাবিতে প্রায় ২০০০ শ্রমিক (নারী শ্রমিক সহ) শোভাযাত্রা করে রিজিওন্যাল PF-র কমিশনারের অফিস

ঘেরাও করে গোলাম মহীউদ্দীন, ভূপেন মজুমদার, ও বিষ্ণু ব্যানার্জী নেতৃত্বে। সেই সময়ে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপে মালিক টাকা মিটিয়ে দেয়।

১৯৬৭ সালে আবার কারখানা বন্ধ হলে মালিকের কাছে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য শ্রমিকরা কারখানা ঘেরাও করে (ম্যানেজার সহ) ; এস.ডি.ও আর্মড পুলিশ নিয়ে হাজির হয়। পরে ম্যানেজার, AITUC-র INTUC নেতারা ও পুরসভার প্রধানের উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। কিছু দাবি দাওয়া আদায় হয়। এর কিছু পরে মালিকদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বের ফলে কারখানা স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

সূত্র ঃ পুরাতন রেকর্ড এবং ভূপেন মজুমদার ওগোলাম
মহীউদ্দীনের সাথে সাক্ষাতকার

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

নৃসিংহদাস বসু ঃ সমকাল ও বর্তমানকাল

উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের স্থপতি ভারতপথিক রাজা রামমোহন রায়। তাঁর উত্তরসূরী ডিরোজিও ও ডিরোজিয়ানরা। তাঁর পথ অনুসরণকারীরা এবং বিদ্যাসাগর—মাইকেল মধুসূদন—রাজনারাযণ বসু—বঙ্কিমচন্দ্র—বিবেকানন্দ—অরবিন্দ—বিপিনপাল—রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সংস্কৃতি চিন্তা ও রাজনীতি জগতের প্রাতঃস্মরণীয় মণীষীদের যে স্রোতধারা তারই পথ অনুসরণ করে এবং শিবচন্দ্রদেবের মত খ্যাতকীর্তি পুরুষের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে নৃসিংহদাস বসু কোন্নগর গ্রামের সীমার মধ্যে তাঁর কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করে নেন। তিনি কোন্নগরের শিক্ষা ও জনজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে বিরামহীনভাবে জনহিতকর কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। এর কালসীমা অর্দ্ধ-শতাব্দী পরিব্যাপ্ত। ১৯৫৪—৫৫ সালে বার্ধক্যজনিত শারীরিক অসামর্থ্যের জন্য সক্রিয় সমাজ সেবার কাজ থেকে অবসর নিলেও তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কোন্নগরের জনজীবনের সঙ্গে নিজেকে ওতঃপ্রোতভাবে যুক্ত রেখেছিলেন।

এখন তদানিন্তন কোন্নগরের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকের অবস্থা বলতে গেলে উল্লেখ করতে হয় যে খেলাধূলা, ব্যায়াম, সেবা, গ্রন্থাগার, সাহিত্যসভা, পাঠশালা, টোল প্রভৃতি নানা আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি কেন্দ্রীয়ভাবে বর্তমান ছিল সর্ব কোন্নগব প্রতিষ্ঠান হিসাবে ইংরাজী নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়, সাধারণ গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর পুরসভা, পিতাম্বর অবৈতনিক চিকিৎসাকেন্দ্র, সমবায় ব্যাঙ্ক প্রভৃতি। এইভাবে কোন্নগরের জনজীবন নানা কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত ছিল। ইতিমধ্যে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ারে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায় ও বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে কোন্নগরের মানুষও ধীরে ধীরে সম্পৃক্ত হতে থাকে। এই সময়েই নৃসিংহদাস বসুর সামাজিক কর্মজীবনের শুরু।

তারপর জাতীয়মুক্তি আন্দোলনের প্রসার ঘটে অহিংস ও সহিংস দুই পন্থায়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতীয় আশা আকাঙ্খাকে যখন বর্বরভাবে দমন

করা হল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের দ্বারা তখন সমগ্রজাতি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে রুশ বিপ্লবের প্রভাবে ভাবতে শ্রমিকদের মধ্যে জাগরণ ও আন্দোলনের দানা বাঁধতে থাকে। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ-স্বাধীনতার ঘোষণা জাতির চেতনায় বিদ্যুৎ চমকের সৃষ্টি করে। তারপর প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আগষ্ট আন্দোলন ও পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং সবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত জাতীয় স্বাধীনতা লাভ—এ সবের ঢেউ কোন্নগরের মানুষের মনেও অনুরণন তোলে। এই কালপর্বে নৃসিংহদাস বসুর নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কর্মোদ্যোগের প্রসার। এর কিছু পূর্বে ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সভাপতিরূপে নির্বাচনের সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থার আর্বিভাব এবং কোন্নগরের কিছু গ্রন্থাগারের তালিকায় সাপ্তাহিক 'গণশক্তি', গোর্কির 'মা', লেনিনের জীবনী প্রভৃতি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্তি কোন্নগরে যুবশক্তির একাংশকে উদ্‌বুদ্ধ করে। এই সময় থেকে নূতন যুগের ভাবধাবা অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক তথা মার্কসীয় চিন্তার যে অঙ্কুরের উদগম হয় স্বাধীনতা উত্তরকালে কোন্নগরের মানুষের মধ্যে তা নিশ্চিতভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। স্বদেশ ভাবনার সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনের প্রাগ্রসব চিন্তা ও আদর্শের মেল বন্ধন ঘটে।

নৃসিংহদাস বসু ছিলেন মুক্তমতি ও উদাবমনের মনের মানুষ। তাই একদিকে তিনি যেমন ছিলেন সত্যিকারের ধর্ম নিরপেক্ষতার দৃঢ় সমর্থক যেমন দেখেছি ৪৬ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে স্থানীয় অঞ্চলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য তাঁর কত উদ্যম, তেমনি আবার তিনি যখন জনজীবন থেকে বিদায় নিলেন তখন কোন্নগরের অগ্রগামী যুবক দলকে নাগরিক জীবনে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানালেন---যা উদার মনের পরিচায়ক। আর তরুণ অনুগামীরা তাঁর একনিষ্ঠ জনসেবার মহৎ উদাহরণ অনুসরণে ব্রতী হল।

জীবনে থেমে থাকেনা—জীবন বহমান নদীর মত সদা প্রবহমান। তাতে নূতন নূতন উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এসে যুক্ত হয়। কোন্নগরের স্থানিক এলাকা মাত্র ১.৬৭ বর্গমাইল, যেটা স্থির। কিন্তু চল্লিশ দশকের শেষে যে জন সংখ্যা ছিল তা বহুল পরিমাণে বেড়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫৭,০০০। তখন নগরের এক তৃতীয়াংশতে ছিল জনবসতি, আর বর্তমানে এমন অঞ্চল নেই যা জনবসতিহীন। সমস্ত অঞ্চলে নূতন নূতন বসতি গড়ে উঠেছে ফলে পূর্বে যে

স্থলে মাত্র কয়েকটা পাড়া বা অঞ্চল ছিল, এখন তা আব গুনে শেষ করা যায়না। সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘ তিন দশক ধরে নগব উন্নয়নেব নানারূপ নূতন নূতন প্রকল্প বিভিন্ন এলাকায রূপাযিত হয়েছে। আব এর পাশাপাশি এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীরা নিজ উদ্যোগে সামাজিক সেবামূলক, খেলাধূলা এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক নানা সংগঠন গড়ে তুলেছে আর এগুলির মাধ্যমে সৃষ্টিশীল কর্মোদ্যোগ চালিয়ে যাচ্ছে।—এই সমস্ত নিয়েই কোন্নগর ঃ এই সমস্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের মিলিত ও সংহত রূপই এক-কোন্নগর-অনুভব (Conception)। সেই কোন্নগরকে সুন্দর ও সুসংহত করে গড়ে তোলা ও এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকারের মধ্যে নৃসিংহদাস বসুকে স্মরণ করার সার্থকতা।

লেখক ঃ বিষ্ণু দত্ত

———————

(সংযোজন)

মুরারি মোহন মিত্র

(১৯১৫-২০০২)

কোন্নগরের বিশিষ্ট সমাজসেবী, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় কর্মী তথা কর্ণধার তথা প্রাক্তন পৌর সদস্য, গান্ধীবাদী রাজনীতিবিদ, সাহিত্যসেবী প্রয়াত মুরারি মোহন মিত্র ওরফে মুরারি মিত্রর জন্ম হয় ১৯১৫ সালের ১৯সেপ্টেম্বর উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর শহরে। বাবা ছিলেন কোন্নগরের সন্তান ও কোন্নগর হাই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ হরিদাস মিত্র যিনি উত্তর প্রদেশের সরকারের সরকারী চিকিৎসক হিসেবে সাহারানপুরে কর্মরত ছিলেন। মা ছিলেন শিবচন্দ্র দেবের জ্যেষ্ঠতাত জগন্নাথ দেবের বংশধর ললিত কুমার দেবের কন্যা স্বর্গতা লতিকা মিত্র।

মুরারি মিত্রর বিদ্যালয় শিক্ষারম্ভ সাহারানপুরেই। পিতার মৃত্যুর পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কোন্নগরের পিত্রালয়ে আসার পরে কোন্নগর স্কুলেই আবার বিদ্যারম্ভ ক্লাস সিক্স থেকে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১৯৩৪ সালে। সহপাঠী ছিলেন পরবর্তী জীবনের প্রখ্যাত দন্ত চিকিৎসক দীনবন্ধু ওরফে গোপাল ব্যানার্জী, বিমান মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট মানুষ। চাকরি জীবন শুরু বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বি বি জে কোম্পানী। পরবর্তী জীবনে স্বাধীন ব্যবসায়ে অংশীদারি।

মুরারি মিত্ররা তিন ভাই ও দুই বোন। তিনি ছিলেন মধ্যম ভ্রাতা। বোনেরা কনিষ্ঠ। বন্ধু গোপাল ব্যানার্জীর মত মিত্রও তিনিও ছিলেন অকৃতদার।

১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কোন্নগরের বিশিষ্ট সাহিত্য-সংস্কৃতি সংস্থা "পাঠচক্র"-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হন। "পাঠচক্র" সেই সময়ে প্রতি বছর শিবচন্দ্র জন্মোৎসব ও সাহিত্য সভার আয়োজন করত। কলকাতা থেকে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের কোন্নগরে নিয়ে আসতেন। মুরারি মিত্র

ছিলেন এ সব আয়োজনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতির সভ্য ও পরে এক সময়ে সভাপতিও হয়েছিলেন।

মুরারি মিত্র ছিলেন কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুমের কার্যকরী সমিতির সর্বাপেক্ষা দীর্ঘকালিন সদস্য ও সম্পাদক। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তিনি এই পদে বৃত ছিলেন, তিনি এই একই সময়ে দেবানন্দপুরের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারেরও সদস্য হিসেবে যুক্ত ছিলেন। তিনি রাজনীতিগত ভাবে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সাহিত্য শাখা 'অভ্যুদয়' পরিষদের সঙ্গে এবং কলকাতার 'সাহিত্যিকা' নামক সাহিত্য সভার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। গল্প উপন্যাস ইত্যাদি না লিখলেও একাধিক রচনার মধ্যে দিয়ে তিনি যথেষ্ট সাহিত্যচর্চার নিদর্শন রেখে গেছেন।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে তিনি হুগলি জেলার অন্যতম কংগ্রেস নেতা ইন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মাধ্যমে কংগ্রেসের রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং স্বাধীনতার লগ্ন থেকে দীর্ঘদিন কোন্নগর মণ্ডল টাউন কংগ্রেসের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে তিনি ১৯৫৭ ও ৬২ সালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিধান সভা নির্বাচনে উত্তরপাড়া বিধান সভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর তিনি আদি কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন—যদিও ইন্দিরা কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক বজায় ছিল।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের একটি ডেলিগেশনের সঙ্গে তিনি একবার জাপানও ঘুরে আসেন। স্থানীয় ভাবে তিনি বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

কোন্নগরের স্বতন্ত্র পৌরসভা গঠন কালে, ১৯৪৪ সালে তিনি পুর আন্দোলনের সঙ্গে গভীর ভাবে জড়িয়ে পড়েন এবং পরে ১৯৪৯ সালে তিনি একবার পুর কমিশনারও হন। পুর কর্মে তিনি ছিলেন প্রয়াত নৃসিংহদাস বসু ও ননীগোপাল বসু মহাশয়দ্বয়ের একনিষ্ঠ অনুগামী ও কর্মী।

১৯৮২ সালে গঠিত নৃসিংহ দাস বসু জন্মশতবার্ষিকী কমিটির তিনি ছিলেন সম্পাদক, এবং প্রধানত তাঁরই উদ্যোগে মিউনিসিপ্যালিটিতে আবক্ষ মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুরারি মিত্র কোন্নগরের জনজীবনের সঙ্গে গভীর ভাবে যুক্ত ছিলেন। ফ্রেণ্ডস ড্রমাটিক ইউনিয়ন, কোন্নগর স্বাস্থ্যকুটির, নিখিলবঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতি, ওলিম্পিক ইনস্টিটিউট, কোন্নগর স্যাটারডে ক্লাব, ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন ক্লাব, কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক, শ্রীশ্রী রক্ষাকালীমাতা পূজা কমিটি, রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি, কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান, কোন্নগর আইডিয়াল সোসাইটি প্রভৃতি অসংখ্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কোথাও সভ্য কোথাও শুভানুধ্যায়ী হিসেবে তিনি যুক্ত ছিলেন।

ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত "হরিপ্রসাদ মেমোরিয়াল ট্রাষ্ট ফাণ্ড" ও "কোন্নগর আর্বান ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড রিলিফ অর্গানাইজেসন" নামক দুটি দান তহবিলের সঙ্গে তিনি সূচনালগ্ন থেকেই যুক্ত ছিলেন, পরে সভাপতিও হয়েছিলেন।

হুগলী জেলার সিভিল সাপ্লাই এ্যাডভাইসারি কমিটির সভ্য হিসেবে ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি নবগ্রাম পিপলস কো-অপারেটিভ-এর সঙ্গে থেকে নবগ্রামে নতুন বসতি গড়ে ওঠার কাজের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

১লা জুলাই ২০০২ তারিখে তাঁর মৃত্যুতে কোন্নগর তার এক হিতৈষী সন্তানকে হারাল। তাঁর অভাব কোন্নগরবাসী দীর্ঘকাল অনুভব করবে।

লেখক—রথিন চক্রবর্তী

[শ্রদ্ধেয় মুরারি মোহন মিত্রের দেহাবসান সময়ে এই গ্রন্থেব মুদ্রণকার্য প্রায় শেষ পর্যায়ে। সেই জন্য তাঁর জীবনী গ্রন্থের শেষে সন্নিবেশিত হলো।

—সম্পাদক মণ্ডলী]

সম্পাদক মণ্ডলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১। বিষ্ণু দত্ত, মুখ্য সম্পাদক ও সংকলক

কোন্নগরের মানুষের কাছে বিষ্ণু দত্ত পরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সারা জীবনের কর্মধারা, চিন্তাধারা, সংগঠন ও আন্দোলনমুখী আত্মনিবেদন কোন্নগরের সকল মানুষের কাছেই তিনি এক সুহৃদ ব্যক্তিত্ব।

কোন্নগরের একটি সাধারণ পরিবারে তাঁর জন্ম ১৯১৯ সালে। (এই সালটা আমাদের জালিয়ানওয়ালাবাগে বৃটিশ শাসিত হত্যা কাণ্ডেরকথা স্মরণ করিয়ে দেয়, স্মরণ করিয়ে দেয় রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করার কথা)। বিষ্ণু দত্তের পিতার নাম নরেন্দ্র নাথ দত্ত এবং মাতার নাম শরৎ নলিনী দত্ত। পিতার নিয়ম নিষ্ঠ জীবনের প্রভাব বিষ্ণু দত্তের জীবনেও লক্ষিত হয়। কিশোর কাল থেকে তিনি গ্রন্থাগার, খেলাধূলা, শরীরচর্চা ও স্বাধীনতা আন্দোলন প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে বিজ্ঞানে স্নাতক হয়ে ১৯৪১ সালে কোন্নগরে 'বেঙ্গল ডিস্‌টিলারী প্রতিষ্ঠানে (বর্তমানে শ'ওয়ালেশ, ভদ্রকালী) কেমিষ্ট হিসেবে যোগদান করেন। পরে ১৯৮০ সালে চিফ্ কেমিষ্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। চাকুরী জীবনে তিনি খুব ঘনিষ্ঠভাবে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৪৮ সালে বিষ্ণু দত্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন, এবং আরো ব্যাপক ভাবে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। তিনি ইসকাস (ISCUS) এবং ইন্দোজিডি আর সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই সময় থেকে তিনি পত্র-পত্রিকায় নানা প্রসঙ্গের প্রবন্ধ লিখতে থাকেন এবং কিছু উল্লেখযোগ্য অনুবাদ করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি কোন্নগর পুর প্রধান নির্বাচিত হন এবং ১২ বছর সেই পদে বহাল থাকেন। কোন্নগর মাতৃসদন, কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন যথাক্রমে পরিচালনা ও নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি কমিশনার ও পুরপ্রধান হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কোন্নগর

উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি, কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা ও অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। এই দুটি সংগঠন কোন্নগর অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে জনকল্যাণমুখী ও সাংস্কৃতিক কাজ করছে। ১৯৭৬ সালে বিষ্ণু দত্ত রাশিয়ায় বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদান করেন।

'কোন্নগর পরিচিতি' পুস্তক রচনা ও প্রকাশের সাংগঠনিক উদ্যোগে বিষ্ণু দত্ত অন্যতম ব্যক্তি।

২। রথিন চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৩৩, কোন্নগরে। কোন্নগরের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহাসিক সমাজ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে একজন অন্যতম ব্যক্তিত্ব। পিতা ছিলেন মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের স্বনামধন্য প্রধান শিক্ষক রমণী কান্ত চক্রবর্তী। প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত পিতার নিয়মানুগ জীবনবৃত্তির প্রভাব রথিনবাবুর জীবনেও প্রতিফলিত। রথিন চক্রবর্তী কিশোর বয়সে মেধাবী ছাত্র থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন কোন্নগরের বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের প্রথম সারির সংগঠক ছিলেন। পরবর্তী কালে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরপাড়া রাজা প্যারী মোহন কলেজ, কলকাতার সেন্ট পলস কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, সর্বত্রই তিনি ছাত্র আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ছিলেন নদীয়ার শ্রীকৃষ্ণ কলেজের কার্যকরী অধ্যক্ষ, অবসর নেন ১৯৯৩ সালে। কোন্নগরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর সাংগঠনিক সম্পৃক্তি স্মরণীয়। বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য, কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে দীর্ঘ সময় সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা স্মরণীয়। আশালতা বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক, কোন্নগর সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি, কোন্নগর শিবচন্দ্র শিক্ষাভবনের সভাপতি প্রভৃতি স্থানে তাঁর অবস্থান উল্লেখযোগ্য।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় ছাড়াও রথিন চক্রবর্তী যুক্তিবাদী সুবক্তা, প্রাবন্ধিক, শিল্প-সাহিত্যে এবং ইতিহাসে তাঁর অধিকার অভিনন্দনীয়।

৩। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩১ সাল। সাহিত্য, কাব্য ও নাট্য চর্চা শুরু কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থাতেই। একাধিক পত্র পত্রিকায় রচনা প্রকাশ সেই সময় থেকেই। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা সংসদ পরিচালিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে

একাধিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। দুখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে সাহিত্য পত্রিকা 'সমন্বয়ে'-র প্রকাশক ও সম্পাদক। এবং সমন্বয়ে সাহিত্য গোষ্ঠীরও সম্পাদক। দীর্ঘ সময়ে ধরে নাট্য সম্পৃক্তি থাকায় কোন্নগরের প্রধান প্রধান নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং কোন্নগরে সংস্কৃতি অন্দোলনে স্থায়ী আসন অধিকার করে আছেন। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদ ও উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতির অন্যতম সংগঠক। এবং কোন্নগর সমবায় ব্যাঙ্ক লিমিটেডের পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য। পেশাগতভাবে তিনি একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। সেখানেও তাঁর সংস্কৃতি বিকাশের প্রয়াস স্মরণীয়।

৪। নৈমিষারণ্য মুখোটী

জন্ম ১৯৩৭ সালে ঢাকা শহরে। তিনি পিতামাতার একমাত্র সন্তান হওয়া সত্ত্বেও স্নেহে লালিত হয়ে লেখাপড়ায় মেধাবী ছিলেন। কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলকাতার সুরেন্দ্র নাথ কলেজে পড়াশোনা করেছেন। পাঠ্য অবস্থাতেই তাঁর সাহিত্য প্রিয়তা ও শান্তধীর উচ্চারণে বাক্য প্রয়োগ লক্ষ্যণীয ছিল। পরবর্তী কালে তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ পদে কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। তাঁর বন্ধু প্রীতি ও অমায়িক ব্যবহার অভিনন্দনীয়।

৫। পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৫ সালে, অধুনা বাংলাদেশের রংপুর শহরে। তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন, পরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা অর্জন করে দক্ষিণপূর্ব রেলে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে কর্মরত ছিলেন। কর্মজীবনেই তাঁর সঙ্গীত চর্চার ক্রমোন্নতি ঘটে। এবং কর্মজীবনে বিভিন্ন স্থানে অবস্থান লব্ধ অভিজ্ঞতা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁকে সহায়তা করে। সঙ্গীতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা রণজিৎ কুমার রায়ের কাছে। পরে রবীন্দ্র সংগীতের প্রবাদ পুরুষ দেবব্রত বিশ্বাসের অধীনে রবীন্দ্র সংগীতের তালিম ও শিক্ষা গ্রহণ তাঁকে যোগ্য করে তোলে এবং সংগীতে চর্চিত হন। সংস্কৃতির বিভিন্ন অঙ্গনে অনায়াস প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। তিনি কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

৬। সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্ম ১৯২৮ সালে। কোন্নগরের সমাজ জীবনে ইনি একজন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচিত ব্যক্তি। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাংস্কৃতিক প্রয়াসের সঙ্গে যুক্ত। রাজেন্দ্র স্মৃতি বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির কর্ণধার এবং মাষ্টার পাড়া সাংস্কৃতিক পরিষদ গঠন ও উন্নয়ন, চক্রশ্রী ক্লাবের সভাপতি প্রভৃতি তাঁর কর্মধারায় উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০ সালে কোন্নগর গণতান্ত্রিক নাগরিক সমিতির প্রার্থী হিসেবে ১৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে বিপুলভাবে ভোটে জয়ী হয়ে কোন্নগর পৌর সভার কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ফলে, তাঁর সামাজিক উন্নয়নের কাজ আরো ব্যাপ্তি লাভ করে। তাঁর চাকুরী জীবন কেটেছে দক্ষিণ পূর্ব রেলে, ১৯৮৮ সালে অবসর নেন। কেন্দ্রিয় সরকারের পেনশনার্স এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি, উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতির কোষাধ্যক্ষ। বর্তমানে Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt of India মনোনীত 'AADHAR' এর সক্রিয় সদস্য এবং জিলা আধারের অঞ্চল প্রধান হিসেবে তাঁর সামাজিক দায়িত্ব উল্লেখের দাবি রাখে। এই পুস্তক প্রকাশনায় তাঁর সহযোগিতা স্মরণীয়।

৭। অনিল চট্টোপাধ্যায়

জন্ম ১৯৩৭ সালে। মধ্য কোন্নগরে এবং গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে অনিল চট্টোপাধ্যায়ের পরিচিতি সর্বাধিক বিশিষ্ট সমাজসেবী রূপে। তাঁর শিক্ষা জীবন কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়, উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন কলেজ ও কলকাতার সিটি কলেজ। তিনি চাকরী করতেন C.E.S.C.-তে এবং চাকরী জীবনেও মানুষের বাড়ির বিদ্যুৎ নিয়ে কোনো সমস্যা নিয়ে তাঁর কাছে গেলে তিনি সেই সমস্যার সমাধান করতেন। তিনি চাকরী জীবন থেকে অবসর নেন ১৯৯৮ সালে। তার পরেই তাঁর প্রধান কাজ হোল কোন্নগরে খেলাধূলার উন্নতি এবং বিভিন্ন ভাবে সমাজের সেবা করা। বেশ কয়েকটি বড় প্রতিষ্ঠানে তাঁর কার্যকরী ভূমিকা রয়েছে। যেমন কোন্নগর অলিম্পিক ইনস্‌টিটিউট, কিশোর ব্যায়াম প্রতিষ্ঠান, রাজরাজেশ্বরী যুব সমিতি, কোন্নগর সমবায় ব্যাংক লিমিটেড প্রভৃতি।

কোন্নগরের দুই বিশিষ্ট নাগরিক এবং সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ডাঃ নীলমণি বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রয়াত নগেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়-এর কাছে সমাজকল্যাণমুখী কর্মের দীক্ষাগ্রহণ করেন। এখন সেটাই তাঁর প্রধান সাধনা। সেই সাধনার কর্মধারায় তিনি কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের সঙ্গে যুক্ত।

৮। হারাধন চন্দ

জন্ম ১৯৩৭ সালে। অধুনা বাংলাদেশের নোয়াখালী জেলায়। পিতা প্রয়াত রমেশ চন্দ্র চন্দ। হারাধন চন্দ কানাইপুর হাই স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাঁর কর্ম জীবন আরম্ভ হয় শ্রীদুর্গা কটন মিলে, পরে স্টিল অথরিটি অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড, কলকাতা। সেখান থেকে অবসর নেবার পর তিনি সমাজ কল্যাণে এবং মানবিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কোন্নগর কালীতলা মিলনবন্দি ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, মাস্টার পাড়া রাজেন্দ্রনগর লাইব্রেরির মুখ্য পরিচালক, শিশুদের স্বাস্থ্য ও সংস্কৃতি চেতনার বিকাশ কল্পে শিশুচক্র প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও মুখ্য সঞ্চালক। বর্তমানে জটিল রোগের ব্যয় সাপেক্ষ চিকিৎসার বিকল্পে যোগ সাধনা ও চর্চার মাধ্যমে শরীর সুস্থ রাখার গবেষণায় রত। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত অধুনালুপ্ত যোগবিষয়ক ত্রৈমাসিক 'যোগ সংহতি' পত্রিকার যুগ্ম কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন। সাধারণ নাগরিক চেতনা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অঞ্চলের উন্নয়ন পরিষদের অন্যতম সংগঠক। হারাধন চন্দ কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের অন্যতম সক্রিয় সদস্য।

৯। প্রাণগোপাল চক্রবর্তী

জন্ম ১৯৪৮ সালে। শিক্ষা-বিজ্ঞানে স্নাতক, কলকাতা বিদ্যাসাগর কলেজ (সান্ধ্য) থেকে। শিক্ষা, সমাজসেবা উন্নয়ন প্রভৃতি তাঁর জীবনের ব্রত। ফলে,বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন বিভিন্ন কর্মধারায়। যেমন—সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল মাস বেনিফিট সোসাইটি, সভাপতি—পরিবেশ ও জন স্বাস্থ্য চেতনা, সম্পাদক—কোন্নগর শিক্ষা পরিষদ, সহ সভাপতি —বকুতলা স্পোর্টিং ক্লাব (হারান ব্যানার্জী লেন), সহ সভাপতি—উদ্ভিদ রোপণ ও সংরক্ষণ সমিতি, সহ সভাপতি—নিখিল বঙ্গ নববর্ষ উৎসব সমিতি প্রভৃতি। প্রাণগোপাল চক্রবর্তী সাংস্কৃতিক কর্মধারায় বিভিন্ন ভাবে সংগঠনের

চেষ্টায় রত থাকেন। তিনি কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। তাঁর অমায়িক ব্যবহার আকর্ষণীয়।

১০। সঞ্জীব সেন

জন্ম ১৯৩২ সালে। পিতা প্রয়াত নৃপেন্দ্র চন্দ্র সেনগুপ্ত, পেশায় ছিলেন মাইনিং ইঞ্জিনীয়ার অথচ তাঁর সংগীতে ও সাহিত্যে অনুরাগ ছিল। পিতা মাতার প্রভাব সঞ্জীব সেনের জীবনেও লক্ষিত হয়েছে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। পেশাগত ভাবে রেলকর্মী ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিন দশকের অধিক সময় থেকে নাট্য আন্দোলন ওসাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে এবং নাট্য শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত আছেন। তিনি রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত অন্যতম প্রাচীন নাট্যশিক্ষা কেন্দ্র ইনস্‌টিটিউট্ অব ইণ্ডিয়ান থিয়েটার আর্টস-এর সাম্মানিক অধ্যক্ষ পদে আছেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ, রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি ও হুগলী জেলা কমিটির সহ-সভাপতি এবং পশ্চিম বঙ্গ নাট্য আকাদেমির সদস্য। শিল্প সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্বের বিস্তৃত অঙ্গনে তাঁর অনায়াস অধিকার স্বীকৃত। কবিতা সহ, নাট্য ও সাহিত্যের উপর তাঁর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচ। তিনি কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদসহ একাধিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

১১। প্রচ্ছদ শিল্পী ঈশা মহাম্মদ

জন্ম ১৯৩৩ সালে। বর্তমানে দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের সঙ্গে একাসনে আছেন। তিনি কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় ও উত্তরপাড়া কলেজে পড়াশুনা করেছেন। শিল্প শিক্ষাতে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন সরকারী আর্ট ও ক্রাফট কলেজ থেকে উচ্চ সম্মানে। তারপর তিনি জার্মানী, লণ্ডন ও প্যারিসে শিল্প অনুশীলনে যান। তিনি কলকাতার সরকারী আর্ট ও ক্রাফট কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। দেশে ও বিদেশে তাঁর ছবির প্রদর্শনী হয়েছে, সম্মান ও পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ললিতকলা কেন্দ্রের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য চারুকলা পর্ষদের সদস্য।

প্রকাশনী বিভাগের কর্ম পরিষদ

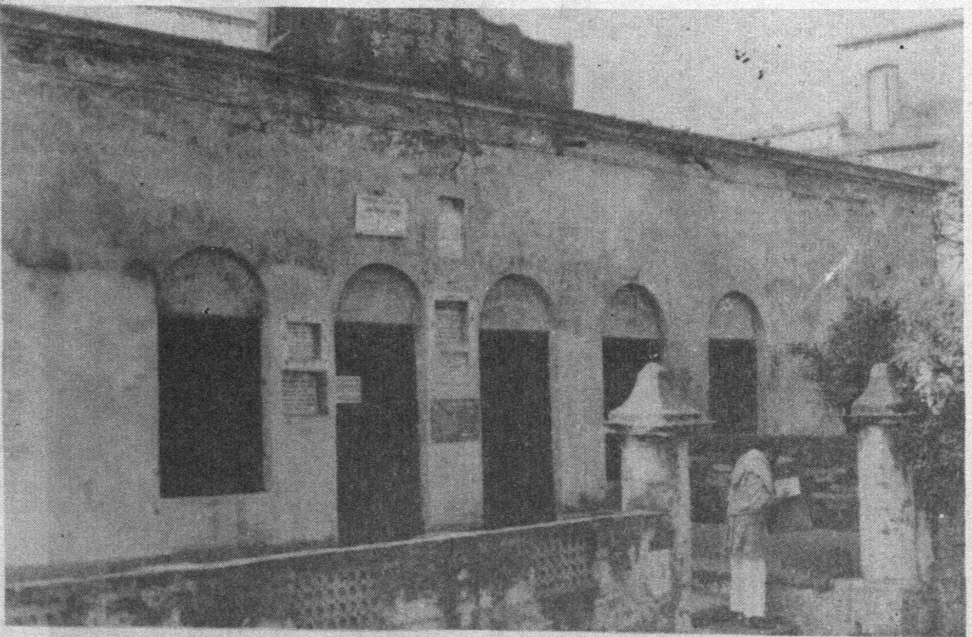
'কোন্নগর পরিচিতি' প্রস্তুতি পর্বে ৭.৩.১৯৯৯ তারিখে কোন্নগর রবীন্দ্র পরিষদের একটি বর্ধিত সভা হয়। সেই সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, কোন্নগর সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য (বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত) শিক্ষা, সংস্কৃতি, আন্দোলন প্রভৃতিকে সমন্বিত করে একখানি বড় গ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একটি কর্মপরিষদ গঠন করা হয়

প্রধান উপদেষ্টা	ঃ	অধ্যাপক সত্যেন সাহা
সভাপতি	ঃ	সঞ্জীব সেন
যুগ্ম সম্পাদক	ঃ	বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, মণীন্দ্র মিত্র
কোষাধ্যক্ষ	ঃ	সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্য সংকলক	ঃ	বিষ্ণু দত্ত
সদস্য	ঃ	নৈমিষারণ্য মুখোটী, হারাধন চন্দ সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণগোপাল চক্রবর্তী রথিন চক্রবর্তী, অনিল চট্টোপাধ্যায় পুণ্য পাবক মুখোপাধ্যায়, দুলাল বিশ্বাস অরুণাভ গাঙ্গুলী

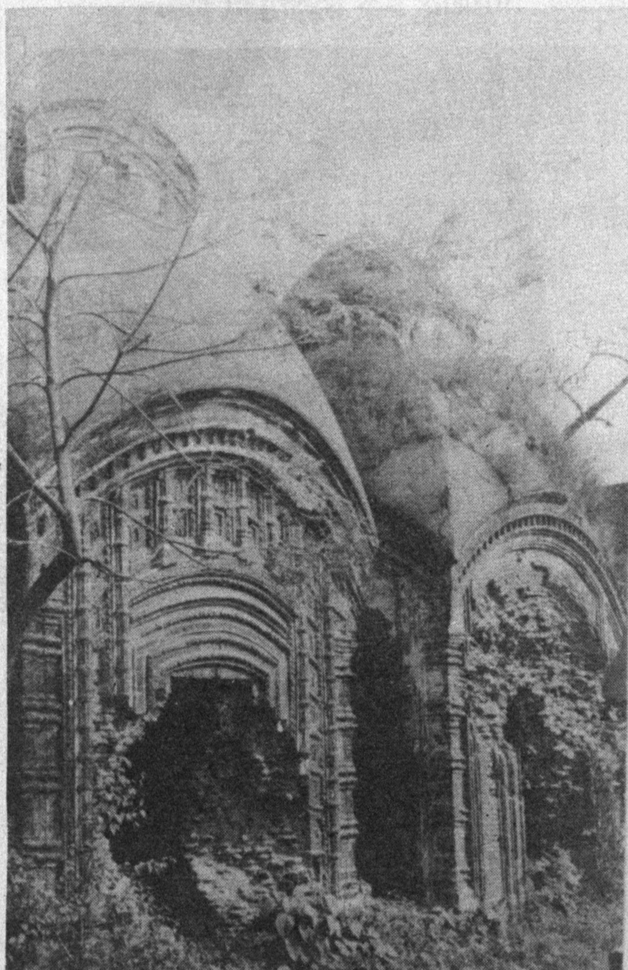
পুস্তকের সম্পাদকমণ্ডলী ঃ

রথিন চক্রবর্তী, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, নৈমিষারণ্য মুখোটী
পুণ্যপাবক মুখোপাধ্যায়, সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়
হারাধন চন্দ, প্রাণগোপাল চক্রবর্তী ও সঞ্জীব সেন

প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ ঈশা মহাম্মদ



কোন্নগর হরিসভা



পুরাতন শিব মন্দির



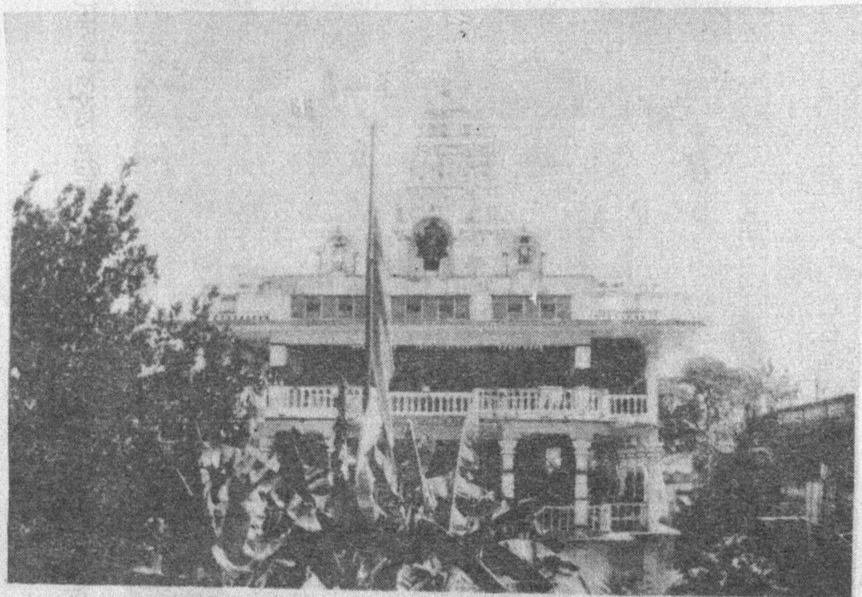
কোন্নগর মাতৃ সদন



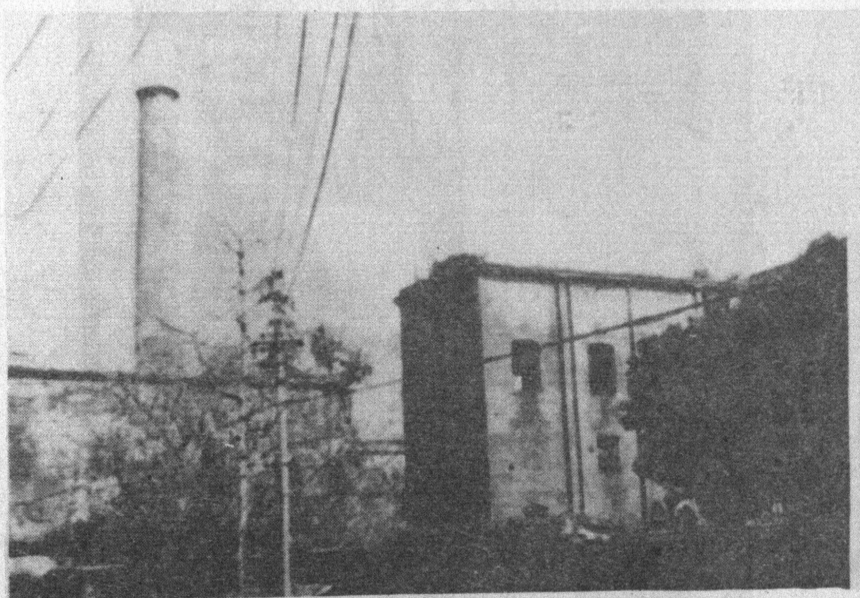
দাস বাড়ির পূজা মণ্ডপ



জমিদার শম্ভু চরণ চট্টোপাধ্যায়ের বসত বাটীর ঠাকুর দালান



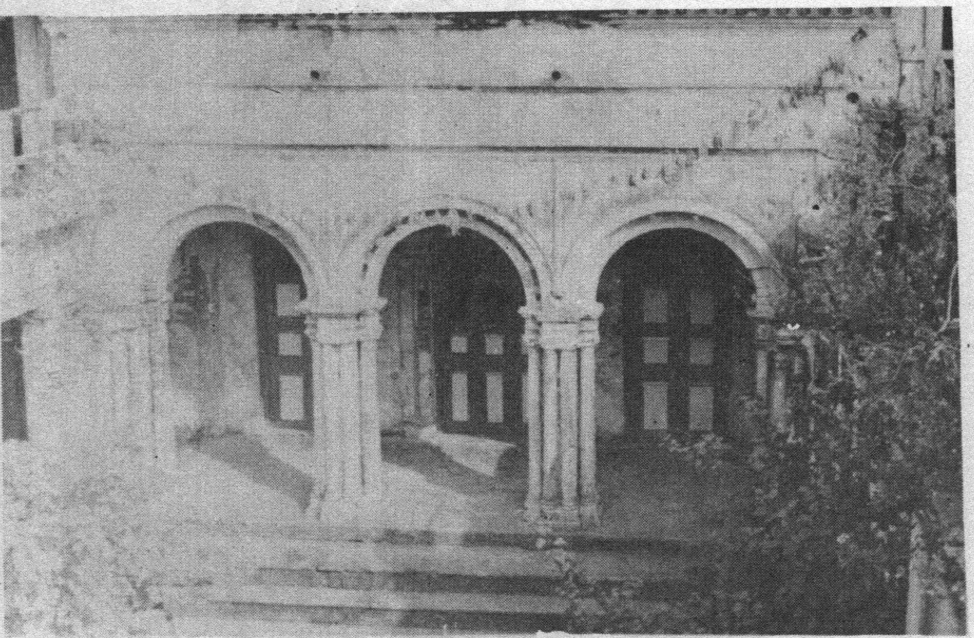
শঙ্করাচার্যের মন্দির



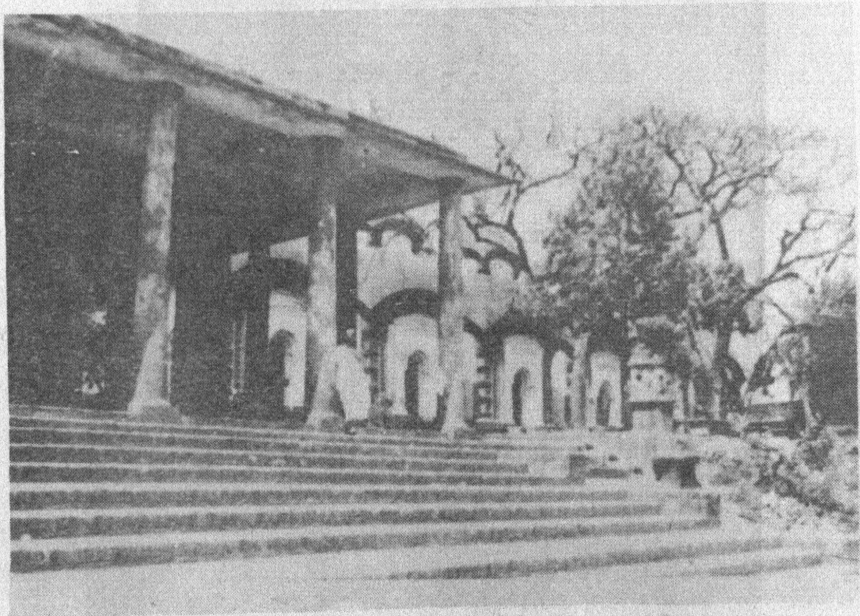
তেল কল



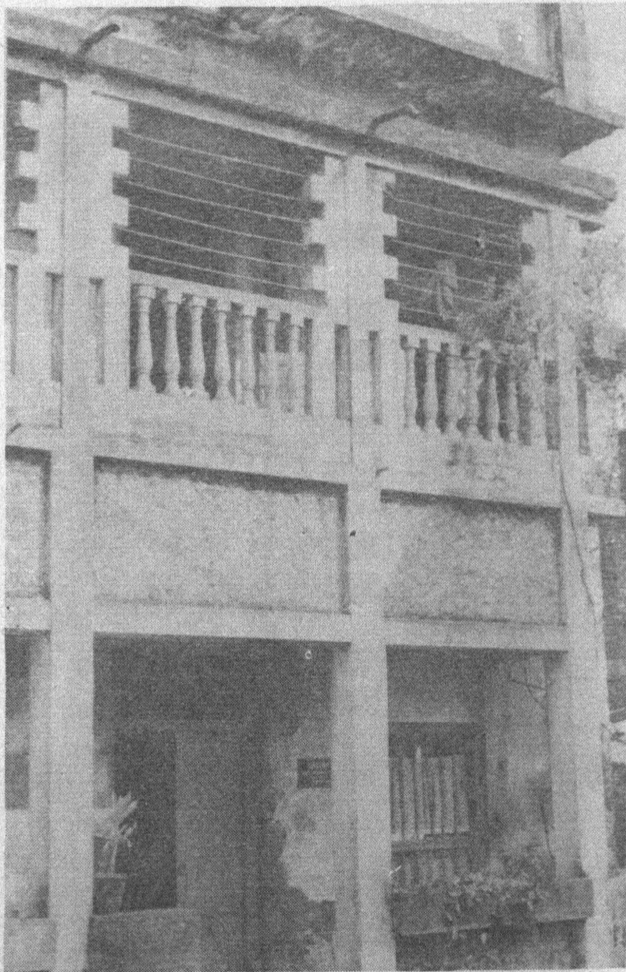
রাজরাজেশ্বরী মন্দির



ত্রৈলোক্যনাথ মিত্রের বাড়ি



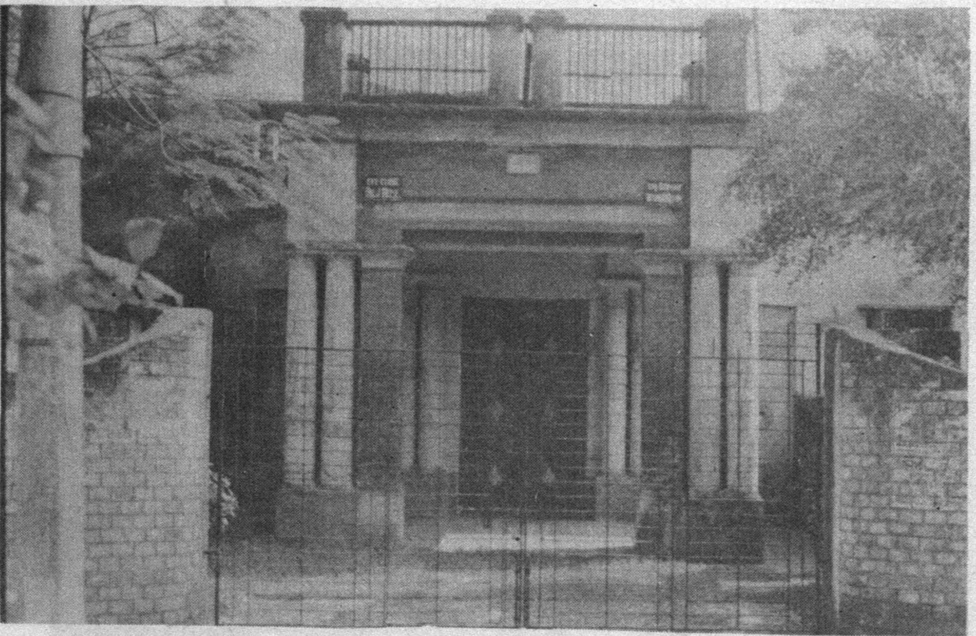
দ্বাদশ মন্দিরের ঘাট



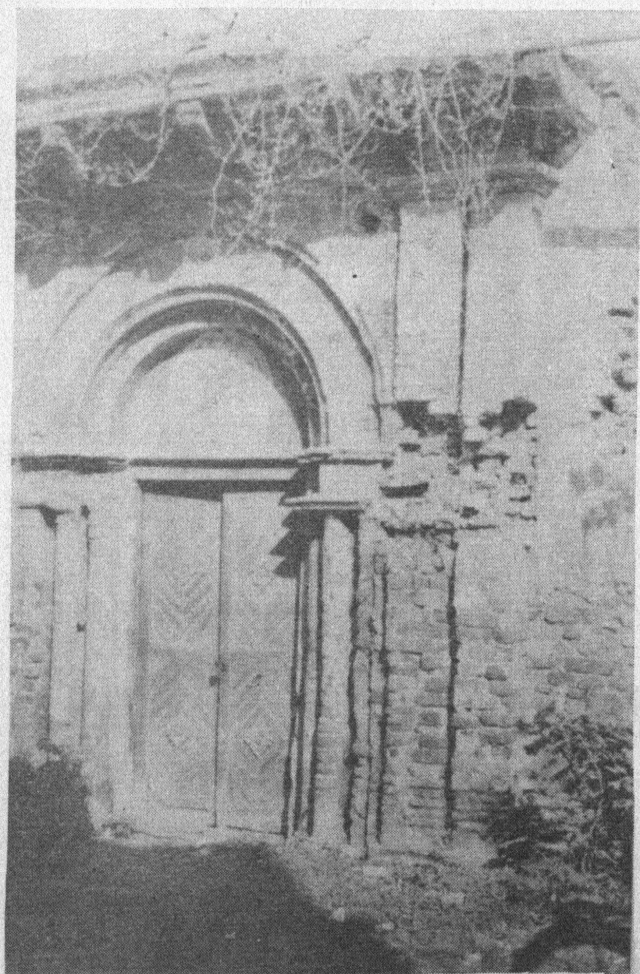
নলীগোপাল বসুর বাড়ি



কোন্নগর রবীন্দ্র ভবন



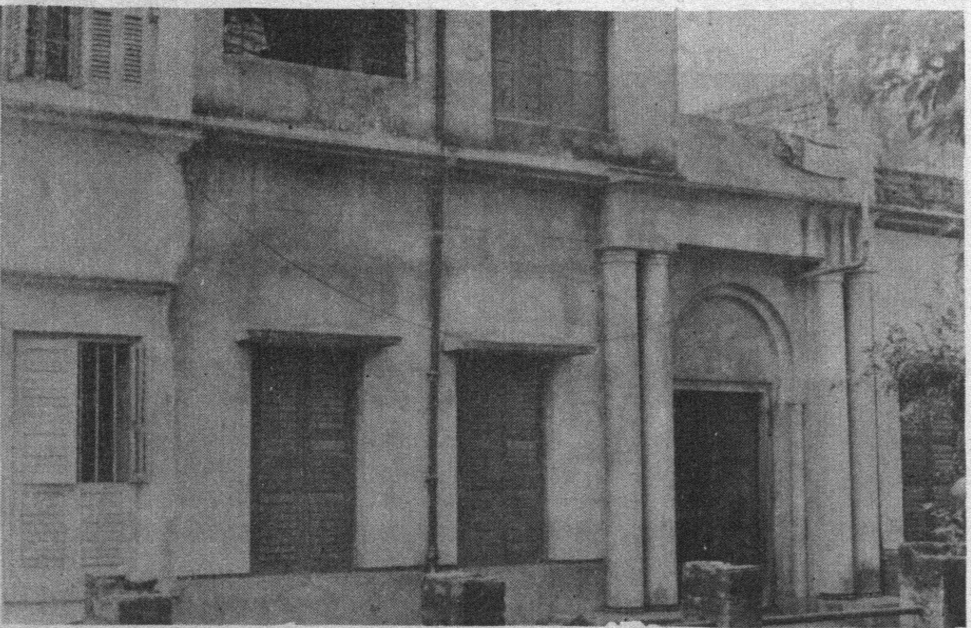
শিবচন্দ্র দেবের বাড়ি



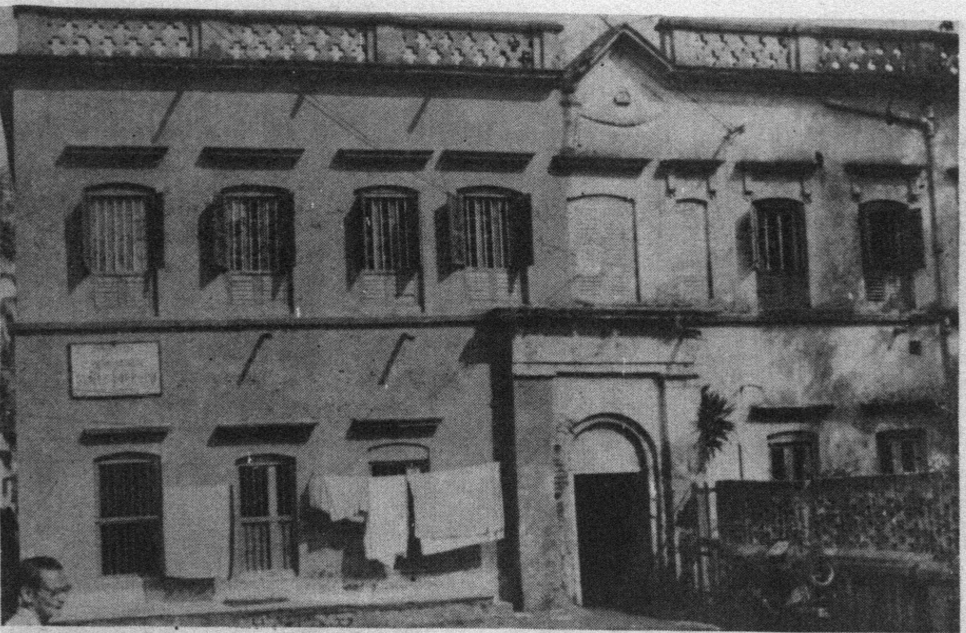
মণি বাড়ি



কোন্নগর পৌর ভবন



শরৎ কুমার দেবের বাড়ি



দাস বাড়ি



কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরী এণ্ড ফ্রি রিডিং রুম
(১.৪.১৮৬০)



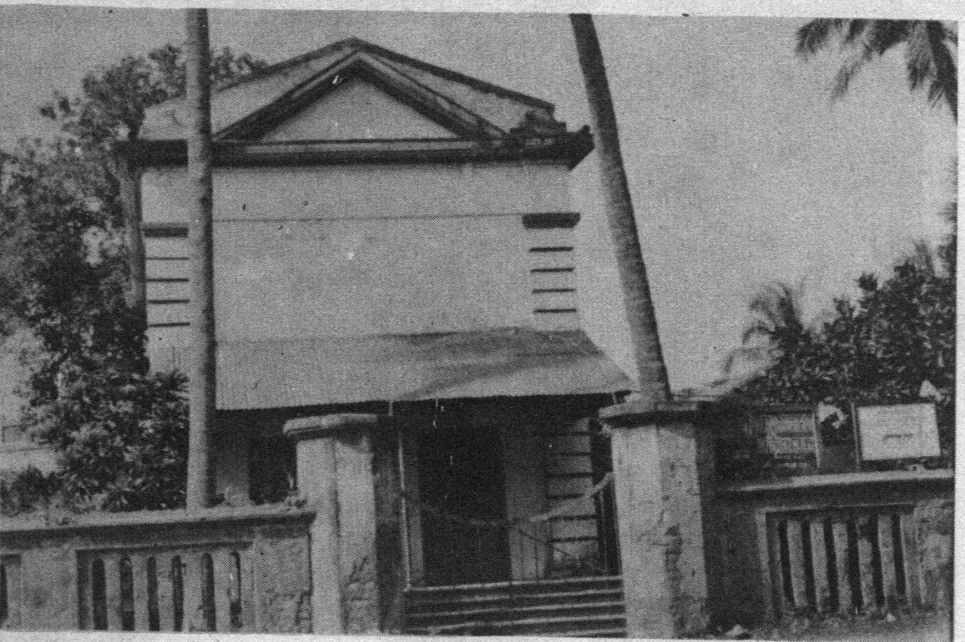
কোন্নগর হিন্দু বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

(১৮৬০)



কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয়

(১৮৫৪)



ব্রাহ্ম সমাজ